





# বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত



ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি  
কলিকাতা - ১২

॥ প্রথম ওরিয়েন্ট সংস্করণ : ১লা প্রাবণ, ১৩৬৫ ॥  
॥ দ্বিতীয় ওরিয়েন্ট সংস্করণ : ১লা আশ্বিন, ১৩৬৫ ॥  
॥ দাম : পাঠ্য সংস্করণ : ৩'২৫ : পাঠাগার সংস্করণ : ৪'০০ ॥

প্রকাশক : শ্রীধনজয় প্রামাণিক, ৪-ই, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২  
মুদ্রক : শ্রীকালীচরণ পাল, নবজাবন প্রেস, ৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭



## লেখকের কথা

১৯৪০ সালে আমি বাংলা সাহিত্যেব ভূমিকা নামে একখানি বই লিখি। ১৯৫৮ সালেব এই বই ঐ একই নামে প্রকাশিত হলেও, একই বই নয়। হয়ত এব নূতন নাম দেওয়া সম্ভব হত। মোহবশেই তা কবিনি।

১৯৩৬-৩৮ সালে যখন আমি বিশ্বভাবতীৰ অধ্যাপক, কবি সে সময় লোক-শিক্ষা সংসদেব পাঠ্যতালিকাব উপযোগী কবে, প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যেব গতি-প্রকৃতি বোঝানব জন্তে ছোট একখানি বই লিখতে হকুম কবেন আমাকে।

লোক মাঝেব একটি চিবকুটে তিনি লিখে পাঠান, সাহিত্যেব ইতিহাস হলো মানুষেব মনেব ইতিহাস। মাটিব ইতিহাসেব সঙ্গে তাব আগাগোড়া তকাৎ। প্রত্নবিজ্ঞাব চলতি মাপকাঠি এখানে অচল। এজন্তে চাই নতুন দৃষ্টি। \* \* \* সাহিত্যেব ইতিহাসকে সাহিত্য হয়ে উঠতে হবে।

তাঁব ইচ্ছাক্রমে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে পাঁচ-ছ-টি অধ্যায় এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আবে পাঁচ-ছ-টি অধ্যায় একত্র হয়ে প্রকাশিত হল ‘বাংলা সাহিত্যেব ভূমিকা’।

১৯৩৯-৪০-এ প্রকাশিত সেই বই-ই প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যেব পরিচয়সূচক প্রথম বই। হয়ত সে জন্তেই, অথবা প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস না লিখে, সাহিত্যবিচাবে আমি সমাজ, সংস্কৃতি ও মানুষেব প্রাত্যহিক জীবন-চর্যার ওপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছি বলেই, বইটি আশাতীত সমাদর লাভ কবে।

স্বয়ং ববীন্দ্রনাথ একটি পত্র-প্রবন্ধে তাকে স্বাগত জানান। প্রমথ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হীবেন্দ্রনাথ দত্ত, দীনেশচন্দ্র সেন, বাধাকমল মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ সেন, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিত জনও হয় চিঠিতে, নয় সাময়িক পত্রে এব সম্বন্ধে সদয় অভিমত ব্যক্ত করেন।

এছাড়া শিক্ষক, সাহিত্যিক, ছাত্র ও সাধারণ পাঠক, বহু জনই নানা ভাবে বইটি সম্বন্ধে তাঁদের প্রীতি ও পক্ষপাত ব্যক্ত করেন। কতকগুলি অধ্যায়

এর হিন্দীতে এবং একটি সংক্ষিপ্ত-সার মারাত্মক প্রকাশিত হলেও বইটির জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি কিন্তু অমুরাগ হারিয়ে ফেলি বইটি সম্বন্ধে চের আগেই। ত্রিশের পূর্বে লেখা বই চল্লিশের পরেও সহ্য করতে পাবেন, এমন নির্বিচার লেখক কে বা ক-জন আছেন? মানুষের চোখ বদলায়, মন এবং মেজাজও বদলায় সেই সঙ্গে। কাজেই বইটির সংস্করণ শেষ হয়েছে, বাব বার মুদ্রণের তাগিদও এসেছে। আমিই সাড়া দিই নি। কেননা আগাগোড়া নূতন কবে লেখা উৎসাহ বোধ করি নি। আমার স্বভাবগত নিম্পৃহতা ও আলস্যই এজন্তে দায়ী অবশ্য।

অবশেষে প্রীতিভাজন বন্ধু ও ভ্রাতা প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক এবং বহুমাতা কল্যাণী দেবী প্রায় ধরে-বঁধে আমাকে আর একবার বাংলা সাহিত্য-পরিচরায় নিয়োজিত করেন। তাব ফলেই পুর্বানো নামে তৈরি হল নূতন কবে লেখা এই বই। তাঁদের এই আগ্রহ ও সহযোগিতা দাম বলে শেষ কবতে পাবি না। এ ভিন্ন আমার মতো উদাসীন লেখক হস্ত কবেই কলম গুটিয়ে সাহিত্যিক বানপ্রস্থ গ্রহণ করত।

প্রথম বই বেবিয়েছিল ১৯৪০-এব ডিসেম্বর মাসে। দ্বিতীয় বই প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৪৮-ব জুলাই মাসে। মাঝের আঠাবো বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে দেশের। পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে, এক বাংলা দেশ ভেঙে দুই হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিশ লক্ষ বেকার ও পূর্ববঙ্গের পঞ্চাশ লক্ষ উদ্বাস্তর ভারে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি ধ্বংস পড়ার মতো হয়েছে।

এই পরিবর্তিত পটভূমিতে সাহিত্য ও শিল্পের মূল্যায়ন অনিবার্য ভাবেই বদলাবে। সেই বদলেব দিকে চোখ বেখেই বর্তমান বইয়ে পুরানো বিষয়কে নূতন ভাবে বিশ্লেষণ করেছি আমি। যাতে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে সাহিত্য-জিজ্ঞাসু সাধারণ পাঠক পর্যন্ত, সবাই বইটি পড়তে এবং পড়ে উপভোগ করতে পাবেন, সেই জন্তে এতে সাল তারিখ ও তথ্যের কচকচি নিয়ে অত্যধিক মাথা ঘামাই নি। আমি প্রধান বিবেচনা করেছি সাহিত্যবস্তুকেই, যা করেন না বড়-একটা সাহিত্যের ইতিহাসকাররা।

সাহিত্যের ইতিহাসও সাহিত্য হবে, কবির এই আদেশ শিরোধার্য করে প্রথম বইটি বাজারে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সে আদেশ লক্ষ্য করি নি এই বইয়েও। † আগেকার বই যখন বেরয়, তখন বাংলার বঙ্গীয় ব্যক্তির তাকে

সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। আজ তাঁরা অনেকেই লোকান্তরিত। তাঁদের সকলকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছি। আর স্মরণ করছি বন্দনীয় কবিকে, যার অতিমত বইয়ের পরবর্তী মুদ্রণে শিরোভূষণ রূপে ব্যবহারের অমুমতি আমার চাওয়া ছিল দীর্ঘ কাল আগে।

এই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সমস্ত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বন্ধুকে, যারা এই বইয়ের রচনা ও প্রকাশে আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন।

জুলাই ২৩, ১৯৫৮

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

## দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

মাত্র চার মাসের মধ্যে আগের সংস্করণটি নিঃশেষিত হয়েছে। দেশের অধ্যাপক, শিক্ষক ও সাহিত্যাহুরাগী পাঠক-পাঠিকার কাছে এই সাহিত্যগ্রন্থ পৃষ্ঠপোষকতার জন্মে আমরা কৃতজ্ঞ।

যতখানি সংশোধন ও সংস্কার করে নূতন সংস্করণটি বের করার ইচ্ছা ছিল, সময়ের স্বল্পতায় তা করা সম্ভব হল না। তবু কিছুটা কাটাকুটি ও ঘনামাজা করে দিলাম। সেই সঙ্গে কিছু নূতন পাঠ্যবস্তু এবং একটি নির্ঘণ্টও সংযোজিত হল। আশা করি এই নূতন সংস্করণও আগেরটির মতো গুণিজনের সমাদর-লাভে ধন্য হবে।

সেপ্টেম্বর ১৮, ১৯৫৮

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

## ভূমিকা

কল্যাণীয়েষু,

নন্দগোপাল, তোমার বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা বইখানি পড়ে খুশি হলাম। এর মধ্যে তোমার স্বন্দৃষ্টির এবং ভাষার স্নতীকৃত্যব প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু স্বন্দৃষ্টি জিনিসটা যে রস আহবণ কবে সেটা সকল সময় সার্বজনিক হয় না। সাহিত্যের এটাই হোলো অপরিহার্য দৈন্ত। তাকে পুরস্কাবেব জন্ত নির্ভব করতে হয় ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধিব উপবে। তার নিয় আদালতের বিচার সেও যেমন বৈজ্ঞানিক বিধি-নির্দিষ্ট নয়, তার আপিল আদালতের রায়ও তথৈবচ। এস্থলে আমাদের প্রধান নির্ভবেব বিষয় বহুসংখ্যক শিক্ষিত রুচির অমুমোদনে। কিন্তু কে না জানে যে শিক্ষিত লোকেব রুচিব পবিধি তৎকালীন বেটনীব দ্বারা সীমাবদ্ধ, সময়াত্তবে তার দশান্তব ঘটে। সাহিত্যবিচারেব মাপকাঠি একটা সজীব পদার্থ। কালক্রমে সেটা বাড়ে এবং কমে, ক্রশ হয় এবং স্থল হয়েও থাকে। তার সেই নিত্য পরিবর্তমান পরিমাণবৈচিত্র্য দিয়েই সে সাহিত্যকে বিচার করতে বাধ্য, আব কোনো উপায় নেই। কিন্তু বিচারকেরা সেই হাস-বুদ্ধিকে অনিত্য বলে স্বীকার করেন না—তাঁরা বৈজ্ঞানিক ভঙ্গী নিয়ে নির্বিকার অবিচলতার ভাণ করে থাকেন। কিন্তু এ বিজ্ঞান মেকি বিজ্ঞান, খাঁটি নয়, ঘরগড়া বিজ্ঞান, শাস্ত্রত নয়। উপস্থিত মতো যখন একজন বা এক সম্প্রদায়ের লোক সাহিত্যিকের উপরে কোনো মত জাহিব করেন, তখন সেই ক্ষণিক চলমান আদর্শেব অমুগারে সাহিত্যিকের দণ্ড-পুৰস্কারের ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে থাকে। তার বড় আদালত নেই। তার কঁাসিব দণ্ড হোলেও সে একান্ত মনে আশা করে যে বেঁচে থাকতে থাকতে হয়ত কঁাস যাবে ছিঁড়ে, গ্রহের গতিকে কখনো যায়, কখনো যায় না। সমালোচনার এই অক্রব অনিশ্চয়তা থেকে স্বয়ং সেক্সপিয়ারও নিরুতি লাভ করেননি। পণ্যের মূল্য নির্ধারণকালে ঝগড়া ক'রে তর্ক ক'রে কিংবা আর পাঁচজনের নজির তুলে' তার সমর্থন করা জলের উপর ভিত গাড়া। জল তো স্থির নয়, মানুষের রুচি স্থির নয়, কাল স্থির নয়। এস্থলে ক্রব আদর্শের ভাণ না ক'রে সাহিত্যের পরিমাপ যদি

সাহিত্য দিয়েই করা যায় তাহলে শাস্তি রক্ষা হয়। অর্থাৎ জজের রায় শ্রয় যদি শিল্প-নিপুণ হয় তাহলে মানদণ্ডই সাহিত্য-ভাণ্ডারে সম্মানে রক্ষিত হবার যোগ্য হতে পারে।

সাহিত্য-বিচার-মূলক গ্রন্থ পড়বার সময় প্রায়ই কমবেশি পরিমাণে যে জিনিসটি চোখে পড়ে, সে হচ্ছে বিচারকের বিশেষ সংস্কার। এই সংস্কারের প্রবর্তনা ঘটে তাঁর দলের সংশ্রবে, তাঁর শ্রেণীর টানে, তাঁর শিক্ষার বিশেষত্ব নিয়ে। কেউ এ প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াতে পারেন না। বলা বাহুল্য এ সংস্কার জিনিসটা সর্বকালের আদর্শের নির্বিশেষ অমুভবী নয়। জজের মনে ব্যক্তিগত সংস্কার থাকেই, কিন্তু তিনি আইনের দণ্ডের সাহায্যে নিজেকে খাড়া রাখেন। তুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যে এই আইন তৈরি হোতে থাকে বিশেষ কালের বা বিশেষ দলের, বিশেষ শিক্ষার বা বিশেষ ব্যক্তির তাড়নায়। এ আইন সর্বজনীন এবং সর্বকালের হোতে পারে না। সেই জন্তেই পাঠকসমাজে বিশেষ বিশেষ কালে এক একটা বিশেষ মরসুম দেখা দেয়, যথা টেনিসনের মরসুম, কিপ্লিংয়ের মরসুম। এমন নয় যে ক্ষুদ্র একটা দলের মনেই সেটা ধাক্কা মারে, বৃহৎ জনসম্মত এই মরসুমের দ্বারা চালিত হোতে থাকে, অবশেষে কখন এক সময় ঋতু পরিবর্তন হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক সত্য-বিচারে এ রকম ব্যক্তিগত পক্ষ-পাতিত্ব কেউ প্রশ্রয় দেয় না। এই বিচারে আপন বিশেষ সংস্কারের দোহাই দেওয়াকে বিজ্ঞানে মূঢ়তা বলে। অথচ সাহিত্যে এই ব্যক্তিগত ছোঁয়াচ লাগাকে কেউ তেমন নিন্দা করে না। সাহিত্যে কোন্টা ভালো কোন্টা মন্দ সেটা অধিকাংশ স্থলেই যোগ্য বা অযোগ্য বিচারকের বা তার সম্প্রদায়ের আশ্রয় নিয়ে আপনাকে ঘোষণা করে। বর্তমানকালে বিতালিতার মনস্ত্ব বা অহঙ্কার সর্বজনীন আদর্শের ভাণ ক'রে দণ্ডনীতি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করছে। এও যে অনেকটা বিদেশী নকলের ছোঁয়াচ লাগা মরসুম হোতে পারে, পক্ষপাতী লোকে এটা স্বীকার করতে পারেন না। সাহিত্যে এইরকম বিচারকের অহঙ্কার ছাপার অক্ষরের বত্রিশ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। অবশ্য যারা শ্রেণীগত বা দলগত বা বিশেষকালগত মনস্ত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত নয়, তাদের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত নিরাসক্ত। কিন্তু তারা যে কে তা কে স্থির করবে, যে সরষে দিয়ে ভূত ঝাড়ায় সেই সরষেকেই ভূতে পায়। আমরা বিচারকের শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করি নিজের মতের শ্রেষ্ঠতার অভিমানে। মোটের উপর নিরাপদ হচ্ছে ভাণ না করা, সাহিত্যের সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা।

সে রকম সাহিত্য মতের একান্ত সত্যতা নিয়ে চরম মূল্য পায না। তার মূল্য তাম্র সাহিত্যরসেই।

সমালোচকদের লেখায় কটাক্ষ এমন আভাস পেয়ে থাকি যেন আমি অন্তত কোথাও কোথাও আধুনিকের পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার কাঁচা চেষ্টা করছি এবং সেটা আমার কাব্যের স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাচ্ছে না। এই উপলক্ষে এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্যটা বলে নিই।

আমার মনে আছে যখন আমি ক্ষণিকা লিখেছিলাম, তখন একদল পাঠকের ধাঁধা লেগেছিল। তখন যদি আধুনিকের রেওয়াজ থাকত তাহলে কারো বলতে বাধত না যে ঐ সব লেখায় আমি আধুনিকের সাজ পরতে শুরু করেছি। মাহুশের বিচারবুদ্ধির ঘাড়ে তার ভূতগত সংস্কার চেপে বসে। মনে আছে কিছুকাল পূর্বে কোনো সমালোচক লিখেছিলেন, হান্সরস আমার রচনা-মহলের বাইরের জিনিস। তাঁর মতে সেটা হতে বাধা কেননা লিরিক কবিদের মধ্যে স্বভাবতই হান্সরসের অভাব থাকে। তৎসত্ত্বেও আমাব চিরকুমারসতা ও অত্যাশ্চর্য প্রহসনের উল্লেখ তাঁকে করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর মতে তার হান্সরসটা অগভীর, কারণ—কারণ আর কিছু বলতে হবে না, কারণ তাঁর সংস্কার, যে সংস্কার যুক্তি-তর্কের অতীত।

তুমি মনে করো না তোমার লেখায় আমার প্রতি কোনো অবিচার করেছে বলে আমি তোমার উপর কটাক্ষপাত করেছি, ঠিক তার উল্টো। তুমি আমাকে যা নগদ বিদায় দিবেছ শেষ পর্যন্ত তার বোকা বইতে পারলে আমি বেঁচে যাব। কিন্তু দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় সাহিত্যিক যশ সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে একটা সুগভীর বৈরাগ্য এসেছে। এতদিনে কালের খাজাঞ্চিখানা থেকে আমি যা কিছু লাভ করেছি সেটা খাঁটি কিংবা খাঁটি নয় যখন তার প্রমাণ হবে, তখন আমি উপস্থিত থাকব না।

আমার এই লেখাটা তোমার গ্রন্থের সমালোচনা নয়, তার কারণ সমালোচনায় আমার রুচি বা কৃতিত্ব কোনোকালেই ছিল না এবং এখনো নেই। ইতিপূর্বে আমি কখনো কখনো এমন সব লেখা লিখেছি যা পাঠকেরা সমালোচনা বলে গণ্য করে নিয়েছেন। কিন্তু তা বস্তুত শিল্পকর্ম—বিশ্লেষণের সামগ্রী নয়। সংক্ষেপে আমি বলতে পারি তোমার রচনার বরাবর আমি প্রশংসা করে এসেছি তার ভাষা ও মননশক্তির উজ্জ্বলতা শুধু, এ গ্রন্থেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর তন্ন তন্ন বিচার তাঁরাই করবেন ঈদের শক্তি আছে

এবং অভ্যাস আছে—আমি অক্ষম। আমার নিজের সম্বন্ধে বিচারকের জরিমানা ও বকশিশ নিঃশব্দে যেনে নিই, অস্ত্রের সম্বন্ধে আমার অভিমত প্রক্ষেপ করতে যথেষ্ট সংকোচ বোধ করি, কারণ এই অভিমত সম্বন্ধে আমার অহঙ্কার কালক্রমে ক্ষীণ হয়ে গেছে।

আমি অনেক সময় খুঁজি সাহিত্যে কার হাতে কর্ণধারের কাজ দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ কার হাল ডাইনে বাঁয়ের চেউয়ে দোলাতুলি করে না। একজনের নাম খুব বড়ো করে আমাব মনে পড়ে তিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথব নাম আমাব বিশেষ করে মনে আসবার কারণ এই যে, আমি তাঁর কাছে ঋণী। সাহিত্যে ঋণ গ্রহণ করবার ক্ষমতাকে গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করা যেতে পারে। অনেককাল পর্যন্ত যারা গ্রহণ করতে এবং স্বীকার করতে পাবেনি তাদের আমি অশ্রদ্ধা করে এসেছি। তাঁর যেটা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে, সে হচ্ছে তাঁর চিন্তাবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্য, সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়—এই মননধর্ম মনের সে তুঙ্গ শিখরেই অনাবৃত থাকে যেটা ভাবালুতার বাষ্পস্পর্শহীন। তাঁর মনের সচেতনতা আমাব কাছে আশ্চর্যের বিষয়। তাই অনেকবার ভেবেছি তিনি যদি বঙ্গসাহিত্যের চালকপদ গ্রহণ কবতেন তাহলে এ সাহিত্য অনেক আবর্জনা হতে বক্ষা পেত। এত বেশি নির্বিকার তাঁর মন যে বাঙালী পাঠক অনেক দিন পর্যন্ত তাঁকে স্বীকার কবতেই পারেনি, মুশকিল এই যে বাঙালী কাউকে কোনো একটা দলে না টানলে তাকে বুঝতেই পাবে না। আমাব নিজের কথা যদি বল, সত্য আলোচনা সভায় আমাব উক্তি অলঙ্কারের বঙ্কারে মুখরিত হয়ে ওঠে। এ কথাটা অত্যন্ত বেশি জানা হয়ে গেছে সেজন্য আমি লজ্জিত এবং নিরুত্তর। অতএব সমালোচনার আসবে আমাব আসন থাকতেই পারে না। কিন্তু রসের অসংযম প্রমথ চৌধুরীর লেখায় একেবারেই নেই। এই সকল গুণেই মনে মনে তাঁকে জজের পদে বসিয়েছিলুম। কিন্তু বুঝতে পারছি বিলম্ব হয়ে গেছে। তার বিপদ এই যে সাহিত্যে অরক্ষিত আসনে যে খুশি সেই চড়ে বসে। তার ছদ্মগু ধরবার লোক পিছনে পিছনে জুটে যায়।

এখানেই আমার শেষ কথাটা বলে নিই। আমার রচনায় যারা মধ্যবিস্তার লক্ষান করে পাননি বলে নালিশ করেন, তাঁদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ৎ দেবার সময় এল। পলিমাটি কোনো স্থায়ী কীর্তির ভিত বহন

করতে পারে না। বাংলার গাঙ্গেয় প্রদেশে এমন কোনো সৌধ পাওয়া যায় না যা প্রাচীনতার স্পর্শ করতে পারে। এ দেশের আভিজাত্য সেই শ্রেণীর। আমরা যাদের বনেদি বংশীয় বলে আখ্যা দিই তাদের বনেদ বেশি নিচে পর্যন্ত পৌঁছয়নি। এরা অল্পকালের পরিসরের মধ্যে মাথা তুলে ওঠে তারপরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে বিলম্ব করে না। এই আভিজাত্য সেইজন্ম একটা আপেক্ষিক শব্দ মাত্র। তার সেই ক্ষণভঙ্গুর ঐশ্বর্যকে বেশি উচ্চে স্থাপন কবা বিডম্বনা, কেননা সেই কৃত্রিম উচ্চতা কালের বিজ্রপের লক্ষ্য হয় মাত্র। এই কারণে আমাদের দেশেব অভিজাত বংশ তার মনোবৃত্তিতে সাধারণের সঙ্গে অত্যন্ত স্বতন্ত্র হতে পারে না। একথা সত্য এই স্বল্পকালীন ধন-সম্পদের আত্ম-সচেতনতা অনেক সময়েই দুঃসহ অহঙ্কারের সঙ্গে আপনাকে জনসম্প্রদায় থেকে পৃথক রাখবার আডম্বব করে। এই হাত্তকর বক্ষক্ষীতি আমাদের বংশে অন্তত আমাদের কালে একেবারেই ছিল না। কাজেই আমরা কোনোদিন বড়লোকের প্রহসন অতিনয় করিনি। অতএব আমাব মনে যদি কোনো স্বভাবগত বিশেষত্বেব ছাপ পড়ে থাকে তা বিস্তপ্রাচুর্য কেন বিস্ত-সচ্ছলতারও নয়। তাকে বিশেষ পরিবারের পূর্বাপর সংস্কৃতিব মধ্যে ফেলা যেতে পারে এবং এ রকম স্বাভাব্য হয়তো অল্প পরিবারেও কোনো বংশগত অভ্যাসবশত আত্মপ্রকাশ করে থাকে। বস্তুত এটা আকস্মিক। আশ্চর্য এই যে সাহিত্যে এই মধ্যবিস্ততার অভিমান সহসা অত্যন্ত মেতে উঠেছে। কিছুকাল পূর্বে “তরুণ” শব্দটা এই রকম ফণা তুলে ধবেছিল। আমাদের দেশে সাহিত্যে এই রকম জাতে ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়েছে হালে। আমি যখন মস্কো গিয়েছিলুম, চেকভের রচনা সম্বন্ধে আমাব অল্পকূল অভিরুচি ব্যক্ত করতে গিয়ে হঠাৎ ঠোক্তর খেয়ে দেখলুম, চেকভের লেখায় সাহিত্যের মেল বন্ধনে জাতিচ্যুতি দোষ ঘটেছে, স্তবরাং তাঁর নাটক স্টেজের মধ্যে পংক্তি পেল না। সাহিত্যে এই মনোভাব এত বেশি কৃত্রিম যে গুনচে পাই এখন আবার হাওয়া বদল হয়েছে। এক সময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হয়নি। তখন মধ্যবিস্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপ সিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। আমার আশঙ্কা হয় এক সময়ে গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য বলে অস্পৃশ্য হবে। এখন যখন আমার লেখার শ্রেণী নির্ণয় করা হয়



তখন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় না, যেন ওগুলির অস্তিত্বই নেই। জাতে ঠেলাঠেলি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে তাই ভয় হয় এই আগাছাটাকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে।

কিছুকাল থেকে আমি দুঃসহ রোগ-দুঃখ ভোগ করে আসছি সেইজন্য যদি ব'লে বসি যারা আমার শুক্রবায় নিযুক্ত তাঁরাও মুখে কালো রঙ মেখে অস্বাস্থ্যের বিকৃত চেহারা ধারণ করে এলে তবেই সেটা আমার পক্ষে আরামের হোতে পারে তাহলে মনোবিকারের আশঙ্কা কল্পনা করতে হবে। প্রকৃতির মধ্যে একটা নির্মল প্রসন্নতা আছে। ব্যক্তিগত জীবনে অবস্থাবিপর্যব ঘটতে কিন্তু তাতে এই বিশ্বজনীন দানের মধ্যে বিকৃতি ঘটে না; সেই আমাদের সৌভাগ্য। তাতে যদি আপত্তি করাব একটা দল পাকাই তাহলে বলতে হয় যারা নিঃস্ব তাঁদের জন্তে মরুভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করা উচিত নইলে তাঁদের মনোবিকার তুষ্টি অসম্ভব। নিঃস্ব শ্রেণীর পাঠকদের জন্ত সাহিত্যেও কি মরু-উপনিবেশ স্থাপন করতে হবে?

তোমাব লেখা উপলক্ষ্য মাত্র করে আমি সাহিত্যবিচার সঙ্কল্পে আমার মত ব্যক্ত করেছি, বোগজীর্ণ ক্লান্ত মনের অসংলগ্ন উক্তি। একথাও বলে রাখা দরকার এর অধিকাংশই আমি শ্রীমান সুধাকান্তকে মুখে মুখে বলে গিয়েছি। সুতবাং এ বকম ভাবণের দুর্বলতা ক্ষমাব যোগ্য। ১০ আশ্বিন, ১৩৪৮।

বসন্তকুমার

## আলেখ্য, স্বাক্ষর ও হস্তলিপি

### আলেখ্য

পশুপতি শিব : বীরভূম  
রাধাকৃষ্ণমূর্তি : পাহাড়পুর  
মনসামূর্তি : কোটালীপাড়া  
কুন্তিবাস-স্মৃতিস্তম্ভ : ফুলিয়া  
সপারিষদ ত্রীচৈতন্য : কুঞ্জবাট  
রামপ্রসাদের পঞ্চবটী : হালিসহর  
কৃষ্ণচন্দ্রের সভাগৃহ : কৃষ্ণনগর  
রামমোহন রায়  
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত  
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর  
অক্ষয়কুমার দত্ত  
রাজনারায়ণ বসু  
মাইকেল মধুসূদন দত্ত  
দীনবন্ধু মিত্র  
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

### স্বাক্ষরের প্রতিলিপি

রামমোহন রায়  
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর  
মাইকেল মধুসূদন দত্ত  
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
গিরিশচন্দ্র ঘোষ  
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়  
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী  
প্রমথ চৌধুরী  
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

### হস্তলিপির প্রতিলিপি

বঙ্কিমচন্দ্র  
রবীন্দ্রনাথ  
শরৎচন্দ্র

# বিষয়-সূচী

## প্রথম ভাগঃ প্রাচীন কাল

বিষয়	পৃষ্ঠা
লেখকের কথা	১০
ভূমিকা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
আলেখ্য, স্বাক্ষর ও হস্তলিপি	১১/০
প্রস্তাবনা	১—৮
বঙ্গদেশ : বাঙালী সংস্কৃতি—বাংলা ভাষা	
প্রথম অধ্যায়	৯—১৪
শাস্ত্র ও শৈব সহজিয়া : চর্যাপদ—নাথগাথা—শূন্যপুরাণ	
দ্বিতীয় অধ্যায়	১৫—২০
বৈষ্ণব সহজিয়া : জয়দেব—বিজ্ঞাপতি—বড় চণ্ডীদাস	
তৃতীয় অধ্যায়	২১—২৫
পুরাণ প্রচারকেরা : রুদ্রিবাস—মালাধর বহু—কাশীরাম দাস	
চতুর্থ অধ্যায়	২৬—৩২
গৌড়ীয় বৈষ্ণব : শ্রীচৈতন্য—চণ্ডীদাস—জ্ঞানদাস—গোবিন্দ- দাস—বৃন্দাবন—কৃষ্ণদাস—লোচন	
পঞ্চম অধ্যায়	৩৩—৪২
মঙ্গল কাব্য : মনসামঙ্গল : বিজয়গুপ্ত—চণ্ডীমঙ্গল : কবিকঙ্কণ —ধর্মমঙ্গল : ঘনরাম—শিবায়ণ : রামেশ্বর—অন্নদামঙ্গল :	
ভারতচন্দ্র	
ষষ্ঠ অধ্যায়	৪৩—৪৮
লোকসাহিত্য : দৌলৎ কাজী ও আলাওল—ময়মনসিংহ- গীতিকা—ছড়া	
সপ্তম অধ্যায়	৪৯—৬০
গীত সাহিত্য : শ্রীমাসঙ্গীত : রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত— উমাসঙ্গীত : দাশরথি রায়—বাউল-সঙ্গীত—লৌকিক সঙ্গীত : শিখুবাবু ও অধর—সময়ানুক্রম	

## দ্বিতীয় ভাগ : আধুনিক কাল

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূচনা	৬৩—৬৭
ইংরেজ অধিকার : নূতন সংস্কৃতি—আধুনিক সাহিত্যের বিকাশ	
প্রথম অধ্যায়	৬৮—৮০
গল্প : মৃত্যুঞ্জয় : কেরী : বামমোহন—বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র —রবীন্দ্রনাথ—প্রমথ চৌধুরী—আধুনিক গল্প লেখকবা	
দ্বিতীয় অধ্যায়	৮১—৯১
সাময়িক পত্র : সমাচারদর্পণ—সম্বাদকৌমুদী ও প্রভাকর —সাহিত্যপত্র—তত্ত্ববোধিনী ও বিবিস্তারসংগ্রহ—দৃশ্যদর্শন— —সংবাদপত্র—স্বদেশী আন্দোলন—সাহিত্য—সবুজপত্র	
তৃতীয় অধ্যায়	৯২—১১৫
কাব্য ও কবিতা : ঈশ্বরগুপ্ত—বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়— মাইকেল—হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র—মাইকেলোত্তর কবিতা— বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবি —অগ্নীশ্বর কবি—আধুনিক কবি ও কবিতা	
চতুর্থ অধ্যায়	১১৬—১২৫
গান : রামমোহন রায়—স্বদেশী আন্দোলন—রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল—রজনীকান্ত—অতুলপ্রসাদ—নজরুল ইসলাম	
পঞ্চম অধ্যায়	১২৬—১৩৫
নাটক : রামনারায়ণ—মাইকেল—দীনবন্ধু—অগ্নীশ্বর নাট্যকার —গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল—অমৃতলাল—রবীন্দ্রনাথ— সাম্প্রতিক নাটক	

বিষয়

পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায়

১৩৬—১৪৯

উপন্যাস : ভবানীচরণ ও টেকচাঁদ — বঙ্কিমচন্দ্র — বঙ্কিম-  
সমসাময়িক উপন্যাস—তাবকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—ববীন্দ্রনাথ—  
রবীন্দ্র-সমসাময়িক কাল — শবৎচন্দ্র — ববীন্দ্র-শবৎ-অমুগামী  
উপন্যাস—আধুনিক কাল

সপ্তম অধ্যায়

১৫০—১৫৬

গল্প : ববীন্দ্রনাথ—প্রভাতকুমার—অত্যাচার লেখক—শবৎচন্দ্র—  
প্রমথ চৌধুরী—ববীন্দ্র-শবৎ-পবিত্রগুণ—‘কল্লোল’ ও ‘কালি-  
কলম’-দল—বর্তমান অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

১৫৭—১৬২

শিশু-সাহিত্য : ববীন্দ্রনাথ—অবনীন্দ্রনাথ—শিশু-পত্রিকা—  
সুকুমার বাব—অত্যাচার লেখক—আধুনিক লেখক—জ্ঞান-  
বিজ্ঞান

স্বাক্ষর ও হস্তলিপির প্রতিলিপি

১৬৩—১৬৬

সময়ানুক্রম

১৬৭—১৬৮

সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র

১৬৯

প্রথম প্রকাশ

১৬৯—১৭০

গ্রন্থকরণ

১৭১—১৭২

শব্দসূচী

১৭৩





পশুপতি শিব : বীরভূম ( ১০ম শতাব্দী )

[ আশুতোষ মিউজিয়াম ]



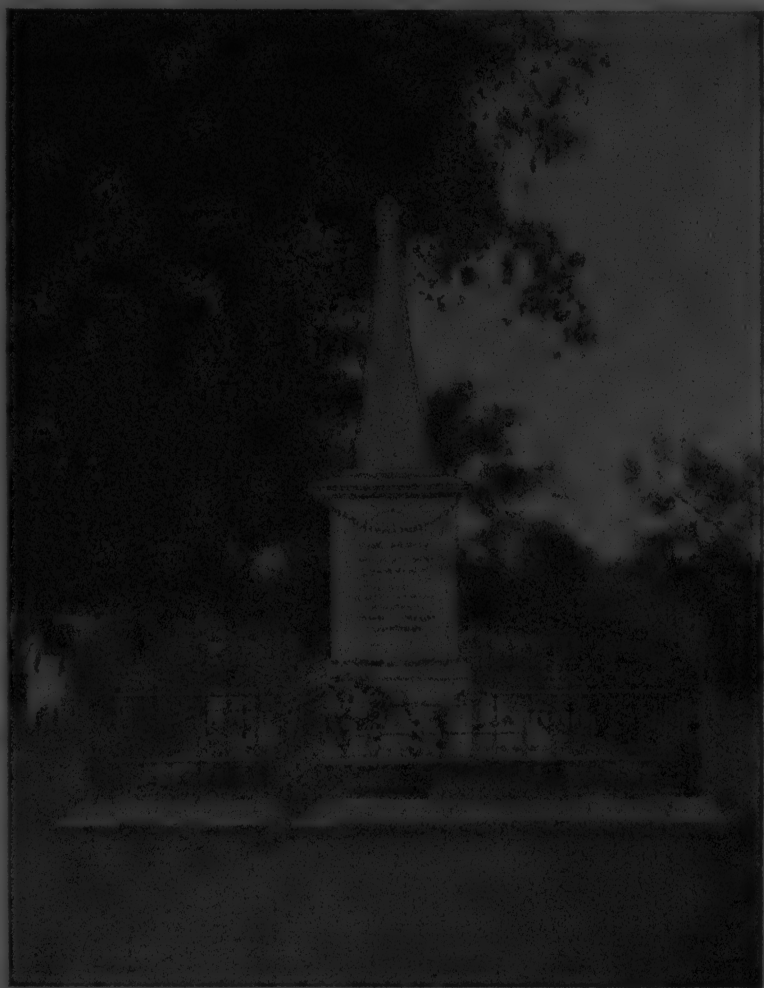
মনসামূর্তি : কোটালীপাড়া ( ১২শ শতাব্দী )

[ আশুতোষ মিউজিয়াম ]





রাধাকৃষ্ণ মূর্তি : পাহাড়পুর ( ১৩শ শতাব্দী )  
[ আশুতোষ মিউজিয়াম ]



কুতিবাস স্মৃতিস্তম্ভ : কুলিয়া



দপারিষদ শ্রীচৈতন্য  
[ কুশখাটা রাজবাড়ীর তৈলচিত্র ]



রামপ্রসাদের পঞ্চবটী : হালিসহর



কৃষ্ণচন্দ্রের সভাগৃহ  
[ কৃষ্ণনগর রাজবাড়ী : বিষ্ণুমহল ]



রামমোহন রায়



ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

[ ঈশ্বর গুপ্ত স্মৃতিরক্ষা সমিতির সৌজন্যে ]

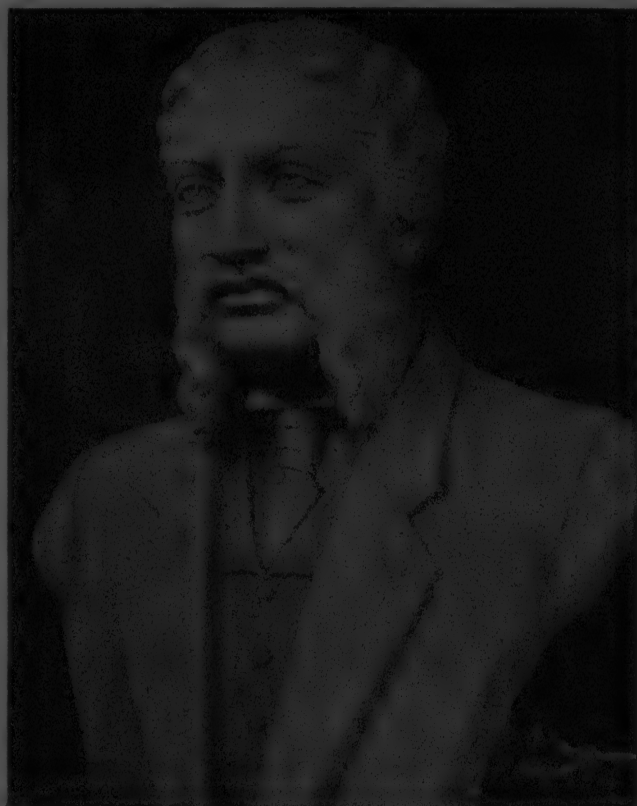


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

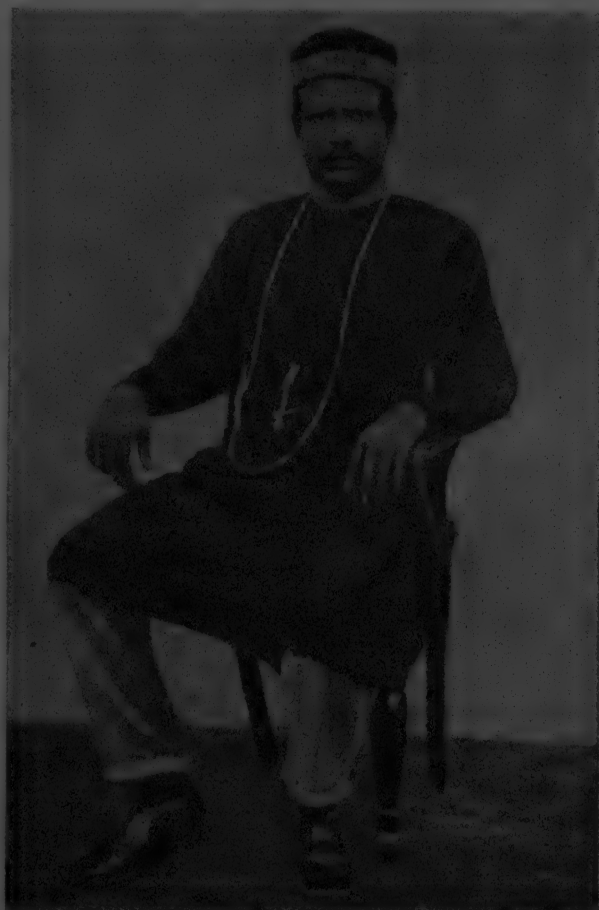


अकबरुमार. न. व.





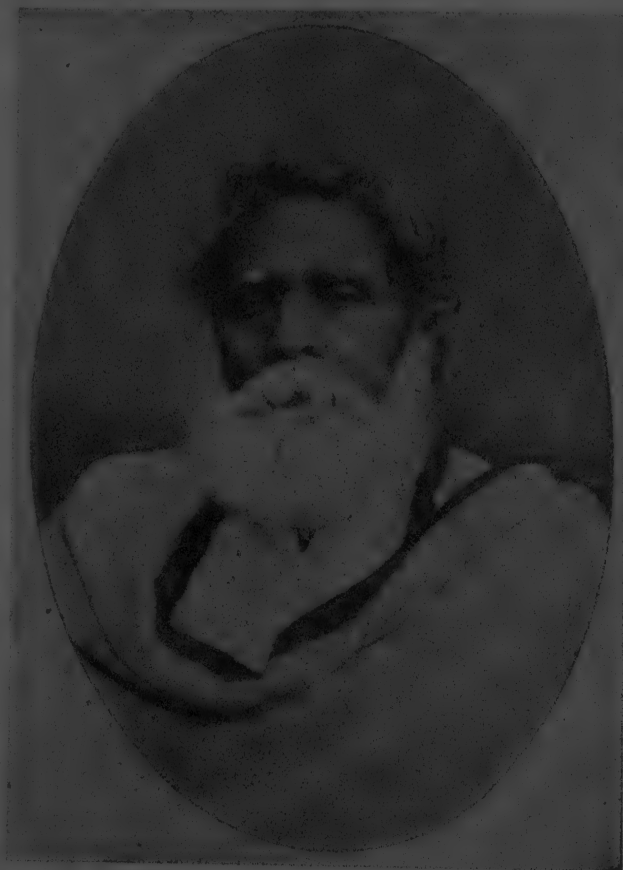
মাইকেল মধুসূদন দত্ত  
[ রমেশচন্দ্র পাল নির্মিত প্রতিমূর্তি ]



দীনবন্ধু মিত্র



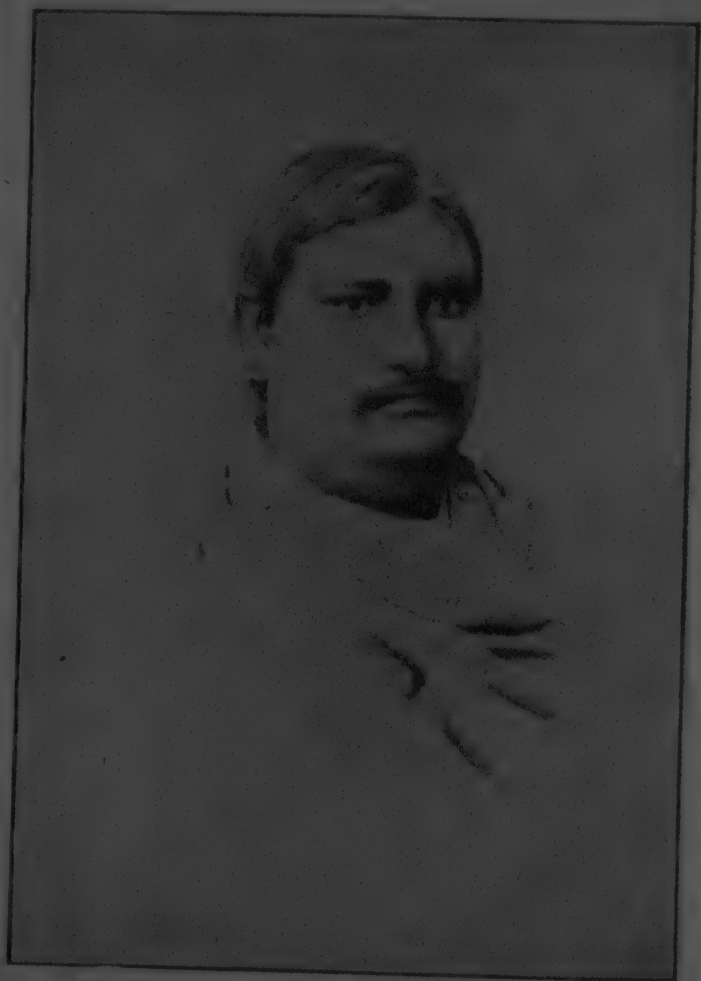
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



রাজনারায়ণ বসু



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



রামেন্দ্রচন্দ্র বিবেকী

# বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা

## প্রস্তাবনা

### বঙ্গদেশ

বাংলা দেশ বহু দিনের পুরানো এবং এই দেশের আদি অধিবাসী কাবা, তা নিয়ে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কবা যায় না। মোটামুটি এইটুকু বলা যায় যে খ্রঃ পূঃ ২০০০ অব্দে যখন বৈদিক আর্যেরা উত্তর ভারতে বসতি করছেন, তখনো পূর্বাঞ্চলীয় এই ভূমিভাগে মানুষ ছিলেন।

অবশ্য তখন বাংলা বলে একটা দেশ ছিল না। নদী পাহাড় জঙ্গল ও জলাভূমি সমার্কিত ভারতের পূর্ব সীমানা জুড়ে বাত, পোণ্ডু ও বঙ্গ, এই তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভৌগোলিক অায়তন ছিল। বাত হল পশ্চিম বঙ্গ, পোণ্ডু উত্তর বঙ্গ এবং বঙ্গ পূর্ববঙ্গ। বাতের আর এক নাম ছিল সুম্ব, পোণ্ডুর মালদহ অঞ্চলও কোন এক সময় থেকে পোণ্ডু নামে পরিচিত হয়। কিন্তু লক্ষ্য কবাব বিষয় যে বঙ্গ নামটাই কালে গোটা দেশের নাম হয়েছে এবং জাতিও বাঙালী হয়েছে তাই থেকে।

প্রাচীন বাংলার এই তিন প্রধান ভূমিভাগের সঙ্গেই ছিল তাম্রলিপ্ত, সমতট, হরিকেল এবং আরো দু-একটি অঞ্চল। তাম্রলিপ্ত হল তমলুক, কাঁধি ও মেদিনীপুর। সমতট যশোর, খুলনা ও সন্দ্বিবন এবং হরিকেল ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট। এই সব রাজ্য ও তার অধিবাসীদের নাম অতি প্রাচীন কাল থেকেই পুঁথিপত্রে চলে আসছে। ভাগবতে দেখা যায়, পোণ্ডুর রাজা বাসুদেব কুরুক এর দ্বারকা আক্রমণ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুরুপক্ষে বঙ্গবাজ যোগ দিয়েছিলেন, একথা বলা হয়েছে মহাভারতে। গ্রীক বা গঙ্গারীচ নামে এক জাতির বীরদের উল্লেখ করেছেন, যাদের ভয়ে আলেকজান্ডার-বাহিনী পূর্ব

## বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা

ভারতে অভিযান চালাতে সাহস পায় নি! রাঢ়ের রাজপুত্র বিজয়সিংহ সিংহল জয় করেছিলেন।

প্রাগৈতিহাসিক কালের এইসব বৃত্তান্ত অনেকটা কিংবদন্তীর মতো হলেও, ঐতিহাসিক কালের প্রামাণ্য বৃত্তান্তও পাওয়া যায় কম নয়। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্যেরা যখন মগধ অধিকার করেন, তখন বাংলার কতকটা মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়। ষষ্ঠীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাটরা ত সমগ্র বাংলাই মগধের সঙ্গে যুক্ত করেন। এই আটশত বছরেই বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে আখ্যাবর্তের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। তারগণের সপ্তম শতাব্দী থেকে বাংলার আসল ইতিহাস শুরু হয়, যখন গোড়রাজ শশাঙ্ক বাংলা দেশকে উত্তর ভারতের কবলমুক্ত করেন। শুধু তাই না, উত্তর ভারতের বৃহৎ একাংশে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। শশাঙ্ককে বৌদ্ধ গ্রন্থকার বাণভট্ট ‘গৌড়ভূজঙ্গ’ বলেছেন, কেন না তিনি শৈব ছিলেন এবং বৌদ্ধ সম্রাট হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর শুরু হয় বাংলার পাল বাজবংশ। পালেরা বৌদ্ধ ছিলেন এবং একাদিক্রমে অষ্টম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, চার শতাব্দী কাল তাঁরা গোড় শাসন করেছিলেন। এই বংশের বিখ্যাত বাজা ধর্মপালের সময় বাংলার সীমানা কাশী, কলিঙ্গ, কামরূপ ও মিথিলা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। পালযুগেই বাংলায় বৌদ্ধ সহজিয়াদের অর্থাৎ যোগী ও সিদ্ধাইদের আবির্ভাব হয়। একাদশ শতাব্দী থেকে সেন রাজ্যবাংলার শাসনকর্তৃত্ব দখল করেন। সমাজে কোলীজপ্রথা প্রবর্তিত হয় বঙ্গালের সময়। সেনেরা বৈষ্ণব ছিলেন, শৈব-শাক্ত সহজিয়ারা তাঁদের প্রভাবে বৈষ্ণব হন। দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষণ সেনের আমলে তুর্কী অভিযান হয় এবং সেখান থেকেই হিন্দু যুগ শেষ হয়ে শুরু হয় মুসলিম যুগ।

মুসলিম যুগ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত, এই প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর স্থায়ী হয়। এই সময় বাংলা নামে দিল্লীখরের সাম্রাজ্যভুক্ত হলেও, কাজে প্রায় স্বাধীন দেশই ছিল। গোড়ের মুসলিম সুলতানেরা বার বার দিল্লীর প্রহৃত্ব অস্বীকার করে নিজেদের স্বাধীন সার্বভৌম নরপতি বলে ঘোষণা করেছেন। তাছাড়া দূরবর্তী বাংলার সঙ্গে দিল্লীর যোগ রাখা সেদিন খুব বেশী সম্ভবও ছিল না।

এক হিসাবে এ যুগ বিশেষ সমৃদ্ধির যুগ। মুসলিম যুগের বাংলায় গোড়ীয়



বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হয়েছে। কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবির গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে। ভাস্কর্য ও কারুশিল্পেও দেশের প্রভূত উৎকর্ষ হয়েছে। কিন্তু সমাজজীবনে শাস্তি, শৃঙ্খলা বা ঐক্য বিশেষ ছিল না এ যুগে। প্রথমত বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময় উঠেছেন ভূঁইয়া রাজারা এবং তাঁরা কখনো গোড়েশ্বরের, কখনো দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব অস্বীকার করেছেন। দীর্ঘদিন তাই নিয়ে চলেছে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সমাজের শাস্তি নষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয়ত বর্ণহিন্দুদের দ্বারা নিগৃহীত অহম্মতেরা দলে দলে মুসলিম রাজশক্তির পীড়নে ও প্রলোভনে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। তার ফলে সমাজজীবন হয়েছে দ্বিধাবিভক্ত এবং অশান্তিপূর্ণ।

রাজশক্তি বিচক্ষণ হলে নিরপেক্ষ শাসন ও সমদর্শিতাব দ্বারা এর মধ্যেও তন্নত শাস্তি স্থাপন করতে পারতেন। কিন্তু চসেন শা, গিয়াসুদ্দীন ইলিয়াস প্রভৃতি ছ-চাবজন উদারবুদ্ধি শাসক সময় সময় দেখা দিলেও, সরকারী নীতিই তাঁদের ধর্ম-নিরপেক্ষ ও সমদর্শিতাপূর্ণ ছিল না।

প্রধানত এই অনিচায়ে বিরুদ্ধেই ভূঁইয়া রাজাবা বিদ্রোহ করেছেন, চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত গোড়ীয় বৈষ্ণবদের সাম্য ও সমন্বয়ের আন্দোলনও এর বিরুদ্ধেই চালিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশী বাণিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হিন্দু ভূমাদিকারীরা যে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটালেন, সে-ও এই অনৈক্য ও অশান্তিবই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া।

## বাঙালী সংস্কৃতি

রাঢ়, পৌণ্ড্র ও বঙ্গের অধিবাসীরা কবে থেকে এক জাতিভুক্ত ও বাঙালী নামে অভিহিত হতে শুরু করেন, তা বলা কঠিন। তবে পালযুগে রচিত চর্যাপদে বাঙালী কথাটা পাওয়া যাচ্ছে। যেমন:

ভুস্ক আজ তু বাঙালী ভৈলী।

নিজ ঘরণী চণ্ডালী লেলী ॥

বোঝা যাচ্ছে খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর মধ্যম্নেই এক-জাতি হিসাবে বাঙালীর গঠন সম্পূর্ণ হয়েছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকরা দেশ অর্থে বঙাল ও জাতি অর্থে বাঙালী শব্দ বার বার ব্যবহার করেছেন। তাঁদের আমলে নিশ্চয় সংজ্ঞা দুটির বহুল প্রচার ছিল দেশে।

বাঙালী জাতির উৎপত্তির ইতিহাস নিয়ে তর্ক আছে। মোটের ওপর এইটুকু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে বাঙালীরা বৈদিক আর্য জাতিগোষ্ঠীর সম্ভাবন। তাঁরা অস্ট্রিক বা অস্ট্রেলেশিয়াটিক গোষ্ঠীসমূহ এবং সম্ভবত ভূমধ্যসাগরীয় কোন অঞ্চল থেকে তাঁরা গোড়ায় ভারতে এসেছিলেন। তারপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসল গোষ্ঠীয় মানুষদেরও কিছুটা মিশ্রণ হয়ত হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে। তাঁরা নদী, বন্যমতী, অন্ন, বিজ্ঞা ও বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী এক-একটি মাতৃ-দেবতার পূজা করতেন। এর প্রত্যেকটিই ছিল তাঁদের মতে এক-একটি শক্তি এবং এই সব খণ্ড-শক্তি নিয়ে গঠিত যে মহাশক্তি, তিনিই ছিলেন তাঁদের প্রধান উপাস্ত। এছাড়া পিতৃ-দেবতা শিবেরও উপাসনা করতেন তাঁরা। মৃত পূর্ব-পুরুষদের পূজা, প্রেতপূজা, বৃক্ষ ও পাথরপূজা, এমন কি নাগ, বাঘ ও কুমীরের পূজাও সমাজের কোন কোন স্তরে চলিত ছিল।

অনেকে বলেন, যে-শাস্ত্র অনুসারে তাঁরা এই সব পিতৃপূজা ও মাতৃপূজা করতেন, তা হল আগম ও নিগম, একযোগে যার নাম তন্ত্র। পরে আর্য ও আর্যের জাতিগুলির মধ্যে মিশ্রণ হলে, তন্ত্র সমগ্র হিন্দু জাতির শাস্ত্র হয়। কিন্তু গোড়ায় তা ছিল শুধু পূর্বাঞ্চলীয়দের শাস্ত্র। হয়ত তা লিখিত হয়েছিল আজকের কোন অজ্ঞাত ভাষায়। অনেকে সাংখ্য দর্শনকেও এই আদিবাঙালীর রচিত বলে মনে করেন। সাংখ্য দর্শন মতে প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থাৎ জড় ও চেতনা, এ দুইয়ের সম্মেলনে জগৎ ও জীবনের উৎপত্তি হয়েছে। বাংলাব প্রধান ধর্মগুলিতেও জীবাঙ্কাকে প্রকৃতি এবং পরমাত্মা বা ঈশ্বরকে পুরুষ বলা হয়েছে এবং এ দুইয়ের মিলনকে আরাধনা বলা হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, তন্ত্র ও সাংখ্য দর্শনের সঙ্গে বাঙালীর যুগল-আরাধনার আদিতে কোন যোগ ছিল।

এই আদিবাঙালীরা ধান ও তুলার চাষ করতেন। বোধহয় স্বতন্ত্র কাপড় বোনাও আয়ত্ত করেছিলেন তাঁরা। তাঁরা মাছ ভাত খেতেন। তেল, হলুদ, পান, সুপরি ও সিঁড়রের ব্যবহার ছিল তাঁদের মধ্যে। তাঁদের সামাজিক সংগঠন সাম্যাপ্রিত ছিল। জাতকর্ম, বিবাহ ও শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে তাঁদের সম্পূর্ণ নিজস্ব ধরন ছিল। আর্য জাতিরা এই সব বৈশিষ্ট্যের জন্মই বোধহয় তাঁদের বিবেচের চোখে দেখতেন। বোধায়ন যন্ত্রে বাঙালীর উদ্দেশে প্রচুর কটুক্তি আছে, এ লক্ষ্য করার মতো।

আদিকাল থেকে ঐতিহাসিক কালে এসে অবধি উত্তর ভারতের সঙ্গে

বাংলার সংযোগ হয়েছে এবং মোর্শ ( খঃ পূঃ ৩০০ ) থেকে গুপ্ত ( খঃ ৫০০ ) যুগ পর্যন্ত আট শত বৎসরের মধ্যে উত্তর ভারত থেকে বৈদিক ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি ব্যাপক ভাবে বাংলায় সংস্কারিত হয়েছে। তার মানে আর্ধ্যবর্ত থেকে বৈদিক ( ব্রাহ্মণ্য ) ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেছেন। সমাজে বর্ণাশ্রম ও বৈদিক আচার-সংস্কার প্রবর্তন করেন ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। আর বৌদ্ধেরা মিশে যান পুরানো শিব-শক্তি-উপাসকদের সঙ্গে, যাব ফলে হয় সহজিয়া ধর্মের প্রতিষ্ঠা। অদ্বৈত একটা সমন্বয়ের আদর্শ দেখা যায় বাংলার এই সহজিয়াবাদের মধ্যে। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, সন্ন্যাস মতই জন্মেছে এই উৎস থেকে এবং পুরানো বাংলা সাহিত্যে এ-ই হল প্রধান আশ্রয়। বিস্ময়কর আর্ধ্যসংস্কৃতি, দর্শন ও পুরাণও বাংলায় এসেছে। কিন্তু বাংলায় মনোলোকে তেমন প্রাধান্য পায় নি সে সব।

দুঃখের বিষয়, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যে সমন্বয় দেখা যায়, সমাজে তা হয়নি। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভেদমুখী দৃষ্টিভঙ্গীই তা হতে দেখনি। বরং ঐষ্টম-নবম শতাব্দীতে কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করের হিন্দু-অভ্যুত্থান আন্দোলন এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লালের কোলীন্ সমাজে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা আরো বেশী করে কায়েমই করেছে। মুসলীম আনলে এই অস্পৃশ্যতাই ইসলাম নেন ব্রাহ্মণ্যের অমুগ্রহ লাভের আশায় এবং তখন থেকেই বাংলায় আমলস্বত্ব দুটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন-ধারা সৃষ্টি হয়। তবু বাউল, আউল, পীব, ফকির প্রভৃতির মাধ্যমে একটি হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ের চেষ্টা হয়, যাব ফলে সত্যপীবকে হিন্দুরা শিরনি দিয়েছেন, মুসলমানেরাও রাধাকৃষ্ণ পদাবলী লিখেছেন।

## বাংলা ভাষা

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে আজ যে তেরো-চাদ্দটি ভাষা চলে, দু-একটি ছাড়া তার সবগুলিই এখন থেকে প্রায় হাজার বছর আগে প্রাকৃত থেকে জন্মায়। প্রাকৃতের জন্ম আরো এক বা দেড় হাজার বছর আগে।

বৈদিক আর্যেরা যখন উত্তর এশিয়ার ভগ্না তীরবর্তী কোন স্থান থেকে ভারতবর্ষে এসে বসতি স্থাপন করেন, তখন এদেশে সভ্য দ্রাবিড়গোষ্ঠীর মানুষের বাস করতেন। তাঁরা কোন ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন, তা জানা যায় না। সিদ্ধ উপত্যকার মহেঞ্জোদাড়ো, পাঞ্জাবের হরপ্পা ও ( গুজবাট ) আমোদাবাদের লোথালে এই বিলুপ্ত সভ্যতার যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে,

তার মধ্যে পোড়ামাটির সীলমোহরে উৎকীর্ণ কতকগুলি বর্ণমালা দেখা যায়।  
 হুঃখের বিষয় এই লিপি পড়া যায় নি। গেলে হয়ত আর্যপূর্ব ভারতের ভাষার  
 সন্ধান পাওয়া যেত।

এখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষে লিখিত ভাষার সবচেয়ে পুরানো নিদর্শন পাওয়া  
 যায় ঋগ্বেদে, যা খৃষ্টজন্মের অনূন দু-হাজার বছর আগে লেখা। লক্ষ্য করার  
 বিষয় যে বেদ-উপনিষদের সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারতের যুগে অনেকটা সরল  
 হয়ে এসেছে। মহাকাব্যের যুগের সঙ্গে আবার কালিদাস-ভবভূতির যুগের  
 সংস্কৃতেরও একই রকম তফাৎ চোখে পড়ে। মোটের ওপর খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী  
 থেকেই সাহিত্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের পাশাপাশি প্রচলন দেখা যায়। কণিকের  
 (১ খৃঃ অঃ) সমসাময়িক কবি ভাস থেকে ভবভূতি (৮ খৃঃ অঃ) পর্যন্ত সংস্কৃত  
 নাটকে উচ্চশ্রেণীর পুরুষের মুখেই শুধু সংস্কৃত ব্যবহৃত হয়েছে, আর সাধারণ  
 মানুষ ও মহিলাদের মুখে বসানো হয়েছে প্রাকৃত।

অহুমান করা অসঙ্গত নয় যে প্রাকৃতই সর্বজনের কথোপকথনের ভাষা ছিল,  
 আর সংস্কৃত ছিল সংস্কৃতিচর্চার ভাষা। কেউ কেউ বলেন, আদি প্রাকৃতকেই  
 ঘষে মেজে নূতন করে গড়ে নিয়েছিলেন বৈদিক আর্যেরা, তাঁদের নিজেদের  
 আদিভাষার সঙ্গে মিশাল দিয়ে। তাই তার নাম সংস্কৃত।

যে ভাবেই হক, প্রাকৃত ভাষাও সারা ভারতে একরকম ছিল না। অঞ্চল-  
 ভেদে তার বিভিন্ন ধরন ছিল—মাগধী, শৌরসেনী, বৈদভী, নানা পর্যায়ের  
 প্রাকৃত ছিল। বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় ভাষার জন্ম মাগধী  
 প্রাকৃত থেকে। মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ থেকে ধীরে ধীরে এই ভাষাগুলির  
 উৎপত্তি হয়েছে।

অষ্টম-নবম শতাব্দীতে সঙ্কলিত প্রাকৃত পৈঙ্গল নামক কবিতা সঙ্কলনে এই  
 অপভ্রংশের নমুনা পাওয়া যায়। যেমন,

অগ্গর ভাস্ত কদলীপত্ত ।

গাইকি যিত্ত দুগ্ধসমুত্ত ॥

মৌলিমচ্ছ নালিয়াগুচ্ছ ।

দিজ্জয় কাস্তা খাএ পুণিবস্ত ॥

দশম শতাব্দীতে রচিত চর্যাপদে এই ভাষা বাংলায় পরিণত হয়েছে। যেমন,

টিলাত মোর ঘর নাহি পরিবেশী ।

হাঁড়িত ভাত নাএ নিতি আবেসী ॥

বেঙ্গল সংসার বাচম যায়।

দুহিল দুখ কিএ বেটে সামায় ॥

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বচিষ্ঠ কৃষ্ণকীর্তনে এই বাংলা আমাদের পবিচিত্ত বাংলাব পি ধবেছে। এখান থেকে বৈষ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গল সাহিত্যেব যুগ অতিক্রম কবে, ষৈবিশ শতাব্দীতে বাংলা গল্পভাষা সাহিত্যেব মাধ্যম হয়েছে এবং গত দুই শতাব্দীতে সেই ভাষাই আমাদের মাতৃভাষা-রূপে অসীম ঐশ্বর্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভাবতবর্ষেব আজকেব ভাষাগুলিকে অঞ্চল হিসাবে ভাগ কবলে মোটামুটি ষাট শ্রেণীতে ফেলা যায়। উত্তরাঞ্চলীয় ভাষাগোষ্ঠীব মধ্যে পড়ে হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী, কাশ্মিরী। পূর্বাঞ্চলীয় ভাষাগুলিব নাম আগেই কবা হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলে পাওয়া যায় গুজরাটী ও মারাঠী এবং দক্ষিণাঞ্চলে তামিল, তেলেগু, ফার্সী ও মালয়ালী। এব মধ্যে উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলেব ভাষাগুলি যেমন বস্পব ধর্মিষ্ঠ, দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলেব ভাষাগুলিও তেমনি একে অন্তেব জ্ঞাতি। দিও প্রত্যেকেবই নিজস্ব বর্ণমালা আছে, তবু শব্দভাণ্ডার ও ব্যাকরণবিমিতে এদেব ঐক্য লক্ষ্য কবাব মতো।

বাংলা ভাষাব প্রধান বিশেষত্ব এই যে তাতে সংস্কৃতেব মতো ক্লীবলিঙ্গেব ব্যবহাব নেই এবং সর্বনাম ও ক্রিয়াপদেব লিঙ্গানুযায়ী পবিবর্তন হয় না বাংলায়, যা হয় হিন্দীতে। বাংলায় একবচন থেকে বহুবচনে এলেও হিন্দীব মতো শব্দেব রূপান্তর হয় না, মূল শব্দেব সঙ্গে বা-বুন্দ-গণ ইত্যাদি যোগ কবে বহুবচন বোঝাতে হয়। বাংলা ভাষাব আব একটি বিশেষত্ব এই যে শব্দেব অন্তঃস্থিত ব্যঞ্জন বর্ণ প্রায় সর্বত্রই হ্রস্ব আকারে উচ্চারিত হয়। ওড়িয়াতে হয় সমস্ত শব্দই হলন্ত আকারে।

বলে বাখা দবকাব যে বাংলা ভাষায় যেমন সংস্কৃত-প্রাকৃত-সম্মত শব্দেব প্রাচুর্য দেখা যায়, তেমনি যায় দেশজ এবং বহিবাগত শব্দেবও। বিস্তৃত সংস্কৃত শব্দেব নাম তৎসম, সংস্কৃত-সম্মত শব্দেব নাম তদ্ভব। বিভিন্ন সময়ে আববী, ফার্সী, পর্চুগীজ, ডাচ, ফরাসী, ইংবেজী প্রভৃতি ভাষা এবং কোল, ওরাঁও, মুণ্ডা প্রভৃতি লোকভাষা থেকেও বিচিত্র পর্যায়েব শব্দমালা বাংলা ভাষাব পুষ্টিসাধন কবেছে।

বাংলা ভাষায় লেখা ভাড়া ও কথা ভাষাব মধ্যে মস্ত একটা পার্থক্য দেখা যায়। পল্প ও গল্প ভাষাব মধ্যেও পার্থক্য কম নেই। এমন কতকগুলো ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম আছে, যা শুধু পড়েই চলে। আধুনিক কালে কলকাতা অঞ্চলে

কথ্য ভাষাকে সাহিত্যে ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং গদ্য পদ্যের মধ্যেও সীমারেখা মোছার চেষ্টা চলছে। ভাষা চলন্ত জিনিস, জাতির সংস্কৃতি ও সমাজ-চেতনার ক্রমবিকাশের সঙ্গেই তা যুগে যুগে বিবর্তিত হয়। আজকের এই ভাষাও হয়ত আগামী দিনে আশুল বদলে যাবে।

সহস্র বর্ষব্যাপী বাংলা ভাষার এই বিবর্তনের পথে যে সাহিত্য জন্মেছে, এবার তার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা যাচ্ছে।

## প্রথম অধ্যায়

### শাক্ত ও শৈব সহজিয়া

পাল রাজাদের আমলে বাংলা দেশে বৌদ্ধ সহজিয়াদের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। বাঙালীরা আদিতে আর্যেতব জাতি। তাঁদের খাচার-ব্যবহার, খাদ্য-পরিচ্ছদ, পূজাপদ্ধতি, সবই বৈদিক আর্যদের থেকে পৃথক ছিল। তাঁরা পিতৃ-দেবতা শিব ও মাতৃ-দেবতা শক্তির আবাসনা করতেন, করতেন আরো অনেক দেব-দেবীর আবাসনা। ঋঃ পুঃ স্তূতিস্বয়ং অগ্নি মৌর্যেরা যখন মগধের শাসক, বাংলার বৃহৎ একাংশ ভূদান ছিল মগধের অন্তর্ভুক্ত। বৃহৎ চতুর্ধ-পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তদের আমলে গোটা বাংলাদেশই ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত। এষ্ট ঐতিহ্য বহুরূপে উত্তর ভারত থেকে বৈদিক ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব বাংলায় আসে। সমগ্র দেশ উঁচু মহান এই সময় থেকে বর্ণাশ্রমিক শ্রেণীভাগ ও ধর্ম-ব্যবস্থা মনে পড়ে, আর নীচু মঙ্গল আগত করেন বৌদ্ধধর্মকে।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর বৌদ্ধরা দুটি যান অর্থাৎ পথ য় ভাগ হয়ে যান—  
ঠানযান আর মহাযান। গাঁরা বুদ্ধের বিশুদ্ধ ধর্ম নিয়ে বহিলেন, তাঁরা ঠানযানী, আর গাঁরা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তান্ত্রিক দেব-দেবী, অদৃষ্ট, জন্মান্তর ইত্যাদির মিশ্রণ করলেন, তাঁরা মহাযানী। তিব্বত, নেপাল, অসাম, বাংলা ও উড়িষ্যা, এই পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলিতে মহাযানী মত ভাঙতে ভাঙতে কালচক্রযান, সহজযান, বজ্রযান, আরো কতকগুলি যান সৃষ্টি হয়। বাংলার জনসাদারণ নিলেন সহজযানী মত, তাই তাঁদের নাম হল সহজিয়া। তাঁরা শিব-শক্তি-অবাসনার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মকে মিশিয়ে নিলেন। তাঁদের মধ্যে গাঁরা সম্মাস, নৈবাগ্য ও অন্যান্য বৌদ্ধ অল্পশাসনের সঙ্গেই নৈবজ্জনা-কুপিণী শবরীর সঙ্গে নিবাগেব উপস্থাপন করতেন, তাঁরা হলেন সিদ্ধাই বা সিদ্ধাচার্য। গাঁরা শিব-শক্তির আবাসনা করতেন এবং বৌদ্ধদের ধর্ম, সজ্ঞ ও বুদ্ধ এই ত্রিবিক্রে ত্রিশূল-আকাবে শিবের হাতে তুলে দিলেন, তাঁরা হলেন যোগী। এছাড়া বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও তান্ত্রিক মোক্ষবাদে মিশিয়ে ধর্মপূজা করতেন, এমন আর একটা সম্প্রদায়ও ছিলেন। এই তিন শ্রেণীই কিছু কিছু সাহিত্য রচনা করেছিলেন পাল রাজত্বের চারশত

৭৭২ সাল ধরে। অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে। পালেরা নৈজেরা ছিলেন বৌদ্ধ, তাই বৌদ্ধদের তাঁরা ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

## চর্যাপদ

১৯১৬ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে চর্যাচর্যবিশিষ্ট নামে একখানি পুঁথি সংগ্রহ করেন। এই পুঁথিতে পাওয়া যায় সাতচল্লিশটি হৈয়ালি-রনের পদ বা কবিতা এবং পুঁথির নাম অনুসারে এগুলির নাম দেওয়া হয় চর্যাপদ।

হাজার বছর আগে পাল রাজাদের আমলে কাহ্নপদ, লুইপদ, ভুস্কপদ, বরোহবজ্জ প্রমুখ সিদ্ধাচার্যেরা লিখেছিলেন এই সব পদ। আজ আমরা যে বাংলা লিখি বা বলি, এদের বাংলা তা থেকে অন্তরকম। তবু এ যে বাংলা ভাষাই, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। সাধারণ ভাবে পদগুলি পড়তে সহজ ছড়াব মতো। কিন্তু সমস্ত পদই এমন এক সাংকেতিক পদ্ধতিতে লেখা যে এদের আসল বক্তব্য কি, তা বোঝাই দুষ্কর।

যেমন,

ভবনই গহন গভীর বেগ বাহী।  
দুঃস্বাস্তে চিখিল মধ্যে ন থাণী ॥  
ধীমার্ধে চাটিল সাক্ষম গঢ়ই।  
পারগামি লোঅ নিভর তরই ॥

অথবা,

কাআ তরুর পঞ্চ বি ডাল।  
চঞ্চল চীএ পইঠে কাল ॥  
দিট করিঅ মহামুহ পরিমাণ।  
লুই ভগই গুরু পুচ্ছিআ জান ॥

মাঝে মাঝে এদের বক্তব্য একেবারে অবোধ্য হয়ে ওঠে, অত্যধিক সাংকেতিক শব্দ ও প্রতীক-ব্যবহারের ফলে।

মোটকথা এইটুকু ধরা যায় যে শূন্য বা নির্বাণই হল জীবনের লক্ষ্য— সেখানে পৌঁছতে হলে 'বাসনার গতি' অতিক্রম করে মানুষকে মুক্ত বা উলঙ্গ হতে হবে। তাহলেই হবে বোধি বা নৈরঞ্জনা-লাভ।



এই তত্ত্বটি বোঝানোর জগ্রে চর্যাকাববা জগৎকে বলেছেন মায়া এবং মায়াকে আকাশকুসুম, শশকশঙ্গ, গন্ধর্বনগব ও নানা অলীক জিনিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন তাঁরা। এঁদের ব্যবহৃত ভবনদী, মনপবন, কায়াতক, কামনা-মুগ প্রভৃতি চিত্র-প্রতীকগুলি বাংলা ভাষায় এখনো ঘবোষা শব্দ হিসাবে চলে।

তত্ত্বকথার সঙ্গেই চর্যাপদগুলিতে তর্গনকাব মাহুদেব নানা সামাজিক বীতি-নীতি ও বৃত্তি-ব্যবসাব কিছু কিছু পরিচয় জানা যায়। সমাজে তখন অস্পৃশ্যতা ছিল। সাধাবণ মাহুদবরা তাঁত বোন, নোকা চালানো, মাছ ধবা, চান কবা, পাখী মাবা, এই সব কবাতেন। আব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও উচ্চজাতীয় গৃহস্থেবা শাস্ত্র পড়তেন, জপতপ কবাতেন, গীত-বাঞ ও নাট্য চর্চা কবাতেন। এই শেষোক্ত সমাজে মন্তপান এবং পাশাখেলাও চলত।

অবশ্য চর্যাপদগুলির সাহিত্য হিসাবে দান অতি সামান্য। প্রবাদবাক্যে পরিণত হবাব যোগ্য, কিংবা চতুর্বাগ্বিজ্ঞাস হিসাবে বক্ষণীয় পঙক্তি এতে অনেক আছে, কিন্তু কবিতা নেই। দু-একটা মাত্র পদে মাঝে মাঝে একটু ছবি পাওয়া যায়, যা কাব্যধর্মী। যেমন,

উঁচা উঁচা পবত,

উঁহি বসতি শববী বালী।

মহুদাসী পিচ্ছি পিবহিণ

গিমত গুঞ্জামালী ॥

সর্বজন-পরিচিত ‘ভুবনেখবীস্তোবে’ কালিকাব যে বর্ণনা আছে, তা অবিকল এই,

আবির্নিদাবজলশীকবশোভিতবজ্জাং,

গুঞ্জাফলেন পবিকল্পিত হাববপ্তিম্।

পত্রাংগুকামসি ওকান্তিমনস্ততস্থামাত্মাং,

পুলিন্দ তরুণীং সঙ্কৎ অব্যামি ॥

শাক্তের কালিকাই কি সহজিয়ার মোক্ষরূপিণী শববীর ছদ্মবেশে দেখা দেন নি এখানে ?

### নাথগাথা

চর্যাকারদের মতো বৌদ্ধ সহজিয়াদের আব একটি সম্প্রদায় ছিলেন। এঁদের নাম যোগী বা নাথ যোগী। বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্ঞ এই ত্রিবৈব উপাসনা এঁদের হাতে এসে শিব-শক্তির উপাসনায় পরিণত হয়।

এই সম্প্রদায়ের বিখ্যাত গুরু মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ এক সময় সারা দেশে এবং দেশের বাইরেও সম্মানিত ছিলেন। নেপালের গোর্খারা আদিতৈ গোরক্ষনাথের শিষ্য এবং উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরও তাঁরই নামের স্মৃতি বহন করছে।

এই নাথ সম্প্রদায়ও পাল আমলেই বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন। নানা কাহিনী ও উপকথার মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। নাথদের রচনা চর্যাপদের মতো বিচ্ছিন্ন গান নয়, তা কাব্যকাহিনী এবং এ পর্যন্ত দু-প্রস্থ কাহিনী পাওয়া গেছে। এক প্রস্থ হল গুরু মীননাথের মায়াম বন্ধ হওয়া এবং শিষ্য গোরক্ষনাথ কতৃক তাঁর উদ্ধারসাধনের কাহিনী, যার নাম মীনচেতন। আর এক প্রস্থ হল রাণী ময়নামতীর সাধনরহস্য এবং তাঁর পুত্র গোপীচাঁদের সম্ম্যাসগ্রহণের কাহিনী। দুই কাহিনীই যোগী ভিক্কুরা গ্রামে গ্রামে গেয়ে ফিরতেন।

ময়নামতী ও গোপীচাঁদের কাহিনীর যতটুকু গ্রেয়ার্সন কতৃক সংগৃহীত হয়েছে, তা পুরানো সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাষা তার পাঁচশো বছর আগের নয়। মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয়ের ভাষা আরো আধুনিক, বড় জোর তিনশত বছরের পুরানো হবে। এমন হতে পারে যে হযত নোকের মুখে মুখে গাথা আকাবে এক যুগ থেকে আর এক যুগ পর্যন্ত চলে আসার ফলেই এদের ভাষা সরল হয়ে গেছে, যা হতে পারেনি চর্যাপদের। তবে রচনার বিষয়বস্তু পুরানো এবং অনেক ক্ষেত্রে বেশ উপভোগ্যও। রাজা মাণিকচাঁদের স্ত্রী ময়নামতী স্বামী কতৃক পরিত্যক্তা হয়ে ফেরসা গ্রামে তপস্বী করতেন। হাড়িপা সিদ্ধাই তাঁকে জানান যে তাঁর ছেলে গোপীচাঁদ বারো বছরের জন্মে সম্ম্যাস না নিলে, অকালে মারা যাবেন। গোপীচাঁদ তখন মাতৃ-আজ্ঞায় সম্ম্যাস নিলেন এবং হাড়িপার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যথাসময়ে বাড়ী ফিরে এলেন...সংক্ষেপে এই হল গোপীচাঁদ কাহিনীর সারাংশ।

এর মধ্যে সম্ম্যাসের আগে গোপীচাঁদ ও তাঁর দুই পত্নী অল্পনা ও পত্ননার কথোপকথন থেকে ছোট একটি অংশ উদ্ধৃত করছি,

মোর সঙ্গে যাবু রাণী পছের শোন কাহিনী।

ফুবা কালে না পাবু অন্ন তুষার কালে পানি ॥

শালবন শিমুলবন চালিতে মান্দার।

যে ঠাই চলে হাড়িগুরু দিবসে আন্ধার ॥

## শাক্ত ও শৈব সহজিয়া

স্ত্রী আর পুরুষে যদি পহু বহিয়া যায় ।  
হেন বা ঘুষ্ঠের বাঘ আছে নারী ধর্যা খায় ॥  
রাণীরা কিছু এতে ভয় পেলেন না । তাঁরা বললেন,  
থাকনা কেনে বনের বাঘা তাক না করি ডর ।  
নিত কলঙ্ক মরণ হক স্ত্রামির পদের পর ॥

গোরক্ষবিজয়-কাহিনীর বিষয় হল কদলীপত্নে গুরু মীননাথ তপস্তাদ্রষ্ট  
হয়ে রূপসীদের হাতে বন্দী হয়ে আছেন । নর্তকীবেশে গোরক্ষনাথ সেখানে  
এলেন এবং কায়াসাধন মন্ত্র প্রচার করলেন মাদল বাজিয়ে । মীননাথের  
চেতনা ফিরল, তিনি আবার বুললেন রূপ-লাভ্য স্বপ্ন-সম্পদ সবই ক্ষণিকের ।  
প্রকৃত সত্যবস্তু হল মহাজ্ঞান, যা তিনি হারিয়েছিলেন পার্বতীর অভিশাপে ।

গোরক্ষনাথের তত্ত্বকথাগুলি এই রকম,  
প্রদীপ নিবিলে গুরু কি করিবে তেলে ।  
আইল বাকিয়া কিবা ফল জল আগে গেলে ॥  
মূল কাটা গেলে গুরু না জীয়ায় গাছ ।  
বিনি জলে কথা ত শুনিছ ভীমে মাছ ॥

শৈব ও বৌদ্ধধর্ম মিশেই যোগীধর্ম সৃষ্টি হয়েছিল, একথা আগে বলেছি ।  
এক দিকে তাই যোগীরা সম্যাস, নির্বাণ ও শূত্রের তপস্তা করতেন, অণ্ডদিকে  
শিব-দুর্গার আরাধনা করতেন এবং তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়কুঁক ও বশীকরণ ইত্যাদি  
তন্ত্রাচারে অভ্যস্ত ছিলেন । মীননাথ গোরক্ষনাথে প্রথম দিকের এবং  
হাড়িপা ও ময়নামতীতে দ্বিতীয় দিকের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে । সুরুর মামুদ,  
ফৈজুল্লা ও ভবানী দাসের এবং আরো কোন কোন কবিদ গোরক্ষবিজয় বা  
মীনচেতন বই আছে ।

## শূত্রপুরাণ

এই পর্যায়ের আর একটি বিশিষ্ট রচনা হল শূত্রপুরাণ । এর লেখক  
রামাই পণ্ডিত তদানীন্তম মেদিনীপুরের অন্তর্গত যাজপুর অঞ্চলের লোক এবং  
সম্ভবত তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে জীবিত ছিলেন । মেদিনীপুর অঞ্চলে  
এখনো পণ্ডিত-উপাধিধারী ডোম-পুরোহিতদের একটি সম্প্রদায় দেখা যায়,  
যারা ধর্ম ঠাকুর এবং হাড়িবি চণ্ডীর পূজা করেন । হয়ত রামাই পণ্ডিতও  
এমনি কোন সহজিয়া-পরিবারভুক্ত ধর্মদেবতার পুরোহিত ছিলেন এবং বৌদ্ধ

শূন্যবাদ ও নৈরঞ্জনা-তত্ত্বের আলোকে তিনি স্রষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের রহস্য ব্যাখ্যা করেছিলেন।

নাহি রেক নাহি রূপ নাহি ছিল বস্তু চিন।  
নাহি আকাশ নাহি স্বর্ষ নাহি ছিল রাজি দিন ॥  
শূন্যেতে ভ্রমণ প্রভুর শূন্যে করি ভব।  
কাহারে সৃজিব প্রভু তাবেন মায়াধর ॥

বলা দরকার যে শূন্যপুরাণে স্রষ্টিতত্ত্বের মতো প্রলয়তত্ত্বটিও সুন্দর।

শূন্য পুর্বাণের ভাষা দেখে অনেকে একে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের রচনা বলেছেন। হতে পারে, কিংবা নাথগাথার মতো বহুল প্রচারের ফলে শূন্যপুর্বাণেরও যুগে যুগে ভাষাগত রূপান্তর হয়ে থাকতে পারে।

এ সিদ্ধান্ত করার প্রধান কারণ হল ‘নিরঞ্জনের রূপা’ নামে বামাই পণ্ডিতের নামাঙ্কিত বড় একটি কবিতা। এতে দ্বাদশ শতাব্দীতে তুর্কী অভিযানের ফলে দেশের ধর্মক্ষেত্রে কি বিপর্যয় হয়েছিল, তার চিত্র আছে।

আপুনি চণ্ডিকাদেবী                      তেঁহ হৈলা হায়াবিবি,  
পদ্মাবতী হৈলা বিবি নূর।  
জতেক দেবতাগণ                      হৈঞা সতে এক মন  
প্রেরণ করিল যাজপুর ॥  
দেউল দেহারা ভাঙ্গে,                      কাড়্যা কিড়্যা খাষ রঙ্গে,  
পাখড় পাখড় মুখে বোল।  
ধরিয়া ধর্মের পায়                      রামাঞ পণ্ডিতে গায়  
ই বড় বিঘম গণ্ডগোল ॥

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### বৈষ্ণব সহজিয়া

একাদশ শতাব্দীতে পালেদেব পব বাংলাব শাসনক্ষমতা যায় সেনদেব হাতে। তাঁরা এসেছিলেন দাক্ষিণাত্যেব কর্ণাটক থেকে এবং তাঁরা ছিলেন বৈষ্ণবমতাবলম্বী হিন্দু। এই বংশেব বঙ্গাল সেন সমাজে বৌদ্ধীভূতপ্রথা প্রবর্তন কবেন। সমাজেব তথাকথিত উঁচু ও নীচু শ্রেণীগুলিকে তিনি গণ্ডিবদ্ধ কবে দেন এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু, যোগী ও সহজিয়াদেব সমাজ থেকে উৎখাত কবেন। এমন কি, তাঁদেব তিকা দেওয়া ও নাকি নিষিদ্ধ হয়। সাধারণ মানুষবা অনেকে তখন বাজধর্ম হিসাবে বৈষ্ণবধর্ম নিনেন এবং শিব-শক্তি আবাদনা রূপান্তরিত হল বাধা-কৃষ্ণ আবাদনায। গাঁবা পুর্বানো সহজিয়া মত আঁকড় থাকলেন, তাঁবা হয়ে গেলেন সমাজ-বহির্ভূত। এঁবাই হলেন বাউল।

আদি বৈষ্ণবধর্ম বাংলায় এসেছিল দক্ষিণ থেকে। দক্ষিণেব শ্রীমদ্ভাস্য ছিলেন ভক্তিবাদী এবং তাঁদেব সঙ্গেই ছিলেন আলোয়াবা ভাব-সানন্দদেব একশ্রেণী, গাঁবা সম্মীভাবে আবাদনা কবলেন। সেন রাজাদেব প্রভাবে এঁদেব মতই হয়ত বাংলায় এসেছিল। তবে এঁদেব আবাদনায বাধা ছিলেন না, ছিলেন নান্দীনাই। হয়ত তিনিই বাংলায় বাবা হয়ে গেছেন, কারণ এই শব্দটির অর্থ নাকি আবাদিকা। মোটকথা এই আদি বৈষ্ণব বা বৈষ্ণব সহজিয়াবাই হলেন বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তিস্থাপক। এঁবা বাধা-কৃষ্ণ আবাদনায যে বাঁতি প্রবর্তন কবেন, তা বাংলায়, উড়িষ্যায়, আসামে ও মিথিলায় প্রচুর সাহিত্যবচনাব প্রেবণা দেয। এই প্রেবণাতেই দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব এবং চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিছাপতি ও লডু চণ্ডীদাসের উদ্ভব হয়। মোড়শ শতাব্দীতে যখন শ্রীচৈতন্যেব আবির্ভাব হয়, তিনি এঁদেব বচনাব দ্বাবাই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

চণ্ডীদাস বিছাপতি,

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীতি,

কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।

স্বরূপ দামোদর সনে,

মহাপ্রভু বাত্রি দিনে,

গায় পড়ে পবম আনন্দ ॥

মহাপ্রভুব পার্শ্বচর নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীবভদ্র সহজিয়া বৈষ্ণবদেবই গোড়ীয় বৈষ্ণবে রূপান্তরিত কবেন। কেউ কেউ বলেন, উক্তর ভাবতের মুসলীম দরবাব থেকে স্মৃতিদেব মতবাদ বাংলায় এসেছিল, তা থেকে বৈষ্ণব ভাব-সাধনাব জন্ম। এ কথা বোধহয় সত্য নয়, কাবণ দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন মুসলীম অভিযান হয়, তখনই জয়দেব দেখা দিয়েছেন।

### জয়দেব

জয়দেব বাংলাব আদি বৈষ্ণব কবি। তিনি অবশ্য বাংলায় লেখেন নি, লিখেছেন সবল সংস্কৃত। কিন্তু বাংলা দেশে বাধা-ক্লেশ লীলা-বিষয়ক পদ তিনিই প্রথম লিখেছেন। বৈষ্ণব কবিদেব তাই তিনি গুরুস্বরূপ।

বীবভূম জেলাব কেঁহুলি গ্রামে জয়দেবের জন্ম। তাঁর সহধর্মিণীৰ নাম পদ্মাবতী। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বাধা-ক্লেশ লীলা গান কবতেন। জয়দেব সম্ভবত যৌবনে পীযুষলহরী নাটক লেখেন এবং প্রৌঢ় বয়সে গীতগোবিন্দ কাব্য লিখে গোড়েশ্বর লক্ষণ সেনের সভাকবি হন। তাঁর বচনায় তাঁর সমসাময়িক কবি শবণ, উমাপতিধর ও ধোয়ীৰ উল্লেখ আছে।

কেউ কেউ বলেন জয়দেব উড়িষ্যা দেশবাসী। অবশ্য উড়িষ্যাতেও কেঁহুলি বা কেন্দুবিল্ব গ্রাম আছে এবং গীতগোবিন্দ ও পীযুষলহরীর প্রচাব আছে জনসাধারণের মধ্যে। ওড়িয়া সমাজ বলেন, জগন্নাথের আদেশে কবি গীতগোবিন্দ বচনা কবেন এবং দেবদাসী পদ্মাবতীকে ভার্য্যরূপে গ্রহণও করেন ঈশ্ববান্দেশে। বলা বাহুল্য এ সবই অসুমান ও কিংবদন্তী। জয়দেব বাঙালীই, তাতে আব সন্দেহ নেই। তাঁর বচনায় নদী, মাঠ ও আকাশের যে বর্ণনা আছে, নব-নারীৰ পোশাক-পবিচ্ছদেব যে উল্লেখ আছে, তা সম্পূর্ণ বাংলাব। কেঁহুলিতে আজো প্রতি বৎসব মহাসমাবোহে জয়দেবের মেলা হয়, এটাও লক্ষ্য কবাব মতো।

এটা লক্ষ্য কবাব মতো যে ভাগবত, হবিবংশ, মহাভারত, বিষ্ণুপূৰাণ ইত্যাদি ক্লেশ-লীলা বিষয়ক কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে ক্লেশের লীলা-সহচরীরূপে রাধাব নাম নেই। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা পদ্মপূরণ, ব্রহ্মবৈবর্ত-পূরণ ইত্যাদিতে আছে। কাজেই দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব রাধার সন্ধান পেলেন কোথা থেকে? এই জন্তে অনেকের অসুমান, রাধা জয়দেবেরই সৃষ্টি

এবং আরাধনাময়ী ভক্তির প্রতীক বলেই তাঁর নাম রাখা। এ অমুমান একেবারে মিথ্যা না হতে পারে।

জয়দেব যদিও গীতগোবিন্দ সংস্কৃতি লিখেছেন, কিন্তু তাঁর ভাষা এত সবল, চন্দোবদ্ধ ও পদযোজনা এত স্বললিত যে তা প্রায় বাংলাবাই কাছাকাছি বলা যেতে পারে। তিনি নিজেই বলেছেন,

যদি হবি অবণে সরসং মনো

যদি বিলাস কলাস্থ কুতুহলম্।

মধুব কোমল কান্ত পদাবলীং

শুণু তদা জয়দেব সবস্তুম্ ॥

সত্যিহি তাঁর ‘মৈদৈমৈদ্ববমমবং’ বা ‘দাবসনীবে যমুনাতীবে, বসতি বনে বননানী’ প্রভৃতি পদগুলি অপূর্ব মধুর বচন। তবে জয়দেবের লেখায় শব্দ-চাতুর্ঘ্যই প্রধান। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের বচনাম যে ভাবের ত্রৈধর্য ও গল্পভূত্বের গভাবতা দেখা যায়, জয়দেবে তা নেই। জয়দেবের বচনাব লীচ ও সব সময় স্নেহের নয়। এই জন্মেই কোন বিদ্যাত সম্মানোচক বৌদ্ধ কব বসেছিলেন, গীতগোবিন্দে গীত আছে, গোবিন্দ নেই।

সবাই জানেন, লক্ষ্মণ সেনের ‘অমলেন বক্তৃষাব খিলজী বাংলা দখল করেন, আর হিন্দু ব’জ্যেব অবলান হয় সেখানেই। জয়দেবের দাবতাব স্তোত্রে ‘স্নেহনিবহানবনে কদমসি কববাল’ শ্লোকটিতে কি এনি আভাস ধ্বনিত হয়েছে?

## বিজ্ঞাপতি

জয়দেবের দৃশ্যে বহুব পবে মিথিলায় জন্মান কবি বিজ্ঞাপতি। তাঁর পিতার নাম গণপতি ঠাকুর। পঞ্চগোড়ের অদাখব শিব সিংহের তিনি ছিলেন সভাসং-কবি। কবি নিজেই বলেছেন বাজা তাঁকে বিসম্বা নামে একখানি গ্রাম উপহাব দেন এবং বাজমহিন্দী লছিমাব অতিপ্রায় অমুসাবে তিনি রাধ-কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক পদ রচনা করেন। যদিও পাবিবাবিক ধর্মে তিনি শৈব ছিলেন এবং হর-গৌরী-লীলা নিয়ে লেখা পদও তাঁর অনেক আছে।

বিজ্ঞাপতি মিথিলার কবি, তাঁর ভাষা বাংলা নয়। তবু বাংলা সাহিত্যেব আলোচনা থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রথমত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, সেই শ্রীচৈতন্য তাঁর রচনাব দ্বারা প্রভাবান্বিত

হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত গোবিন্দদাস, শেখব প্রমুখ বাংলাব বিশিষ্ট কয়েকজন বৈষ্ণব কবি তাঁব ভাষাব অল্পকবণে একটি কাব্য ভাষা সৃষ্টি কবেছিলেন, যার নাম ব্রজবুলি এবং যে ভাষায় ববীন্দ্রনাথ পর্যন্ত লিখেছিলেন তাহুসিংহেব পদাবলী। তাছাড়া সেদিন বাংলা, উড়িয়া, আসাম ও মিথিলা একই সংস্কৃতিব অহুগামী ছিল। পবস্পাবেব মণ্যে তাই অস্তবঙ্গ আদান প্রদান ছিল তাঁদেব সব বিষয়েই।

বিদ্যাপতি অতুলনীয় কবি। তাঁব বচনাব ছন্দোমার্ধ্য যেমন অসাধাবণ, শব্দ-প্রয়োগেব নৈপুণ্য তেমনি লক্ষ্য কবাব মতো। উপমা ব্যবহাবেব কৃতিত্বে কেউ কেউ তাঁকে কালিদাসেব সমকক্ষ বলেন। অবশ্য অত্যধিক উপমা প্রীতিব ফলে মাঝে মাঝে তাঁব বচনা একটু কৃত্রিম মনে হয়। তাছাড়া অশ্লীলতা-দোষও আছে কোথাও কোথাও।

. তা সত্ত্বেও বিদ্যাপতিব কবিতা যেমন মধুর, তেমনি গভীর।

যেমন,

জনম অবদি হাম রূপ নেহাবছ  
 নয়ন না তিবপিত ভেল।  
 সোহি মধুব বোল অবণহি শুনল  
 ক্রতিপথ পবশ না গেল।  
 কত মনু যামিনী বভসে গোয়াষহু,  
 না বুঝহু কেছন কেণা।  
 লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে বাখহু,  
 ওবু হিয়া জুড়ন না শেনি ॥

কিংবা,

আজু মঝু গেহ গেহ কবি মানলু,  
 আজু মঝু দেহ ভেল নেহা।  
 আজু বিহি মোহে অহুকুল ভগল,  
 টুটল সব সন্দেহা ॥

একটা জিনিস এই স্ত্রে লক্ষ্য করাব মতো যে চৈতন্য-পববত্তী বৈষ্ণব কবিরা কৃষ্ণকে কেউ ভগবান বলেন নি। তাঁদেব কৃষ্ণ কান্ত বা সখা। কিন্তু বিদ্যাপতিব কৃষ্ণ সর্ষশক্তিমান ভগবান। তাই তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য কবে বলেছেন,



কিধে মানুষ পশু পাখী ভই জননিষে

অথবা কীট পতঙ্গে ।

করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন

মতি রহ' তুয়া পরসঙ্গে ॥

আপন কবিত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞাপতির ধারণা ছিল খুব উঁচু । তিনি বলেছেন,

বালচন্দ বিজ্ঞাপতি ভাষা ।

ছ'ছকো না লাগই দুজ্জন হাসা ॥

এ পরমেশ্বর হরশির সোহই ।

ও নিশচয় নায়বী মন মোহয় ॥

## বড়ু চণ্ডীদাস

কৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস বিজ্ঞাপতির সমসাময়িক কবি এবং খাঁটি বাংলা ভাষায় রাধা-কৃষ্ণ লীলা নিয়ে কাব্য লিখেছেন তিনিই প্রথম । কিন্তু তিনি কোথায় জন্মান, বাবুজনের নাম্বুবে, না বাবুড়ার ছাতনায়, তা নিয়ে যেমন ঠক আছে, তেমনি আছে চণ্ডীদাস একজন না দু-জন, তা নিয়েও ।

আসলে কৃষ্ণকীর্তন বইটি প্রথম বাবুড়া থেকে আবিষ্কৃত হয় ১৯১৮ সালে এবং পরাকা করে দেখা যায় যে তা পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেব রচনা । তার রচয়িতার নাম চণ্ডীদাস, তিনি বড়ু, অর্থাৎ বাক্সগ সন্তান এবং বাসলী বা বাস্তলী দেবীর পূজারী ।

এখানেই শুরু হয় চণ্ডীদাস-সমস্কার । বাংলা দেশে বহুকাল থেকে কবি চণ্ডীদাসের নাম ও রচনা অপরিচিত । ‘সুপের লাগিয়া এদর বঁদিহু’, ‘কি মোহিনী জান বঁধু’, ‘আমি সাগবে ডুবিয়া সাধনা কবির’, ‘এস এস বঁধু এস’ প্রভৃতি পদগুলি তাঁর নামে চলেছে চিরদিন । সবাই জানতেন, তিনি নাম্বুরের লোক, বাস্তলী দেবীর পূজা কবতেন এবং রামী রজকিনী তাঁর সাধন-সঙ্গিনী ছিলেন । কৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত হওয়ার পরে বোঝা গেল, এই বই আর ঐ সব পদ একজনের লেখা নয় । এখন থেকেই ছুই চণ্ডীদাসের সিদ্ধান্ত চলিত হয়েছে । যদিও কেউ কেউ বলেন, কৃষ্ণকীর্তন অপ্রচলিত ছিল বলে, তার ভাষা সাবেকী থেকে গেছে, আর পনাবলী গায়কদের কণ্ঠে প্রচারিত হয়েছে বলে, তার ভাব ও ভাষা বদলাতে বদলাতে সরল এবং সুন্দর হয়ে গেছে । কাজেই চণ্ডীদাস একজনও হতে পারেন !

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ, বড়াই বুড়ীর মধ্যস্থতায় দু-জনে পবিচয়, দু-জনের স্বপ্নস্বামী লীলা, তারপর কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যে কৃষ্ণকে পবন পুরুষ এবং রাধাকে পরমা প্রকৃতি ত নয়ই, তদ্রলোক এবং তদ্রমহিলা রূপেও চিত্রিত করা হয়নি। তাঁরা একে অথকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করেন, এমন অশিষ্ট আচরণ করেন যা বর্বর অসভ্যদের উপযুক্ত। তাহাড়া ছুই-এক স্থানে ভিন্ন এ বইয়ে মতঃ কবিত্বের চিহ্নও বড় বেশী পাওয়া যায় না।

অনেক বাছাবাছি করে একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে,

কেনা বাঁশী বাএ বডাঘি কালিনা নই কুলে।

কেনা বাঁশী বাএ বডাঘি এ গোঠ গোকুলে ॥

আকুল শবীল মোর বেয়াকুল মন।

বাঁশীব শবদে মো আউলাইলা রঞ্জন ॥

বড় চণ্ডীদাস যে গীতগোবিন্দ পড়েছিলেন, তাব পবিচয় আছে তাঁর কাব্যে। কোন কোন স্থানে জয়দেবের ছন্দ অমূল্যসরণও ববেছেন তিনি। কিন্তু সবস্বল্প জড়িয়ে ভাবার নিক থেকে কৃষ্ণকীর্তন যেটো মূল্যবান, সাহিত্যের নিক থেকে তা নয়। বাংলা দৈক্ষ্য কাব্যের যে অপরূপ মহিমা পবনচরী কালে সৃষ্টি হয়, এ তার ক্ষণ পূর্বাভাস মাত্র এবং সেই জন্তেই লক্ষণীয়।

পদকল্পতরুর একটি পদে আছে, গদ্যভাষে কোন স্থানে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে সাক্ষাৎ হয়েছিল।

বিদ্যাপতি শুনি চণ্ডীদাস গুণ

দরশনে ভেল অহুবাগ ॥

ছুট উৎকণ্ঠিত ভেল।

সঙ্গ হি রূপ নারায়ণ কেবল

বিদ্যাপতি চাঁল গেল ॥

এই চণ্ডীদাস বড় চণ্ডীদাস কি ?



## তৃতীয় অধ্যায়

### পুরাণ প্রচারকেরা

সমাজের নীচু মহলে যখন শিব-শক্তি ও রাধা-কৃষ্ণ আবাধনাব দ্বন্দ্বের চলেছে বকমাবি মনঃমুগ্ধ আড়ম্বুর্ক, কাবণপান ও অত্যাচার কদাচাবেব আদ্যপত্য, উঁচু মহলের দিগ্বানবা তখন অস্ত্রভব কবলেন যে হিন্দু সংস্কৃতির প্রধান আশ্রয় যা, বামাষণ মহাভারত ও ভাগবত, বাংলা ভাষায় ছাব সম্পদ দেশবাসীর হাতে পৌঁছে না দিলে তাঁদের চিত্তশুদ্ধি হবে না। তাঁরা উচ্চ আদর্শ বা মহৎ জীবন-বোধও লাভ কববেন না। এষ্ট উদ্দেশ্যে পঞ্চদশ শতাব্দীর কুতিবাস বামাষণ লিখনেন, মাল্যদাস বঙ্গ লিখনেন ভাগবত। এঁদের প্রায় একশত বৎসর পবে কাশীদাস দাস মহাভারত বচনা কবলেন।

বামাষণ মহাভারত এবং ভাগবত আবেব কোন কোন কবিও লিখেছেন। যেনন কবি অনন্ত্যামেব বামাষণ আছে, সঞ্জয় ও ক্রীতদাসন্দীর মহাভারত আছে। ভাগবতও পদ্মসুদান এবং আবেব কোন কোন কবি লিখেছিলেন। কিন্তু আবেব তিন কবিই দেশে প্রসারিত লাভ কবেছেন। শুধু সন্থিন ন্য, আজ পর্যন্ত এঁরা বাংলাব ছেটে বড় সব মহলে সমান আদবে গঠিত। মাষ্টরেল মধুসূদন কুতিবাস ও কাশীদাসেব জনপ্রিয়তাৰ উল্লেখ কবে বলাব, এঁদের বই স্কুলসময়ও পড়ে, বর্তমানসময়ও পড়ে। সত্যবদুই এঁরাটি কথা। গত চাব-পাঁচশো বছর পবে এই দুই কবি বাঙালাকে ধর্ম-কর্ম আচাব-সংস্কার শিলিয়েছেন। সুখে ও দুঃখে গোটো পাঠিকে নিয়েছেন প্রচুর আশা ও সাহস। বাংলা ভাষায় বহু কাব্য, নাটক, পাচালী লেখা হয়েছ, সব হয়েছ এঁদের পদাক অনুসরণ কবে। প্রকৃতপক্ষে এই দুই কবিব হাত অনন্ত্য যেন সাবা দেশেব সমাজ ও সংস্কৃতিবদেই গড়ে তুলছে। যাব মাল্যদাসেব বচনা পড়ে কুতর্থা বোধ কবেছেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্য, তাঁর কুতিবাস সম্বন্ধে তাই যাব বেশী বলাব কি আছে ?

### কুতিবাস

বামাষণ-রচয়িতা কুতিবাস বাংলাব আদিকবি-রূপে সম্মানিত। তাঁর আগে, বাংলা ভাষায় যা লেখা হয়েছ, সাহিত্য হিসাবে তার মূল্য সামান্যই।

মাতৃভাষার মাধ্যমে সমগ্র বামাষণকে উপস্থিত কবে, সববকম ভাব ও অমুভূতিই যে বাংলায় প্রকাশ করা যায়, কৃষ্ণিবাসই তা প্রথম প্রমাণ কবেছেন।

নদীয়া-শান্তিপুত্রের অদ্ববতী ফুলিয়ায় কৃষ্ণিবাসের জন্ম। খৃষ্টীয় ১৩৯৯ নাগাদ তাঁর জন্ম হয়। গ্রাহিবপুত্রের স্বাধীন বাজা গণেশ বা কংসনাবাসণ বা দমুজমর্দন দেবের পৃষ্ঠপোষকতা পান তিনি এবং তাঁরই উৎসাহে বাংলা ভাষায় বামাষণ রচনা করেন।

কৃষ্ণিবাস বার্মাকি বামাষণের ছবছ অমুবান করেন নি। কোথাও কোথাও আক্ষরিক অমুসরণের চিহ্ন দেয়া গেলেও, আসলে তাঁর বামাষণ হল মূল-অবলম্বনে স্বাধীন রচনা। মূলের আখ্যানাংশ অনেক জায়গায় কবি পরিবর্তিত কবেছেন, অনেক উপাখ্যান যেমন অঙ্গন বাগদার, ভস্মলোচনের কাহিনী, তিনি নুতন করে সংযোজন কবেছেন। বিস্তৃত সব কিছুই সমবাসে রচনায় এমন একটি শ্রী ও সামঞ্জস্য স্থাপন কবেছেন তিনি, যা অতুলনীয় শ্রীরূপ পরিচয়।

একটা জিনিস কোন পাঠকেরই নতুন এড়াই না যে কৃষ্ণিবাসের বাম, মাণা, লক্ষণ, বাদণ, বিভীষণ, মন্দোদরী, সত্যৈ চবিত্রে ও চিত্তায় পুনোপুনি বাঙালী। তাই তবণী সেনের কাটাগুণ্ড বাম বাম ধ্বনি বন্দ। তাই সীতাহরণের পদে বাম ও লক্ষণ বালকের মতো আত্মনাদ কবে বানেন। রচনায় এই অমুভবনাই কবি কৃষ্ণিবাসকে বা লাভ ববে বলে সমাদৃত কবেছে।

অদম্য কৃষ্ণিবাসের রচনা আজ আমরা যে ভাবে পাঠি, পাব ওপন নিশ্চয় প্রচুর ঘণা-মাজা হয়েছে। গ্রাহিবপুত্রের মিনাবীবীবা যখন কৃষ্ণিবাসী বামাষণ প্রথম ছাপিয়ে প্রকাশ করেন, তখন জয়পোপাল তর্কালংকার তাঁর পুঁথি সম্পাদন করেন। অনেক মনে করেন, রচনা সর্বল ও সুখপাঠ্য করার উত্তে অনেক জায়গানেই তিনি কলম চালিয়েছিলেন। কাবণ নলিনীকান্ত ভট্টশালী যে বামাষণের পুঁথি আবিষ্কার করেন, তাঁর ভাষা প্রচলিত বামাষণের ভাষার মতো প্রোঞ্জল ও প্রসাদগুণসম্পন্ন নয়।

কৃষ্ণিবাসের রচনার একটু নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে,

গোদাবরী তীবে আছে কমল কানন।

তথা কি কমলমুখী কবেণ ভ্রমণ ॥

পদ্মালয়া পদ্মাবতী সীতারে পাইয়া।

বাগিলেন পদ্মবনে বুঝি লুকাইয়া ॥

আপন কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে কৃষ্ণিবাসের মনে ছিল দৃঢ় আশ্বস্ত্য। তাই তিনি বলেছেন,

সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীবে ।  
না না ছন্দ না না তান আপনা হইতে শ্রুবে ॥

\* \* \*

যত যত পণ্ডিত আছে ভুবন ভিতরে ।  
আমার বিজ্ঞাষ কেহ আঁটিতে না পারে ।

\* \* \*

কৃষ্ণিবাস বলে গীত সবস্বতীদেব বলে ॥

### মালাধর বসু

কৃষ্ণিবাসের সমকালে বা অল্প পূর্বে জন্মান মালাধর বসু । কৃষ্ণিবাস যেমন বামাযশের, ইনি তেমনি ভাগবতের ভাবানুবাদ করেন । এঁর বইয়ের নাম শ্রীকৃষ্ণবিজয়, যা বিচিত্র হয় আনুমানিক ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে ।

বর্তমান জেলায় কুলীন গ্রামে তাঁর জন্ম । গোড়েখর চন্দ্রেন শা তাঁকে গুণবাজ খাঁ উপাধি দেন । গ্রন্থপরিচয় হিসাবে কবি লিখেছেন,

কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস ॥  
বাপ ভগীৰথ মোর মাতা ইন্দুমতী ।  
বার পণ্য হইতে মোর বিয়ায়ে মতি ॥  
গুণহীন অধম মুগ্ধ নাই কোন জ্ঞান ।  
গোড়েখর দিলো নাম গুণবাজ ধান ॥

মালাধর সংগ্রহ ভাগবত বাংলায় বেছেন নি, মাত্র বুদ্ধাবন-লীলার অংশ-টুকুকেই কাব্যাকারে প্রসারিত করেছেন । মূলগ্রন্থের দশম ও একাদশ স্কন্ধ পুনর্লিখনে কবি কৃষ্ণক্ক কদ দেখান নি । এক দিকে যেমন রচনা তাঁর স্বচ্ছ সন্দেহ, অন্যদিকে বচনায় তিনি তর্মান সর্বত্র সংযম ও শুচিতার ভাবটি সার্থকভাবে বজায় রেখেছেন ।

মালাধরের বচনাব নিদর্শন হিসাবে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের শেষাংশ থেকে কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করা হল,

সর্বঘণ্টে থাকি সেহ সকলে করায় ।  
কেহ তাঁরে নাহি দেখে তাঁহার মায়ায় ॥

স্বাক্ষরপত্র রূপে তাবিত না পারি।  
সকল হৃদয়ে গৌসাই রন তমু ধরি ॥

গোপীরা কৃষ্ণকে কে কিতাবে সাজাবেন, সেই প্রসঙ্গে মালধর লিখেছেন,  
কেহ বলে পরাইমু পীত বসন।  
চরণে নুপুর দিমু বলে কোল জন ॥  
কেহ বলে বনমালা গাঁথি দিব গলে  
নগিময় হার দিমু কোল সখী বলে ॥

আগেই জয়দেব-প্রসঙ্গে বলেছি যে ভাগবতে জীবাদা নেই, গীতগোবিন্দই প্রথম তিনি দেখা দিয়েছেন চিন্ময়ী ছায়াবর্ণী শক্তিরূপে। মালধর সেখান থেকেই বোধহয় আহরণ করেছেন রাসাতত্ত্ব এবং তাঁকে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে উপস্থিত করেছেন। যেমন,

কানু বলে সত্য কহি বিনোদিনী রাই।  
নবীন কাণ্ডারী আমি নোকা নাহি বাই ॥

শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণবধর্মকে দার্শনিকতাসমৃদ্ধ নতুন মতবাদ রূপে প্রতিষ্ঠা করার আগে যেসব গ্রন্থ তার পথ প্রস্তুত করেছিল, মালধরও বই তার মধ্যে প্রধান। এই বই মহাপ্রভু পাঠেছিলেন এবং মালধরের পোষ্য দত্ত বামনন্দকে শ্রদ্ধাচ্ছলে তাই বলেছিলেন,

তোমার কা কথা তোমার গ্রামেব কুবুদ।  
সেহ মোর প্রিয় অত জন বহু দূব ॥

## কাশীরাম দাস

কৃতিবাসী রামায়ণের মধ্যে কাশীদাসী মহাভারতও বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত। কাশীরাম আনুমানিক ১৬০০ খৃষ্টাব্দে বর্তমান জেলার সিডি গ্রামে জন্মান।

নিজের বংশ পরিচয় দিয়ে কবি লিখেছেন,  
ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিডিগ্রাম।  
প্রিয়ঙ্কর দাসপুত্র সুধাকর নাম ॥  
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।  
কৃষ্ণদাসমুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥

অলি হব কৃষ্ণপদে ননে অভিনাম ॥

ইহা বচি কালীদাস গে'না স্বর্গপুৰ ॥

শগবাজ পাঁচ লাখ নারিক অতুন ।

काशीबाबू दास कहते हैं पुण्यदान ॥

## চতুর্থ অধ্যায়

### গৌড়ীয় বৈষ্ণব

আদি বৈষ্ণবেবা বাধা-কৃষ্ণ লীলাব স্থল রূপটিই কবিগায় ফুটিয়েছিলেন।  
তাব পবিত্র সুন্দর দিব্য রূপটি সৃষ্টি হল মহাপ্রভুব প্রভাবে। তাই চৈতন্য-  
পবনটী বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতের জিনিস। মহাপ্রভুব পবিত্র ছয়  
গোস্বামী (কপ, সনাতন, জীব, গোপাল ভট্ট, ভট্ট বঘুনাথ ও দাস বঘুনাথ)  
বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করেন। কপ গোস্বামীর ‘উজ্জল নীলমণি’  
ও ‘ভক্তিবসামুদসিকুণ্ডে’, জীব গোস্বামীর ‘ঘটসন্দর্ভ’ এবং কৃষ্ণদাস  
কবিরাজের ‘চবিতামৃত’ এই দর্শনের স্বরূপ বাখ্যাৎ হয়েছে।

চৈতন্যভাব বৈষ্ণব কবিগায় কর্মস্থানে এই দর্শনের তত্ত্ব নির্দেশ আছে,  
তাব আবেদন তাই জীব নয়, আধ্যাত্মিক, এই কথা বলেন বৈষ্ণব ভক্তগণ।  
কিছু চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, শেখর প্রমুখ কবির বচন। মন দিয়ে  
পড়লে, তাব মনো মানবিক সুখ-দুঃখ ও কামনা-কল্লনাব প্রতিচ্ছবিও বস  
দেখা যায় না। স্পষ্ট বোঝা যায় বাধা-কৃষ্ণ কাহিনীর আত্মনা সামাজিক  
মাছুষের মনই কথা বলেছে গোষ্ঠলীলা ও প্রেমলীলাব পদগুলিতে।

গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক পদগুলি কীর্তন গানে গোবচন্দ্রিকা রূপে বিশেষ  
সমাদৃত হলেও, প্ররিত কবিতা হিসাবে সবগুলোই উৎকৃষ্ট নয়। কিছু বৈষ্ণব  
সাহিত্যের ঐশ্বর্য শুধু পদাবলী নয়, তাব চবিত এবং তত্ত্ব-গ্রন্থগুলিও।  
বুদ্ধাবন দাসের চৈতন্যভাগবত (১৫৭৩), কবিরাজ কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃত  
(১৫৮১), লোচনের চৈতন্যমঙ্গল (১৫৮০), নবহবিব ভক্তিবন্ধাকব,  
নিত্যানন্দের প্রেমবিলাস, ঈশান নাগের অদ্বৈতপ্রকাশ এবং যত্নন্দনের  
কর্ণামৃত প্রভৃতি বই একাধারে দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস ও সাহিত্য হিসাবে  
মূল্যবান।

এই লেখকবা অধিকাংশই চৈতন্য-সমসাময়িক, অথবা তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল  
পরেব। কিছু সবাই অলৌকিক মহিমা আরোপ করেছেন তাঁর ওপর।  
জ্ঞানেন্দ্রের চৈতন্যমঙ্গল ছাড়া আর কোথাও মহাপ্রভুর অবসানের কোম দিশা



মেলেন না। জয়ানন্দ বলেছেন, রণ উৎসবে নৃত্য করতে করতে তাঁর পাশে ইটের আঘাত লাগে এবং তাতে জব হয়। হয়ত এই অসুস্থ জীবনান্ত হয়েছে তাঁর। কিন্তু পাপ-ভয়ে উল্লেখ করেন নি একথা বৈষ্ণব ভক্তের।

## শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর জন্মের আগের বৈষ্ণব সহজিয়ারা দেশে রাধা-কৃষ্ণের মূগল মূর্তি পূজা করতেন এবং জয়দেব, চণ্ডীদাস, মালাধর প্রমুখ কবিরা বহুপুঁথি ও লিখেছিলেন কৃষ্ণলীলা নিয়ে। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের যে দার্শনিক ভিত্তি তা মহাপ্রভুই গঠন করেন।

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের জন্ম। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচী দেবী। বাল্যে তিনি গঙ্গানাপ পণ্ডিতের ঘোলে পড়েন। তাঁর ছোট বিবাহ, প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়াব মৃত্যুর পর বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। সামাজিক ছোট-বড়ব বিভেদ-লোপের এবং ধর্মাস্তবিত হিন্দুকে স্বধর্মের ফির্বিসে আনাব আন্দোলন করে তিনি একই সঙ্গে সমাজপতি ও মুসলমান শাসকদের কোপে পড়েন। যৌবনেই সন্ন্যাস নিয়ে কাশী, গয়া, ব্রহ্মাবন, মথুরা, প্রয়াগ এবং নাক্ষিত্রাত্যের নানা তীর্থ ঘুরে তিনি প্রবীতে আসেন। এখানেই ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর জীবনাবসান হয়।

মহাপ্রভু নিজের সুপণ্ডিত ছিলেন। তাছাড়া তাঁর শিষ্য ও অমুচবদেব মধ্যে ছিলেন সনাতন, কপ, জীব প্রমুখ বিশিষ্ট পাণ্ডিত্য। এঁরাই সহজিয়াদের আদি বৈষ্ণবধর্মকে শুচিতা ও সোন্দর্য দেন। কিংবদন্তী আছে, বৈষ্ণব সহজিয়াদের এক গুরুর নাম ছিল নেড়া, সেই অমুচাবে তাঁর শিষ্যেরা পরিচিত ছিলেন নেড়ানেড়ী নামে। নিত্যানন্দের পুত্র দীরভদ্র তাঁদের গৌড়ীয় মতে দীক্ষা দেন এবং সেখান থেকেই চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণব-সমাজের সৃষ্টি হয়।

মোটামুটিভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা বলেন, সখা, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর, এই চার ভাবে সাধনা করা যায় ঈশ্বরের। সখ্য হল কৃষ্ণ ও ব্রজ বাখালদের ভাব, দাস্য হল কৃষ্ণ ও উদ্ধবের ভাব, বাৎসল্য হল কৃষ্ণ ও নন্দ-যশোদার ভাব, আর মধুর হল কৃষ্ণ ও রাধাব ভাব। এই মধুর ভাবই হল তাঁদের মতে শ্রেষ্ঠ ভাব বা মহাভাব। মহাভাবের আবার দুটি বিভাগ—রাধাভাব ও গোপীভাব। রাধা নিজের জন্যেই কৃষ্ণের মিলন কামনা করতেন, আর গোপীরা করতেন রাধা-কৃষ্ণের মিলন কামনা। রাধা-ভাবের নাম রাগান্বিক ভাব, আর গোপী-

ভাবের নাম রাগানুগ ভাব। মহাপ্রভু প্রথম ভাবের প্রতীক ছিলেন, দ্বিতীয় ভাবটি আর সমস্ত বৈষ্ণবদের জন্তে।

### চণ্ডীদাস : জ্ঞানদাস : গোবিন্দদাস

আগেই বলা হয়েছে যে গোপীদের কথা ভাগবতে থাকলেও, রাধার কথা নেই। রাধা বাঙালীবই সৃষ্টি এবং রাধাভাব ও গোপীভাবে আরাধনাও বঙ্গ-ভূমিরই দান। কেউ কেউ বলেন, উত্তর ভারতের মুসলীম দরবার দিঘে সূফী ধর্ম-স্তম্ভ বাংলায় এসেছিল, তার ফলেই এই মতের জন্ম হয়েছে। কেউ আবার বলেন, দক্ষিণ ভাবত থেকে বামনাজ-প্রবর্তিত শ্রীবৈষ্ণবদের ধর্মমতই এই মতকে প্রভাবিত করেছে।

এই দ্বিতীয় মতটিই বেশী সমীচীন মনে হয়। শঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মায়া। রামানুজ বলেন, ব্রহ্মও সত্য, জগৎও সত্য। তন্ত্রির মাধ্যমে জগৎ ব্রহ্মে যুক্ত হয়। মহাপ্রভু এই মতকেই আর একটু প্রসারিত করে বললেন, জগৎ ও ব্রহ্ম একে অণু থেকে অক্ষুণ্ণ। এ দুই চিবহন প্রেমে আবদ্ধ। মহাপ্রভুর এই মতের নাম ঋচিস্ত্য ভেদাভেদ। অবশ্য শ্রীবৈষ্ণবরা লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক, রাধা-কৃষ্ণের মন।

মহাপ্রভুব আদর্শ এবং তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাবলী বাংলা দেশে বোড়শ শতাব্দীতে এক নূতন ভাবেব প্রবল অনুলন। সমাজজীবনে যেমন দেখা দিল নূতন একটা প্রাণ-স্পন্দন, সাহিত্যে তেমনি এল একটা জাগ্রত গতিবেগ। এত দিন পর্যন্ত যা সাহিত্যে বচিত হয়েছিল, তাকে দূবে ঠেলে দিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যে সাবা দেশের হৃদয় অধিকার করে নিল। তার কাব্য সত্যকার মহৎ সাহিত্যেব সুরূপ এখানেই।

বৈষ্ণব সাহিত্যেব এই বিরাট ঐশ্বর্য মোটামুটি দু-ভাগে বিভক্ত—গীত বা পদাবলী সাহিত্য, আর তত্ত্ব সাহিত্য। তত্ত্ব সাহিত্যের আলোচনা পরে করা হবে। এখানে শুধু পদাবলীর কথাই বলছি। পদাবলীর বৃহত্তম অংশই হল রাধা-কৃষ্ণ লীলার বিচিত্র দিক নিয়ে।

কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্তে জ্যোৎস্না রাগে বা বর্ষা রাগে রাধা একা যমুনাতীরে যাচ্ছেন। কিংবা কৃষ্ণেব অপেক্ষায় সখীদের সঙ্গে কুঞ্জেব বসে আছেন, কৃষ্ণ এলেন না। অথবা বিসম্মে আসায় রাধা অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তাই কৃষ্ণ তাঁর সম্ভাষণ বিধান করছেন। রাধা-কৃষ্ণলীলার

এই কাব্য-সুখমায় বহু বিচিত্র অধ্যায় নিম্নে চণ্ডীদাস, জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস, শেখর প্রমুখ কবিরা অল্পপদ পদাবলী লিখেছেন। ভাবেব বৃন্দাবন ছেড়ে কৃষ্ণ কর্মের মথুরায় চলে গেলেন এবং বৃন্দাবনবাসীরা রাধাক্রপী আরাধনার দীপ জ্বালিয়ে তাঁর প্রার্থনা কবচ লাগল, অল্পপদ মাথুর পদাবলীর মধ্যে দিয়ে কবিরা এই ছবিটিকেও রূপ দিয়েছেন অপরূপ ভাষায়।

শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ, রাপাল বালকদের সঙ্গে মাঠে মাঠে ছুরতুপনা করা, মা যশোদার স্নেহবাগ্ন হৃদয়েব অস্থিরতা, এ নিয়েও আশ্চর্য রকম সুন্দর পদ লিখেছেন বলরাম দাস, উদ্ধব দাস, যাদবেন্দ্র। আর গৌরাঙ্গলীলা-বিনয়ক পদও লিখেছেন বহুজন, যাদের মধ্যে বাহুবল্লভ যোষ, নবহরি, গোবিন্দদাস, ভগদানন্দ প্রমুখ প্রসিদ্ধ। বলা বাহুল্য এঁরা সবাই চৈতন্য-গদ্যবর্তী এবং যোড়শ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর ভেতরেব লোক।

এঁদের মধ্যে গোবিন্দদাস এবং শেখর ব্রহ্মবুলিতে অসীম দক্ষতা দেখিয়েছেন। জ্ঞানদাসের রচনা সরল স্নিগ্ধ এবং অদ্ভুতবলী। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিন ভ্রমবর্তী কিছু কিছু বাস্তব-নির্ণয় এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। জ্ঞানদাস বলছেন,

রূপ লাগি জাদি বুবে গুণ মন ভোর।  
প্রীতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রাণ অঙ্গ মোর।  
দেবে পদন লাগি দেহ মোর কান্দে।  
পরান পারিতি লাগি স্থির নাহি থাকে ॥

গোবিন্দদাস বর্ষাতিসার বর্ণনা করছেন,

চলইত শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।  
মান্দর বাহিব কর্ত্তন কপাট।  
উহি অতি দ্বতর বাদর দোল।  
বারি কিসে বাদয়ে নীল নিচোল ॥

বিরহের অবস্থা বর্ণনা করে শেখর লিখেছেন,

অতি শীতল মলয়াশিল  
মন্দ মন্দ বহনা,  
হরিবৈমুখী হামারি অঙ্গ  
মদনানিল দহনা ॥

সব সখী মেলি ঘেরি বৈঠত,

গাহত হরিলীলা ।

এইহন ধ্বনি শুনত শুনত

ধনী উচকিত ভেলা ॥

পুরানো আমলেই জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের এবং গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ‘কবি-সন্তান’ বলে সম্মানিত হয়েছিলেন। এর অর্থ জ্ঞানদাসের রচনা চণ্ডীদাসের মতো প্রাঞ্জল অন্তরঙ্গ, আর গোবিন্দদাসের রচনা বিদ্যাপতির মতো অলঙ্কৃত ও শব্দ-বঙ্কারময়। সবাই জানেন,

চণ্ডীদাস রস-পদ্মে অলি জ্ঞানদাস ।

মকরন্দময় ছন্দে গাহার প্রকাশ ॥

এবং,

ভগমতি রাস রস বিদ্যাপতি শূর ।

কবি গোবিন্দদাস রসপূব ॥

কিছু পদাবলী সাহিত্যের যিনি সম্রাট, সেই চণ্ডীদাস সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু বলা হল না। তার কারণ আগেই বলেছি। কৃষ্ণদীর্ঘ-রচয়িতা বড় চণ্ডীদাস এবং পদাবলী-রচয়িতা চণ্ডীদাস এক লোক নন, এ বোঝা যায় উভয়ের লেখা পড়লেই। পদাবলী-রচয়িতাকে দীন বা দ্বিজ চণ্ডীদাস বলা হয়। তিনি মহাপ্রভুর পরবর্তী, এই কথা প্রমাণিত হয় ‘খাজু কে গো মুবলী বাজায়’ পদটি থেকে। কিছু বরাবর যে সব মনোরম পদ চণ্ডীদাসের নামে চলে আসছে, তার বেশির ভাগই এখন জ্ঞানদাস, লোচন প্রভৃতির নামে চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং দীন বা দ্বিজের নামে যে পদগুলি নির্ধারিত হয়েছে, তা মোটেই অসাদারণ্য, নিতান্ত চলনসই রচনা।

### বৃন্দাবন : কৃষ্ণদাস : লোচন

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সর্বজন-সমাদৃত হলেও, বৈষ্ণবদের ভক্তিতত্ত্ব, সাধন-রহস্য বা জীবন-দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হলে, আমাদের পড়তে হয় রূপ গোস্বামীর উজ্জলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বা জীব গোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থ। বাংলায় চৈতন্যজীবনী-বিষয়ক গ্রন্থগুলিতেও এই দিককার অনেক আলো মিলবে।

চৈতন্য-সমসাময়িকদের মধ্যে নরহরি, জগদানন্দ প্রমুখ কবিরা তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু পদ লিখেছিলেন। মুরারি গুপ্ত কড়চায় অল্প কিছু আলোকপাত করেছিলেন তাঁর ব্যক্তি-জীবনের উপর এবং কবি কর্ণপুর তাঁর চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করেছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর পূর্ণাঙ্গ জীবনী-গুলির কোনটাই তাঁর সমসাময়িকের রচনা নয়। চৈতন্যভাগবত-রচয়িতা বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর মানসপুত্র নামে খ্যাত, কিন্তু তাঁর শৈশবেই প্রভুব লোকান্তর হয়, তাঁকে তিনি স্বচক্ষে দেখেন নি। চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ জীব গোস্বামীর শিষ্যরূপে বৃন্দাবনে থাকতেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি এই গ্রন্থ লেখেন। তিনি এবং চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচন বৃন্দাবন দাসের অল্প পরের লোক। এই জন্মেই জীবনীগুলির পদস্খরবেদ মধ্যে আছে অনেক তথ্যগত গবমিল। তা সত্ত্বেও তিনটি বইই মূল্যবান।

চৈতন্যভাগবত মোটামুটিভাবে চৈতন্য-জীবনের ইতিহাস। তাতে অলৌকিক কাহিনী নেই বললেই চলে। কবিত্ব বা দার্শনিকতাবাদও প্রাচুর্য নেই। সাদাসিধা সবল পক্ষে তিনি চৈতন্য-বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃত জীবনেতিহাস নয়, কবিরাজ গোস্বামী এতে পরিবেশণ করেছেন চৈতন্য-চরিতের অন্তত। ‘রাধাভাবছাতি সুবলিত তনু’ গোবিন্দ তাঁর মতে মামুফও নন, দেবতাও নন, তিনি একটি দিব্য ভাব। এই ভাবকে বিবিধ ছরুহ দার্শনিক হস্তেব সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি এবং করেছেন এমন অনস্বয় নীবস ভাসায়, যা পড়তে অনেকেই হাঁচত খান। লোচনের চৈতন্যমঙ্গল চমৎকার কাব্য। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া-চৈতন্যকে লক্ষ্মী-জনাঙ্গন-রূপে দেখেছেন এবং ভক্তিবিনম্র নিষ্ঠায় লিখেছেন সমগ্র কাব্যটি। তাই তাঁর বইয়ে অলৌকিক কাহিনীর ছড়াছড়ি দেখা যায়।

এছাড়া মহাপ্রভুর দাক্ষিণ্য-ব্যাক্রান্ত সহযাত্রী গোবিন্দ কর্ণকারের কড়চা নামে যে বই আছে, তা অনেকের মতে ভাল। অস্তুত তাঁর ভাষা যে উনবিংশ শতাব্দীর আগের নয়, এ নিঃসন্দেহ।

প্রকৃত পক্ষে চরিতামৃত বাংলা ভাষার এক অদ্বিতীয় গ্রন্থ। এব বহু উক্তি আমাদের ভাষায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

যেমন,

অরসত্ত্ব কাক খায় জ্ঞান নিদ্রফলে।

রসত্ত্ব কোকিল খায় প্রেমাত্মমুগ্ধে ॥

কামে আর প্রেমে হয় বহু ত অন্তর ।  
কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্কর ॥

\* \* \*

মর্কট বৈবাগ্য না কব লোক দেখাইঞা ।  
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥

এত বড় মনস্বী ছিলেন কবিবাজ গোস্বামী, কিন্তু কি অপূর্ব বিনয় তাঁর ।  
নিজেকে তিনি বুকু জবাবু কণ্ঠপুত্তলী বলেছেন এবং নিজ গ্রন্থ সপক্ষে  
বলেছেন,

আমি লিখি ইহ কবি বাহ্য অভিমান ॥

## পঞ্চম অধ্যায়

### মঙ্গলকাব্য

বিদ্বান সমাজ ও সাধারণ সমাজের সাহিত্য যখন পবনস্বরকে স্পর্শ না করে পৃথক পৃথক খাতে বসে চলেছে, তখন কিছুসংখ্যক কবি অশ্রুভব কবলেন, এ দুইয়ে যোগস্থাপনের প্রয়োজন। এঁরা লিখলেন মঙ্গল বা দেবমহিমামূলক কাব্য। মঙ্গল কথাটির এই অর্থে প্রথম ব্যবহার দেখা যায় জয়দেবে। এই সব মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক ও অর্ধপৌরাণিক দেব দেবীর সঙ্গেই নানা লৌকিক দেব-দেবীর মহিমা কীর্তিত হয়েছে। একদিকে খাজেন শিব, চণ্ডিকা, ধর্ম, অন্তরিকে আছেন বাসুদেব, মাপেব ও কুমারদেব দেবতারা।

সব মঙ্গলকাব্যেই এমন এক বকম। প্রত্যেক দেবতাই কবিকে স্বপ্নে আদেশ দেন শাব মহিমা মন্তব্য প্রচার করিতে। সব মঙ্গলকাব্যেই নায়ক দেবতার বনে সমস্ত বাঘা ঘষা-বন্দা, সমস্ত অসম্ভব সম্ভব করেন। সর্বত্র ভক্তের যে বিবোধী, অথবা উদ্ভিষ্ট দেবতা সম্পর্ক যথার্থমি, শাব সবনাশ হয়। সব মঙ্গলকাব্যেই কুলনাশবা কাহিনী নায়কের দেবপাশিনী করেন, বিবহিণবা বাবমাস্ত্রা বর্ণনা করেন, বিপদে পড়ান নায়কবা বর্ণনাত্মকিত্রোয়ে দেবতাকে তুষ্ট করেন। এই একধেমিমা সঙ্গ ও মঙ্গল কবিতায় সমসাময়িক সমাজের নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়। পাওয়া যায় বিচিত্র রূপ-ব্যবসায় শিবের মাহুসেব নিখুঁত চিত্র। উচ্চ কাবিত্ব ও পাওয়া যায় স্থানে স্থানে। লক্ষ্য দেবাব বিষয় যে, মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী সবাই পান-দানী, প্রতিবেচক ও প্রাতিহিংসাপ্রবাহণ। ভক্তের জন্তে তাঁরা সবই করেন, প্রতিবন্দা দেবতাব ভক্তকে নাকাল করার জন্তেও করেন না এমন বাঙ নেই।

মাহুসেব চবিত্র ও মঙ্গলকাব্যে কোথাও ব্যক্তিভেদ, পৌকষ বা আত্মমর্যাদ্যব পরিচায়ক নয়। দেবতার খেয়ালখুশি প্রভাবে তাঁরা তেঁসে চলেছে অসহায়-ভাবে। তাদের নিজের কোন ক্ষমতা নেই, দেবতার কুপা হলে মরা ছেলে বাঁচে, ডোবা নৌকা তেঁসে ওঠে, পশ্চিমে সূর্য দেখা দেয়। এক দিকে মুসলিম শাসন, অন্যদিকে বর্ণাশ্রমেব শাসন মাহুসকে কি বকম নিষেধে নিবীৰ্য করে

কেলেছিল, এ থেকে তা টের পাওয়া যায়। পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই মঙ্গলকাব্য-পর্যায় লিখিত হয়েছে এবং এক এক দেবতার ওপর লেখা হয়েছে অনেকগুলি করে মঙ্গল।

### মনসামঙ্গল : বিজয় গুপ্ত

মনসার পুরানো স্তোত্রে তাঁকে আন্তিক মূর্তির মাতা, বাহুকির ভগিনী ও ৩৩ জরৎকারুর পত্নী বলা হয়েছে। সম্ভবত তিনি আর্যের জাতির কন্যা এবং ঝগবংশ-সম্প্রদায়। কালে এই নাগই গাপে রূপান্তরিত হয়েছে এবং জল, জঙ্গল ও জলাভূমি-সমাকীর্ণ বাংলায় তাঁর পূজা প্রবর্তিত হয়েছে।

সমাজ-বিজ্ঞানীরা বলেন, ভয় থেকেই অধিকাংশ গ্রাম্য দেব-দেবীর সৃষ্টি। মর্পদেবী মনসা নিশ্চিত তাই। এই ভাবেই বাঘ, কুমীর এবং বসন্ত-কলেরারও দেব-দেবীর উৎপত্তি হয়েছে। বাংলা ভাষায় মনসার মাহাত্ম্য নিয়ে অনেক মঙ্গলকাব্য লেখা হয়েছে। বরিশালের বিজয় গুপ্ত ও ময়মনসিংহের নারায়ণ দেব-রচিত পদ্মাপুরাণ দু-খানিই তার মধ্যে প্রাচীনতম। দু-জনেই পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। এছাড়া সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ধমানের কেতকানাস এবং কেমানন্দও মনসামঙ্গল লেখেন, যা বহুল প্রচারিত।

মনসার মহিমা প্রচারের জন্ত লেখা এই মঙ্গলে কি ভাবে মনসাকে অমাত্য করায় শৈব চাঁদ সদাগরের একমাত্র পুত্র লখাই বিবাহের রাতে সর্পাঘাতে প্রাণ হারাল এবং তার বালিকা বধু স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে তেলায় ভাসতে ভাসতে অবশেষে স্বর্গের রজকিনী নেতার সাক্ষাৎ পেল, তার মাধ্যমে দেবসভায় কৃত্য দেখিয়ে ও দেবতাদের প্রীতি আহরণ করে স্বামীকে বাঁচাল, তার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। লখাইয়ের জীবনপ্রাপ্তিতেই হল চাঁদের পরাজয় এবং তিনি পূজা করলেন মনসার।

এই কাব্যে মনসার যে রূপ ফুটেছে, তা দেবতার নয়, হিংস্র শিশাচিনীর। শৈব চাঁদকে বশুতা স্বীকার করানর জন্তে তিনি এমন কোন নীচতা নেই, যার আশ্রয় নেন নি। মাহুষের ব্যক্তিত্ব বা পৌরুষকেও এতে কিছুমাত্র মর্যাদা দেওয়া হয় নি। চাঁদ সদাগর পুরুষকারের সমর্থক, ভাগ্যের সঙ্গে ভয়ের সঙ্গে তিনি আপোষ করিতে রাজী নন। তাই তাঁকে চরম ভ্রূগতি ভোগ করিয়ে শেষ পর্যন্ত হার মানান এবং বাঁ হাতে হলোও, মনসার পূজা করান হয়েছে।

কিন্তু মনসামঙ্গলের নারীচরিত্র দুটিই স্তম্ভর। নিষ্ঠা, সাহস ও জাগ্রত



আশার প্রতীক হিসাবে বেহলা যেমন সুন্দর, মমতামयी মাতৃহৃদের প্রতীক হিসাবে তার শাওড়ী সনকা তেমনি চমৎকার চরিত্র। বিবাহবাসরে সর্পাঘাতে যখন পুত্র-বিয়েগ হল, তখন ক্রুদ্ধ মাতৃহৃ সব দোষ চাপিয়ে দিল ভাগ্যহীনা বালিকা বধুর ঘাড়ে। তার ভাড়া কপাল না হলে এমন হবে কেন?

খণ্ড কপালী বেহলা চিরুণদাঁতী।

বিষার দিনে থাইলি পতি না পোহাতে রাত।

সেই বধুই আবার যখন মৃত স্বামী নিষে নিরুদ্দেশে ভাসতে উল্লত, তখন অসহায় মাতৃহৃ হাহাকার করে উঠল তাঁর বুকে!

সনকা কাদিয়া বলে আলো অভাগিনী।

এ তিন ভুবন মাঝে ক'হু নাহি গুনি ॥

বালিকা বুদতী বুদ্ধা যার পতি মরে।

বিধবা হইয়া সেই থাকে নিশ্চ ঘরে ॥

কিসের কারণে তুমি জলেতে ভাসিবে।

বাংলার বাল্যবৈধব্যের এই সঙ্কল্প বেদনা এবং বাঙালী মায়েব এই বুক-ভাড়া কান্নার সুরটি বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব থেকে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পর্যন্ত একটানা চলে এসেছে এবং মনসার ভাসান কোনও উচ্চ কবিরের স্বাক্ষর বহন না করলেও বাংলার ঘবে ঘরে আদৃত হয়েছে এই বাস্তবতার জন্মেই।

### চণ্ডীমঙ্গল : কবিকঙ্কণ

মহিমাসুর-নাশিনী যে চণ্ডিকার কথা পুরাণে কীর্তিত হয়েছে, বাংলার মঙ্গলচণ্ডী তা থেকে স্বতন্ত্র দেবতা। ইনি গৃহস্থ-কল্যাণ-বিধায়িনী, তাই শান্তি ও শুচিতার আশ্রয়-স্বরূপিণী। কবে কি ভাবে এঁর উদ্ভব হয়েছে বলা কঠিন। তবে সর্পবেষ্টিতা মনসার মতো জুর কোপন প্রকৃতি এঁর নয়, কাজেই অত আদম্য ইনি নন।

ষোড়শ শতাব্দীতে এই চণ্ডীর মাহাত্ম্য নিয়ে কয়েকখানি মঙ্গলকাব্য লেখা হয়। সব চেয়ে প্রসিদ্ধ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের বই। বর্ধমান জেলার দামিতা গ্রামে তাঁর জন্ম। গ্রাম্য ডিহিদারের উৎপাতে জন্মভূমি ছেড়ে তিনি যান মেদিনীপুরের আড়ারায়। সেখানে ভূমাধিকারী বাঁকুড়া রায়ের পুত্রের গৃহশিক্ষক হন এবং সেই খানেই তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্য লেখেন। তাঁর সমসাময়িক মাধবাচার্যেরও একই বিষয়ে কাব্য আছে।

চণ্ডীমঙ্গলে দুই প্রস্থ কাহিনী। এক প্রস্থ ধনপতি সওদাগরের বাণিজ্য উপলক্ষে সিংহল-প্রবাস এবং তাঁর পুত্র শ্রীমন্তের পিতার খোঁজে সিংহলযাত্রা, আর এক প্রস্থ হল কালকেতু ব্যাধ ও তার পত্নী ফুল্লরার দারিদ্র্যমোচনের কাহিনী। ধনপতির অরুপস্থিতি কালে জ্যেষ্ঠা পত্নী লহনার কনিষ্ঠা খুঁটনাকে নির্ধাতন, শ্রীমন্তের শৈশব, সিংহল-যাত্রাকালে শ্রীমন্তের কালীদেহে কমলে কামিনী দর্শন, বহু মনোরম ও মর্মস্পর্শী অধ্যায় আছে প্রথম কাহিনীটিতে। দ্বিতীয় কাহিনীটিতেও স্বর্ণ গোদিকা সেজে ফুল্লরার ঘরে চণ্ডিকার আগমন এবং ফুল্লরার কল্পিত দারিদ্র্যের কাহিনী বর্ণনা, কালকেতুর সাহস ও ধর্মপ্রাণতা ইত্যাদির অনেক উপভোগ্য চিত্র আছে।

শুধু মঙ্গলকাব্য-পর্যায়ের নয়, বাংলা সাহিত্যেবই একজন বিশিষ্ট কবি মুকুন্দরাম। তাঁর সহজ সরল বর্ণনায় আশ্চর্য সুন্দর এক-একটি ছবি মূর্তি নেয়। যেমন,

মন্দ মন্দ বহে শীত দক্ষিণ পবন।  
অশোক কিংককে রামা বসে আলিঙ্গন ॥  
কেতকী ধাতকী খোটে চম্পকবরণ।  
কুসুম পদাগে প্লথ হৈল মর্নিগন ॥

শ্রীমন্তের ঘুমপাড়ানী গানটিও সুন্দর। একটু উদ্ধৃত করা হচ্ছে,

আয় আয় আয়রে,  
কি লাগিয়া কান্দে বাছা  
কোন্ ধন চায়রে ॥  
তুলিয়া আনিব পগন ফুল,  
একেক ফুলে লক্ষেক মূল,  
সে ফুলে গোঁথিয়া দিব যে তার।  
প্রাণের বাছা মোর  
না কান্দ আর ॥

কবিকল্পণের আসল বৈশিষ্ট্য চরিত্রচিত্রণে। স্বামী-প্রাণা ফুল্লরার এবং বিড়ম্বিতা খুঁটনার চরিত্র দুটি তাঁর হাতে যেমন জীবন্ত হয়েছে, তেমনি ভীবন্ত হয়েছে ধূর্ত বণিক নুরারি শীল ও জুয়াচোর ভাড়া দত্তের চরিত্র দুটি। কালকেতুর চরিত্রটিও তিনি নিপুণ ভাষ্যের মতো কাল পাথর কুঁদে ভৈরি

কবেছেন মনে হয়। এ যুগের লোক হলে, কবিকল্পে নিশ্চয় কাব্য না লিখে লিখতেন উপহাস।

### ধর্মমঙ্গল : ঘনরাম

বৌদ্ধদেব ধর্ম শেষ পর্যন্ত সহজিয়াদেব হাতে ধর্মঠাকুরে পরিণত হন। এই ধর্মঠাকুর কোথাও শিব, যেমন নাথযোগীদের সাহিত্যে, কোথাও নিবাকাব নিবজ্ঞান পদমেখব, যেমন শূত্রপুবাণে। কোথাও বা তিনি স্বয়ং-সম্পূর্ণ এক দেবতা এবং মনসা ও চণ্ডিকা মতো ভক্তবৎসল, তাঁদেবই মতো ভক্তের শত্রু-নিম্নে বা বিঘ্ন-মোচনে যোল-আনা যুক্তি-বিচার-বিবর্জিত।

নাথ অনাথ ও ভ্রম-মৃত্যুর আদিকাবণ এই ধর্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্য নিয়ে বহু মঙ্গল সেবা হয়েছে। মাণিক গাঙ্গুলী এবং ঘনরাম দু-জন কবি লেখা ধর্মমঙ্গল পাওয়া গেছে। ঘনরাম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের লোক। তাঁর জন্ম বর্ধমানে। মাণিক গাঙ্গুলী তাঁর অল্প আগের বা পরের। ঘনরামের বইটিই বেশী প্রসিদ্ধ এবং ধর্মমঙ্গল বলতে সাধারণত তাঁর বইই বোঝায়।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী সংক্ষেপে এই—সুদূরদেশে ইছাই ঘোষ গোড়বাজ নমপালের বিবাহে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ধর্মপালের সেনাপতি কর্ণসেনের ছয় ছেলে এই যুদ্ধে মারা পড়ে। গোড়বাজের স্ত্রীলিকা বজ্রাবতীর সঙ্গে এবার কর্ণসেনের বিবাহ হয় এবং লাউসেন নামে তাঁর এক পুত্র জন্মায়। লাউসেনের জন্ম ধর্মঠাকুরের ব্যব, এই ধর্ম ঠাকুর তাঁর চালক ও বক্ষক। গোড়বাজের প্রধান দামস্ত মাহতাজা বা মহামদ অনেক বড়সস্ত ফাঁদে লাউসেনের বিব্রন্ধে, কিন্তু মনের রূপায় তিনি সব ব্যর্থ করেন। এমন কি পশ্চিম দিকে স্বর্গ পর্যন্ত তিনি উঠিয়ে ছাড়লেন। অবশেষে ইছাই ঘোষ যুদ্ধে নিহত হলেন তাঁর হাতে এবং লাউসেন বীর চুডামনি বলে কীতিত হলেন।

মঙ্গলকাব্যমূলত নিয়তিবাদের আতিশয্য এবং দেবতার বিচার-বিমুঢ় অহুগ্রহ-বর্ষণের অংশটুকু বাদ দিলে, ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু বেশ জম-জমাট, স্থানে স্থানে নাটকীয়ও। তাছাড়া এই একমাত্র মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য, যাতে শৌর্য ও পৌরুষের বেশ একটু গৌন্য যায়। কিছুটা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বাজেনৈতিক কূট-চক্রান্তের চিত্রও আছে ইতস্তত। অবশ্য সব কিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন এক ধর্মঠাকুর, যিনি সর্বশক্তিমান হলেও সর্বজীবে সমদর্শী নন।

তাছাড়া মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের বচনায় যে সাবঙ্গীলতা দেখা যায়, ধর্মমঙ্গলে তাব অভাব। তাই এই বীবগাথা একটানা পড়তে শেষ পর্যন্ত ক্লান্তি আসে। যেমন এব বিবস ভাষা, তেমনি একঘেয়ে বচনভঙ্গি।

অল্প একটু নিদর্শন দেওয়া গেল,

মাব মাব বলি ডাক ছাডেন তবানী।

সেনাগণ দানাগণ সমবে নিদাক্ষণ

ছ-দলে কবে হানাহানি ॥

বঙ্গিনী বণজয়ী ছন্দুতি বাজই

ঘন ঘোব বাজাইয়া দামা।

বাজপুত মজবুত যৈছন যমদূত

সমযুথ যুঝে খানসামা ॥

### শিবাযণ : রামেশ্বর

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুবাণ ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল থেকে ভাবতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত, অধিকাংশ মঙ্গলেই কোন-না-কোন আকারে শিবকাহিনী স্থান পেয়েছে। আত্মোপাস্ত শিবকাহিনী নিয়েও অনেকগুলি মঙ্গল লেখা হয়েছে। এই সব মঙ্গলের মধ্যে রামেশ্বর চক্রবর্তীর (ভট্টাচার্যের ?) শিব-সঙ্কীর্তন সব চেয়ে জনপ্রিয়। এই শিবসঙ্কীর্তনই শিবমঙ্গল বা শিবাযণ নামে উল্লিখিত হয়।

রামেশ্বর মেদিনীপুর ববদাবাটি পবগনাব অন্তর্গত যতুপুর গ্রামের অধিবাসী। ঐ জেলাবই কর্ণগড়ের ভূম্যধিকারী যশোমন্ত সিংহের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ১৭১০ খৃষ্টাব্দে তিনি শিবাযণ লেখেন। তাঁর আগে (১৬৭৪) দ্বিজলুকে বা ব্যাধের শিবামুগ্রহ লাভ নিয়ে বতিদেব কাব্য লিখেছিলেন। রামেশ্বরের লেখায় তাঁর পদাঙ্ক-অনুসরণের স্পষ্ট প্রয়াস দেখা যায়।

শুধু রামেশ্বর নন, মঙ্গল-কবিশ্ব সমাই শিবকে ভিথারী, শ্রাশান্চান্দী। আধ-পাগলা নেশাখোব-রূপে চিত্রিত কবেছেন। তাঁর পরনে বাঘছাল, গলায় হাডেব মালা, বুস তাঁর বাচন, ভূত-প্রেত তাঁর সঙ্গী। এ হেন বাউণ্ডুলে মাছুরের আবাব ঘব-সংসার আছে, ছেলে-মেয়ে আছে। সহধর্মিণী পার্বতীর তাই দুঃখ ও দুর্গতির আব অস্ত নেই। ধনী ঘরের আদরিণী কত্যা পার্বতী, ভাগ্যদোবে তাঁর লাভ হয়েছে নিরন্ন বৃদ্ধ পতি। দিনরাত্রি স্বামী-স্ত্রীতে, তাই

কলহ লেগেই আছে। সংসার-জালায় উত্কট হয়ে বিজয় গুপ্তের পার্বতী  
বলছেন,

চড়ে বেড়ায় ছুঁই বলদ তাবে খাউক বাবে ॥

লাগুক আগুন কান্ধেব ঝুলি ত্রিশূল লউক চোবে।

গলাব সাপ গরুড়ে খাউক যেমন তাঁড়াইল মে'বে ॥

কিংবা পদ্মাব বিবাহ উপলক্ষে,

হাসি বলে চণ্ডী আই তোমাব মুখে লজ্জা নাই,

কোন সজ্জা আছে তোমাব ধবে।

এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে চাইবে তাবা পান খাইতে,

আব চাইবে তৈলে সিন্দূবে ॥

হাসি কয় শূলপাণি এয়ো ভাগাইতে জানি,

মধ্যে দাঁড়াব ল্যাংটা হয়ে ॥

বামেশ্বর এই দাবিদ্রাপীড়িত শিব-সংসারের কাহিনীই সবিস্তারে পরিবেষণ  
করেছেন। পেটের দায়ে শিব গেছেন চাষ করতে। সবাই উপদেশ দিবেছে  
তাকে,

আমাব বচন ধব গোঁসাই তুমি কব চাষ।

কোন দিন না এন্ন জোটে কখন উপবাস ॥

কিন্তু অন্ন-বস্ত্রের অভাব হলে কি হবে? কুবুঝিব ত অস্ত্র নেই তাঁর।  
বাগ কবে পারবী তাই পিতৃ-ভবনে চলে গেলেন শেষ পর্যন্ত।

দণ্ডবৎ হইয়া দেবের ছুটি পাষ।

কাস্ত সনে ক্রোধ কবি কাতাঘনী যায় ॥

কোলে কবি কান্ধিকের হস্তে গজানন।

চঞ্চল চরণে হইল চণ্ডীর গমন ॥

শাঁখারী-বেশে শিব তখন শ্মশুবালায়ে গেলেন তাঁকে খুঁধী করে ফিরিয়ে  
আনতে। তাঁকে দেখেই পার্বতী চিনতে পাবলেন এবং সেখানেই হল দাম্পত্য-  
কলহের অবসান।

বলা বাহুল্য শিব-দুর্গাব কাহিনীর আড়ালে কবি এখানে তদানীন্তন কোন  
শিবদাস ভট্টাচার্য ও তাঁর সহধর্মিণী অন্নপূর্ণা ভট্টাচার্যের গল্পই বলেছেন এক  
তখনকার চাষী-জীবন, পল্লীসমাজ ও অন্নকষ্টের চিত্রই গল্পে এই সজীবতা

করেছে। মাঝে মাঝে গার্হস্থ্য জীবনের দু-একটি আনন্দময় মুহূর্তের ছবিও আছে,

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী ।

দুই স্নাতে সপ্ত মুখ পঞ্চমুখ পতি ॥

তিন জনে একুনে বদন হল বার ।

গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার ॥

আসলে শিব আর্ষেতর জাতিদের দেবতা। আর্ষ-অনার্য মিশ্রণের পর তিনি দেবাদিদেব মহাদেবে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু বাঙালীর কবি-কল্পনায় তিনি সেই আদিক্রুপেই চিরদিন অমব থেকে গেছেন। নাথযোগী ও ধর্মোপাসক থেকে মঙ্গল-কবি পর্যন্ত, সবাই তাই শিবকে গ্রাম্য চাণী-গৃহস্থ রূপে চিত্রিত করেছেন এবং তাঁকে নিয়ে প্রচুর হাসি-কোটুক করেছেন। বলা দরকার যে, মাঝে মাঝে কচিব সীমা ছাড়িয়ে গেলেও, এই আলাভোলা আধ-পাগল ঠাকুরটির চরিত্রে ভালো লাগার জিনিস কম নেই।

### অন্নদামঙ্গল : ভারতচন্দ্র

মঙ্গলকাব্য-বচয়িতাদের মধ্যে সব চেয়ে জনপ্রিয় এবং অনেক দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হলেন ভারতচন্দ্র। ছন্দচাতুর্যে যেমন, কাহিনী ও চরিত্রের ব্যবস্থাপনায় তেমনি তাঁর অসামান্যতা লক্ষ্য করা যাবে। যদিও রচিত্র প্রশ্নে আধুনিক পাঠকের রসনায় বিশ্বাস লাগার মতো জিনিস তাঁর রচনায় আছে, তবু প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বিচারে ওটা বড় করে দেখলে চলবে না।

১৭১২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র রায় বর্দমান জেলার পৈঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে জন্মান। তাঁর পিতৃপুরুষরা সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশ ছিলেন। বর্দমান রাজ-পরিবারের কোপে তাঁদের সর্বস্ব যায় এবং ভারতচন্দ্র কৈশোবে মাতুলালয়ে মানুষ হন। হুগলী দেবানন্দপুরে কিছু কাল বসবাস করাব পর তিনি পরিত্রাজক রূপে নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি রূপে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

তাঁর বিখ্যাত বই অন্নদামঙ্গল লেখা হয় ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে। অন্নদামঙ্গল তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা, হুগলীহোড়ের দুর্গোৎসব ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে মানসিংহের বাংলা-অভিযানের কাহিনী, প্রতাপাদিত্য-মানসিংহের যুদ্ধ এবং মানসিংহ-ভবানন্দ-

মৈত্রীব বিবরণ স্থান পেয়েছে এই খণ্ডে। তৃতীয় খণ্ড বিভাসন্দর, যাতে কৃষ্ণনগর-বাজকুমার সন্দর ও বর্ধমান-বাজকুমারী বিস্তার কাহিনী স্থান পেয়েছে।

এবং তেতন প্রথম খণ্ডই প্রকৃত অন্নদামঙ্গল এবং অন্নদা বা দুর্গা এই খণ্ডে মানবীরূপে আবির্ভূত হয়ে নানা বিচিত্র লীলা দেখিয়েছেন। অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনীও কাহিনী, অন্নপূর্ণার জবর্তী-বেশ ধারণ এবং অন্নাতা উপাখ্যান অনেকেরই সুবিনীত। সমস্ত মঙ্গলের প্রথা-মতো এখণ্ডে প্রথমোক্ত হৃদ-পার্বতীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এবং ভাবতচন্দ্রের শিবও নেশাখাব, ভিখারি, আধ-পাগল। তার দক্ষ-যজ্ঞের বর্ণনাপ্রসঙ্গে চরিত্র ভাবতের শিব পুরাণ-বর্ণিত রূপে দেবতার মূর্তি বর্ণিত, এবং

মহাকাল রূপে মহামোহ সাজে  
ভভম্ভম ভভম্ভম শিখা বাব বাজে।  
নটাপট ভটাকুট সংবট্ট গঙ্গা।  
চলচ্চল টলটল কলকল তবচ্চ  
বগাম্বল ফণাম্বল ফণী ফল গাজ  
দিশেশ প্রতাপে নিশানাম সাজে

অন্নদামঙ্গল চারচতুর্দশ নানা সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় রূপ দিয়েছেন। যেমন,

দ্বিত্য ভাবত চোটক ছন্দে ভণে।  
কবিরাজ কবিত্ত শুন গোড়জনে

অথবা,

কৃষ্ণপ্রসাদে কয়ে ভাবত মো।  
আবে বে দক্ষ সতী মো সতী মো

সুললিত লঘু ছন্দেও তাঁর লেখন সমান দক্ষ। যেমন,

কল কাকিল অলিকুল বকুল কুলে।  
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউড়ীতে।  
কমল পবিমল লয়ে শীতল কল,  
পবন চল চল উছলে কুলে।  
বসন্ত বাজা আনি ছয় বাগিণী বাণী  
পাতিল বাজধানী অশোকমূলে।

কিন্তু এক কালে ভারতচন্দ্রের আসল প্রতিষ্ঠা নির্ভর করত তাঁর বিদ্যাসুন্দরের ওপর। এই কাব্যে হীরা মালিনী ও বর্ধমান রাজমহিষীর নিপুণ চরিত্র-চিত্রণ মুকুন্দরামের চরিত্রগুলি মনে করিয়ে দেয়। তখনকার নাগরিক জীবনের বিলাসব্যসন, চটুলতা, পঙ্খিলতা, সবই কবি অদ্ভুত এক-একটি তুলির টানে জীবন্ত করে তুলেছেন। কিন্তু সমগ্র কাহিনীর ভিত্তিমূলে আছে যে নোংরামি, সর্বশেষের কালী-মাহাত্ম্যেও তা ঢাকা পড়েনি। এই কাব্য তাই আজকের পাঠকের শ্রীতি লাভ করতে পারে না। তবে বিচ্ছিন্ন অংশ এ থেকে অনেক উদ্ধৃত করা যায়, যা হীরের টুকরোর মতো। যেমন,

আর জন কম এই মহাশয়

চাঁপা ফুলময় খোঁপায় রাপি।

হলুদি ছিনিয়া তম্ব চিকনিয়া

স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি ॥

বিদ্যাসুন্দর কবিরঞ্জন রামপ্রসাদও লিখেছিলেন, যা আবো গ্রাম্য ভাড়াট্ট এবং কুরুচিপূর্ণ।



## ষষ্ঠ অধ্যায়

### লোকসাহিত্য

মঙ্গল-কবিতা যখন অৰ্ধ-পৌৰাণিক ও লৌকিক দেব-দেবীর মহিমা প্রচারেব মাধ্যমরূপে মানুষকে সাহিত্যে রূপ দিচ্ছিলেন, বাংলার প্রত্যন্ত সীমায় আবাকানে বসে তখনি দুই মুসলমান কবি নিছক মানুষের কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করছিলেন, এটা লক্ষ্য করার মতো। বোধ হয় তাঁরা হিন্দু ছিলেন না বরেনই, দশম থেকে বোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত যে বাংলা সাহিত্যিক ঐতিহ্য হিন্দু লেখকদের হাতে দিয়ে গড়ে ওঠে, তাব প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। যে জগ্জেই হক, সপ্তদশ শতাব্দীর দৌলৎ কাজী ও আলাওল বাংলা ভাষাব দুই অসামান্য কবি। লয়লা মজলু, শিবীন ফবহাদ প্রভৃতি ইসলামী কিসসা-বাহিনীর প্রভাবই সম্ভবত তাঁরা এই সব কাব্যকাহিনী রচনা করেন।

পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলায় অনান্য লোককাব্যও অনেকে এই বকম লোক-গাথা রচনা করেছিলেন, যাব কিছু অংশ চন্দ্রকুমার দে ও দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সংগৃহীত হয়ে ময়মনসিংহ-গীতিকা নামে প্রকাশিত হ'য়াছে। এগুলিব মধ্যে সংস্কারমুক্ত সহজ মনুষ্যত্বের রূপটি আদৌ উজ্জ্বল। শব্দের গাঁথনি ও চবিত্ত্রের বাস্তবতায় এগুলি খুব আধুনিক মনে হয়, যদিও সংগ্রাহকরা এগুলিকে বোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা বলে প্রচার করেছেন। অনেকের ধারণা পশ্চিম বাংলার কোন কোন জেলাতেও এই বকম লোককাহিনী আছে।

বাংলার নানা অঞ্চলে প্রচলিত বহু শিচিৎ ছড়াগুলিও লোকসাহিত্যেব নিদর্শন হিসাবে সমান অমুসন্ধান ও অন্তর্দীক্ষণের যোগ্য। পল্লব মা-দিদিমাদের মুখে মুখে, চান্দী-বাদিগলদের মুখে মুখে যুগের পব যুগ এবা তেসে চলেছে। এই তিন পয়ায়েব সাহিত্য নিয়েই আলোচনা করা যাচ্ছে এবাব।

### দৌলৎ কাজী ও আলাওল

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু থেকে বাংলা দেশে মুসলমান সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং হুসেন শাহ, নসবৎ শাহ, পরাগল খান, ছুট খান প্রমুখ সুলতানবাব

অনেকেই বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও বাঙালী লেখকদের সহায়ক ছিলেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর আগে বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি বা সাহিত্যিকের উদ্ভব হয় নি।

প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি হলেন দৌলৎ কাজী, তারপর সৈয়দ আলাওল। দু-জনেই এঁরা আবাকান-রাজ সুরমার সভায় ছিলেন। রাজার লস্কর-উজির আসরাফ খানের আদেশে কবি দৌলৎ কাজী ‘সতী ময়নাবতী বা লোর চন্দ্রানী’ কাব্য লেখেন ১৬২২-৩৮ খৃঃ অব্দের মধ্যে। এই কাব্য অসমাপ্ত রেখেই মারা যান তিনি, কবি আলাওল রাজমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের আদেশে সমাপ্ত করেন তা।

আলাওল ফরিদপুর জেলায় জন্মান। পূর্বগীজ জলদস্যুরা তাঁকে বাল্যেই হরণ করে নিয়ে যায় ও আরাকান-রাজদরবারে বিক্রী করে দেয়। এখানে তিনি মহম্মদ মাগন ঠাকুরের প্রিয়পাত্র হন এবং তাঁর আদেশেই তাঁর বিখ্যাত পদ্মাবৎ বা পদ্মাবতী বই লেখেন (১৬৭১)। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র সুলজা যখন পালিয়ে আরাকানে আশ্রয় নেন, আলাওলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। তারপর আওবঙজেবের চক্রান্তে সুলজা নিহত হলে, মডযস্বে লিপ্ত থাকাব অপরাধে আলাওলেরও কারাবাস হয়। পরে সেখান থেকে তিনি ছাড়া পান এবং আরাকান ত্যাগ করে চলে যান। একান্ত রোমাঞ্চকর জীবন তাঁর।

দৌলৎ কাজীর সতী ময়না একটি সুন্দর উপাখ্যান-কাব্য। এর ভেতর কোন অলৌকিক ঘটনা নেই, কোন দেব দেবীর হস্তক্ষেপ নেই। সামাজিক মানুষের সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কাহিনীই কবি বিবৃত করেছেন। ঠেট হিন্দী থেকে এই কাহিনীর মূল সংগৃহীত। কাহিনী সংক্ষেপে এটি : লোর দেশের রাজা সাধবী পত্নী ময়নাবতীকে ত্যাগ করে গোহারী রাজকন্যা চন্দ্রানীকে বিবাহ করেন। বিনা দোষে পরিত্যক্তা সতী ময়নাবতীর দুঃখের অন্ত নেই। নানা দুঃখ দুর্বৃত্ত তাঁকে উত্তাক্ত করে। অবশেষে তাঁর মহত্ব এবং সতীত্বই তাঁর অমূল্য স্বামীকে ঘরে ফিরিয়ে আনল। অবশু সঙ্গে এলেন সপত্নী চন্দ্রানী, যাকে ময়নাবতী প্রীতির সঙ্গেই গ্রহণ করলেন।

দৌলৎ কাজীর রচনার নিদর্শন,

শ্রাবণ মাসেতে ময়না বড় সুখ লাগে।

রিমি ঝিমি বরিপে মনে ভাব জাগে ॥

ধরতি বহয় ধারা রাত্রি আঁখিয়ারি।

খেলয় বঁধুর সঙ্গে শোহাগ ধামারি ॥

আলাওলের পটুয়াবাং হল চিত্তোবেব বাণী পদ্মিনীৰ কাহিনী। মহম্মদ জাযসী-বচিত্ত হিন্দী কাব্য খেলে এৰ নিষয়বস্তু গৃহীত, যদিও কাৰি যথেষ্ট স্বাধীন বঙ্গনাৰ আশ্রয় নিয়েছেন পদে পদে। বাধব নামে এক ব্রাহ্মণ বাণীব হাতেৰ বাঁবন কোন বকমে লাভ কলে খিলজী সুলতানকে ৷ এনে দেয় এবং বনে, পদ্মিনী আপনাকে স্বানিক্ত ববণ কবনেন। এব পৰ হয় চিত্তোব আকদণ এবং আম্ববক্ষার্থে পদ্মিনী জহব-বাংব অনুষ্ঠান কলেন।

আলাওলব বচন। অঁ. পবিচ্ছন্ন ও বাস্তবসম্মত। বাহুল্য নই,  
কুণ্ঠা নই, ভাষাও আশাশুভ। স্বচ্ছ। গমন,

मत्वादेव आगिना पद्मिनी उपस्थितः ।

খোঁপা অগাধবা কেশ দৈল মুদ্রাজি

ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାମଳ ଭାବ ଥବ. ଛୁଇଁଲ ।

চন্দ্রঃ ব শুক্ল পক্ষ দ্বাদশী ১১

জাতিদৰ্শ গিৰিপোত সব নাচুন্দৰ বিনে স্তম্ভে, সহ ঐশ্বৰ্য্য ধননা  
সংজ্ঞা গিনি বাবোব পাদস্থ,

प्रयोग १८०। कति एक रु०।द

ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਭੀਰ ਨਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸੰਸਾਰ

मयमनसिंह-गौतिका

উপাদান বর্গীভুক্ত প্রাচীন মন্দিরসমূহের মধ্যে ১৯৬৩ ও ১৯৬৪-৬৫ সালে  
ছোট যমুন বিদ্যাবন, তে. ন. ক. ব. চ'র বিজ্ঞানবর ২২.০০' ১২.০০' -  
গীতিকাণ্ডীওলা - আনা নাম ব. ক. হি.। ১২ ভ.১০০' ১২.০০' হি. ১২.০০'  
নেও। ১২.০০' বি. হি. ১২.০০' মন্দির দা উ. ন. ১২.০০' ভ. ১২.০০' ন. ১২.০০'।

গাবপৰ এনেৰে বচনাগন্ধী। ও ও অশ্বত্থ লক্ষণ। মঙ্গলকা বা হক, বৈষ্ণৱ কাব্য হক, সবত্ৰ কবিশ পুৰাণী অ-কাব্য শব্দেৰে ধাৰিত অমূল্যবান কবিত্বজন। সেই তিন-কুটি তিনি নাম, আশ-এ-জেন ভাণ্ডি ঘৰে ঘূৰে আসে নানা কবিত্ব হাত নিষে। গীতিকাৰ কবিত্বা কিস্তি উপমা ও অলঙ্কাৰৰ ব্যৱহাৰে আগাগোড়া শোণিক। গাঁৱেৰে ভাণ্ডা যেন সৰ্ব, ভাষি তেমনি অনাউছব। যে কথাত প্ৰথম আবেগেই মন আন্দে, ঠিক সেই কথটিৰ প্ৰয়োগ, যে ছন্দটি যেখানে মানায়, সেটি ঠিক সেখানে নিৰ্বাচন, কবিত্বৰ অমৃত

কৃতিত্বের নিদর্শন। মঙ্গলকাব্যের কবিরা পয়ার আর ত্রিপদীর চড়াই উৎরাতে গিয়ে মুহমূহ চিৎ হয়ে পড়েছেন, ময়মনসিংহ-গীতিকার কবিরা কিন্তু শ্লোকের পর শ্লোক দু'নো মিল দিয়ে গেঁথে গেছেন, কোথাও হৌচট খাবার বা হেঁচড়ে চলার চিহ্ন নেই। বরং স্থানে স্থানে এমন অনেক অংশ আছে, প্রকাশতঃপক্ষে যা আধুনিক কাব্য-ভাষার খুব কাছাকাছি।

এই দুই কারণে সন্দেহ জাগে গীতিকার গল্পগুলি পুরাতন, কিছু কিছু অংশও পুরাতন, কিন্তু তাকে যম-মেজে যথাসম্ভব প্রাচীন সাজে সাজিয়ে এ কালেই লেখা হয়েছে, এ কালের অমুযায়ী ব্যঞ্জন দিয়ে।

কোড়া পাখী শিকার করতে এসে বিদেশী শিকারী জলাশয়ের ধারে ঘুমিয়ে পড়েছে, জল নিতে এসে তখী কিণোরী তার রূপে মুগ্ধ হয়েছে। বেদের মেয়ে বাঁশবাজি দেখাতে এসেছে, তার অমুগ্ধ দেহতঃপক্ষে ও বিপজ্জনক ক্রীড়া-কৌশল যুবক ব্রাহ্মণ কুমারকে সহানুভূতিতে আর্দ্র করেছে। অহুরাগের এমন সহজ লীলা ও তার স্বীকৃতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও নেই। এমন নিখুঁতভাবে মানব-মনের স্বর্ধ উপলব্ধি করার পরিচয় মঙ্গলকাব্যে ত দূরের কথা, বৈষ্ণব কাব্যেও নেই। মাহুঘের সামাজিক মনই সেখানে নেই, তার পরিবেশই অপ্ৰাকৃত।

ময়মনসিংহ-গীতিকার যে কোন কাহিনী, সে মহয়া হক, মলুয়া হক, চন্দ্রাবতী বা কঙ্ক-লীলা হক, সব জায়গায় জীবনকে সাদা গোথে দেখা ও প্রকাশ করার একটা আশ্চর্য সহজতা মিলবে। যেমন,

চান্দ সুরজ ডুবুক আমার সংসারে কাজ নাই।

জাতি বন্ধু জনে আমি আর ত নাহি চাই ॥

তুমি যদি ডুব কহা আমার সঙ্গে নাও।

একটি বার মুখে চাইয়া প্রাণের বেদন কও ॥

ঘরে তুইল্যা লইব আমার সংসারে কাজ নাই।

জলে না ডুবিও কহা ধর্মের দোহাই ॥

দ্রবুন্তের হাতে লাক্ষিতা সতী জীর আত্ম-বিনাশনের মুখে অক্ষয় স্বামীর এই আকুল ক্রন্দনের মতো সহজ কাব্য বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। বেহলা কলার নান্দাসে ভাগার সময়, সন্কা এবং বেহলার ভাইয়েরা তাকে নিরস্ত করতে এসে যা বলেছিলেন, তার তুলনায় এটুকু অনেক বেশী উজ্জ্বল নয় কি ?

দুর্ভাগ্যের কবলে পড়ে কুলবতী নারী বলছে,

গাওর পারের হিজল গাছ ফুট্যা রইছ ডালে ।

দুঃখের কথা কইও মোর বন্ধুর নাগাল পাইলে ॥

সাক্ষী হইও নদী-নালা আর পশু পংখী ।

অভাগী সুনাইয়ে দিল কাল বিধাতা ফাঁকি ॥

সত্য যুগের বায়ু সাক্ষী আর ত সাক্ষী নাই ।

বন্ধুরে কইও তোমার মরেছে সুনাই ॥

রাবণের রথে আবদ্ধ সীতার আর্তনাদ এর কাছে কত কৃত্রিম মনে হয় !  
বলা বাহুল্য, কুস্তিবাসের সীতার কথা বলছি ।

সর্বত্র এই সহজ স্বচ্ছতার গুণেই গীতিকা এত বড় সাহিত্য হতে পেরেছে ।  
জীবন-বোধের সার্বক্ৰিয়তা এর প্রত্যেকটি নরনারী যেমন বাস্তব, মনস্তত্ত্বজ্ঞানের  
পরিপাটিতায় প্রত্যেকটি কাহিনী তেমনি সজীব । এর তুলনা ফরাসী ক্রবাত্তর  
কাব্যে এবং স্বচ ব্যালাডে আছে ।

এখন প্রশ্ন আসে, এ জীবন কাদের ? এ দেশের পারিবারিক পরিবেশে  
স্বাধীন ভালোবাসা কোন দিন প্রশ্রয় পায়নি, তাই পরকীয়াবানকে এদেশে  
ধর্ম বলে চালাতে হয়েছে । তাই বিদ্যাসুন্দরকেও শেষ পর্যন্ত কালী-মাহাত্ম্য  
দিয়ে বাঁচাতে হয়েছে । এই দেশে বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ প্রেম এবং তার জন্তে  
সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ...এ সত্যই অদ্বিত । আর এ থেকেই সন্দেহ জাগে  
গীতিকার প্রাচীনতা নিয়ে ।

## ছড়া

ময়মনসিংহ-গীতিকাগুলি বাঙালী বিদগ্ধ সমাজের বাইরে নিরক্ষর গ্রাম-  
বাসীদের হাতে রচিত হয়েছিল বলে দাবী করা হয়েছে । বাংলা ছড়ার যে  
অবিস্মৃত পর্যায়টি আজো অলিখিত এবং অসংগৃহীত অবস্থায় পল্লীর নরনারীর  
মুখে মুখে বেঁচে আছে, তারও জন্ম নিরক্ষর সমাজেই । কত জাতের যে ছড়া  
আছে, তা বলে শেষ করা যায় না । মেয়েলী বার-ব্রতের ছড়া, কৃষিকার্য,  
পারিবারিক কর্তব্য, খাদ্য, পরিধেয়, মানব-প্রকৃতির বিচিত্রতা, নানা বিষয় নিয়ে  
তৈরী রাশি রাশি ছড়া বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে আছে ! সেগুলির  
ভেতর দিয়ে যেমন সমাজ-জীবনের বহু অনাবিষ্কৃত দিকের সঙ্গে পরিচয় হয়,  
তেমনি বহু স্নস্বন্ধ ও নিত্য ব্যবহার্য phrase, idiom ও epigram-এর

সঙ্গে মুখামুখি হওয়া যায়। আব প্রয়াসহীন পাণ্ডিত্যহীন সহজ কবিত্বের সাক্ষাৎ ত পাওয়া যায়ই প্রচুর। বাংলা শব্দতত্ত্ব ও ছন্দ-বিজ্ঞানের ইতিহাসেব অনেকগুলো দিকেব ওপব ছড়া সভাই নূতন খালোকপাত কবে। কিন্তু এসব সংগৃহীত ও সম্পাদিত কবে হবে এবং কে কবাবন, সে-ই হল সমস্যা।

সাবা দেশে ছড়ান ছেলে-ছান ছড়া, বাব-বভেব ছড়া, কপকথা, হেঁষালি, প্রবান-প্রবচন ইত্যাদি সবস্তুে সংগৃহীত হলে দেখা বানে, ছড়া আমানেব সাহিত্যেব বৈশ্য। ভাষাব দিক থেকেই হক, আব ভঙ্গিব দিক থেকেই হক, এ সাহিত্যেব ধাব-কবা জিনিস নেই বললেই চলে। ‘বাধা মুখে বোদ লেগেছে ডালিম কেটে পড়ে,’ ‘কুঁচবরণ বাজুকথাব মেঘেব বরণ চুল,’ ‘তাবা গাই-বললে চয়ে, তাবা হীবৈষ দাঁত ঘয়ে’ - এই বকম বাশি বাশি উজ্জল পংক্তি এই ছড়া-সাহিত্যেব মন্যে অতি অনস্বাসে মণি-মুক্তাব মতো ছড়াছড়ি হয়ে আছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেব ভাণ্ডারে এ জিনিসেব সাক্ষাৎ মেলে একমাত্র ময়মনসিংহ-গীতকাষ। কবানি সোঝা যাবে য-বান হুণে লাইন হাণে নিলিট। সমং,

অম কাঠানেব বাগান দাব ছাষায় ছাষায় যেতে।

উড়কি নানেব নুড়কি দেব পথে ছাণন থতে।

## সপ্তম অধ্যায়

### গীত সাহিত্য

মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব কাব্যের যুগ শেষ হতে, বাংলায় দেখা দিল গানের যুগ। এক হিসাবে বাংলার সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যটাই গানে সীমাবদ্ধ। বৈষ্ণব পদাবলী ত বটেই, রামায়ণ, মহাভাবত এবং মঙ্গলকাব্যগুলিও আসবে গাওয়া হত। সেদিক থেকে এই যুগ-বিবর্তনে নূতনত্ব কিছু নেই। কিন্তু নূতনত্ব আছে অল্প দিক থেকে। এখান থেকেই বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র্যের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। শ্যামাসঙ্গীত, উমাসঙ্গীত, বাউল সঙ্গীত, লৌকিক প্রেমসঙ্গীত, নানা নূতন নূতন পথে পবীক্ষা সুরু হল, যা কৃষ্ণচন্দ্রের যুগ থেকে একেবারে দ্বৈধব গুপ্তের আমল পর্যন্ত অব্যাহত ধারায় বয়ে এসেছে।

মঙ্গলকাব্যগুলির তেতব চণ্ডী, মনসা, শীতলা, নানা মাতৃ-দেবতাব সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু কালিকাব আংশিক সাক্ষাৎ এক বিতাসুন্দর ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। বামপ্রসাদেই প্রথম কালীর আবির্ভাব এবং সে একেবারে দৈবমহিমা-বর্জিত বাস্তবী মাযেব রূপে। দাশবধি ও কমলাকান্ত এ বিষয়ে কবেছেন তাঁর অনুগমন। বৈষ্ণব বাৎসল্য সঙ্গীত আগেই বচিত হয়েছিল, শাক্ত বাৎসল্য সঙ্গীত বচিত হল এই সময়। এবণ সূচনা বামপ্রসাদে, কিন্তু দাস্তুরায় ও ব্রজ বায় প্রমুখের হাতে এই শাখার পুষ্টি হয়। শাক্ত-অভ্যুদয়ে বৈষ্ণব গীতি সাময়িকভাবে চাপা পড়লেও, কৃষ্ণকমল, হক ঠাকুর, বদন অধিকারী, নীলকণ্ঠ প্রভৃতির হাত দিয়ে তা-ও আবার নূতন কবে মাথা তুলল।

এছাড়া এল লৌকিক সঙ্গীত। উর্দু টপ্পা থেকে নিধুবাবু তা বাংলায় আমদানি করেন। শ্রীধর কথক, কালী মির্জা, রাম বসু এ বিষয়ে ছিলেন তাঁর সহকারী। বাউল গানের জন্মও এই সময়েই কিনা বলা কঠিন। কাবণ বৌদ্ধ প্রভাবের যুগ থেকেই একটা ধর্ম সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, যা বাউল নামে খ্যাত। এঁদের সাহিত্যিক ঐতিহ্য পুরানো হবাবই কথা। কিন্তু ছাপার অক্ষরে যে বাউল গান আমরা পাই, তা খুব অবাচীন। এমন কি যে সময়ের কথা বলছি, তারও পরবর্তী হওয়া সম্ভব।

### শ্রীমাসঙ্গীত : রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত

প্রায় তিনশো বৎসর বৈষ্ণব প্রেমসঙ্গীতের একাধিপত্য চলাব পৰ বাংলা সাহিত্যে শ্রীমাসঙ্গীত দেখা দিল।

তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতি এদেশে খুব প্রাচীন। ঘবে ঘবে কালীপূজার ধুম ছিল। শ্মশানকালী, বক্ষাকালী, ডাকাতের কালী, বকমাঝি কালী বাঙালীর কাছে পূজা পেয়েছেন। ধূপধূনো, ঢাকের বাজ ও পাঁঠার বজ্রে নিত্য তাঁর মহিমা ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু দেশের সাহিত্যে তাঁর সন্ধান মেলে না। সব দেবতার নামে মঙ্গল আছে, ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ বায়ও বাদ পড়েন নি, কিন্তু কালীর ভাগ্যে কোন মঙ্গল লাভ হয় নি। মাতৃদেবতার মধ্যে চণ্ডী নানা স্থানে নানাক্রমে আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু কালীকপে তাঁর অবতরণ বিদ্যাসুন্দরের আগে দেখা যায় নি। এৰ একটা কাবণ হয়ত বৈষ্ণব মতের অতিপ্রচাৰ, কিন্তু আসল কাবণটা অজ্ঞাত।

খাঁটি শ্রীমাসাহিত্যের প্রবর্তন কবলেন রামপ্রসাদ এবং তাঁর হাতেই এর সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা সাধিত হল। লিখিক কবি হিসাবে বিচার কর্তে বসলে, রামপ্রসাদের আগ অনেক ক্রটি চোখে পড়বে। তাঁর ভাষা সৌষ্ঠববিহীন, বক্তব্য অনঙ্কষণবর্জিত, তবু রামপ্রসাদ অতুলনীয় তাঁর অকপট আন্তরিকতার জন্যে। এই আন্তরিকতার আবেদন কদাচিৎ নবোত্তম প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনের লেখায় পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে রামপ্রসাদই শ্রেষ্ঠ। যেমন,

মা মা বলে আব ডাকব না।  
ওমা, দিয়াছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা ॥  
ছিলাম গৃহবাসী, কবিলি সম্যাসী,  
আব কি ক্ষমতা বাখিস এলোকেশী,  
ঘবে ঘবে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,  
মা বলে আব কোলে যাবো না ॥

এই যেমন হতাশামিশ্রিত অভিমানের সুব, তেমনি আত্মনির্ভরতাও দেখা যায়,

আমি কি ছুথেরে ডরাই।  
তবে দাও ছুথ মা আর কত চাই ॥



বিষের কুন্মি বিয়ে থাকি মা,  
 বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই ।  
 আমি এমন বিষের কুন্মি মাগো,  
 বিষের বোঝা বয়ে বেড়াই ॥  
 প্রসাদ বলে বন্ধময়ী,  
 বোঝা নানাও ক্ষণেক জিরাই ।  
 দেখো সুখ পেয়ে লোক গর্ব কবে,  
 আমি করি দুখের বড়াই ॥

এই কখনো অভিমান, কখনো হতাশা, কখনো উল্লাস, কখনো অহুন্নয়...  
 এ যেন আপন অন্তরঙ্গের সঙ্গে আন্তরিক বোঝা-পড়া । আগুন প্রত্যয়ে অকপট  
 না হলে, মানুষ কখনো এত সহজে নিঃশেষে তার মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারে না,  
 ভেবে চিন্তে আক্ষরিক শব্দ বা অঠক বা বন্দনা লেখে ! প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে  
 সে রকম লেখার পরিমাণ বড় কম নয় ।

রামপ্রসাদের এই ধারা কমলাকান্তে এবং দাশরথিতেও কতক পরিমাণে  
 বয়ে এসেছে । কমলাকান্তের রচনা ঐকান্তিকতাব এই উচ্চভূমি কনাচিং  
 স্পর্শ করে । মাঝে মাঝে যখন তাঁর পাণ্ডিত্যের নকল আবরণটি খসে পড়ে,  
 তখন তাঁর লেখনীও রামপ্রসাদের সহজ বেগ অর্জন করে । যেমন,

মজলো আমার মন-ভ্রমরা কালী-পদ-নীলকমলে ।

বিষয়-মধু তুচ্ছ হল, কামাদি বিপ্লবকলে ।

অমুপ্রাস বাতিকগ্রস্ত দান্তরায়ও এক-একবার এই স্তরে পৌঁছেছেন,

দোষ কারো গো নয় মা,

আমি স্ব-খাত সলিলে ডুবে মরি শ্রামা ।

শ্রামাসঙ্গীতের এই করুণ মধুর সুরটি কিন্তু এইখানেই শেষ হয়ে যায় ।  
 পরবর্তী কালে আর তা শোনা যায় নি ।

### উমাসঙ্গীত : দাশরথি রায়

শ্রামাসঙ্গীতের পাশাপাশি আর একটি শাখা সাহিত্যকে আস্তে আস্তে  
 অধিকার করেছিল, তা হচ্ছে উমাসঙ্গীত । উমাসঙ্গীত বৈষ্ণব বাৎসল্য-  
 সঙ্গীতের মতোই বাঙালীর আদরের সামগ্রী ।

বৈষ্ণব কবিতায় যশোদার আদরের ধন গোপাল বনে যায় গরু চরাতে। বনে নানা বিপদের ভয়, কচি ছেলে গোপাল, তার ওপর ছুরন্ত, কাজেই মায়ের প্রাণ নানা আশঙ্কায় ব্যাকুল। সারা দিনের অদর্শনে ব্যাকুল। হষে তাই তিনি ঘর-বার করেন। এই ক্ষণিক অদর্শন ও আশঙ্কার উত্তাপেই বেশির ভাগ কবিতার জন্ম।

গো-চারণে যাবার আগে যশোদা গোপালকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিচ্ছেন,

মায়ের শপতি লাগে                      না ধাইও ধেমুর আগে  
পরাণেব প্রাণ নীলমণি।  
নিকটে রাখিও ধেমু                      বাজাইও মোহন বেণু  
ঘরে বসে আমি যেন শুনি।

\*                      \*                      \*

তৃষা হলে চেও বারি                      বলাই ধরিলে ঝার  
নামিও না যেন যমুনায।

স্নেহাঙ্ক মাতৃ-হৃদযেব স্করণ আশঙ্কা এর চেয়ে স্নন্দর ভাবে আর প্রকাশ করা যেত কিনা সন্দেহ!

গোপালের দৌরাগ্ন্যে বিব্রত জননী স্নেহমিশ্রিত অলুযোগ প্রকাশ পেয়েছে যে হৃ-এক স্থানে, তা-ও কম উপভোগ্য নয়! যেমন,

মরি বাঁছা ছাড়ো রে বদন,  
কলসী উলাইয়া তোমায় লইব এখন।  
আমি রইলাম তোমায় লইয়া,  
যায় যে ঘরে উনান বইয়া,  
মোর হইবে কিসের উপায়।  
কলসী লইয়া কাঁথে, ছাড়ো রে অভাগী মাকে,  
হেরো দেখো ধবলী পিয়ায় ॥

এখানে জননীর যে রূপ, তা কৃষ্ণ-জননী যশোদার রূপ নয়। সন্তানের যে রূপ, তা-ও গোলোকবিহারী হারির নয়। এ রূপ বাংলা মায়ের, বাঙালী ছেলের। যে হতভাগিনী পল্লী-জননী দূর গ্রামে কোলের শিশুটিকে পড়তে পাঠিয়ে, সারাদিন তার পথ চেয়ে বসে থাকেন, আর নানা অমূলক চিন্তায় আকুল হয়ে ছটফট করেন, এ তাঁরই অন্তরের রূপ। যে পল্লী-গৃহিণী

বিপুল কর্মভারবিরত সংসারে কোলে দামাল ছেলে নিয়ে বিরত হন, এ রূপ তাঁরই।

উমাসঙ্গীতের আবেদন আরো গুঢ়, কারণ তার অন্তর্গত বেদনা আরো প্রত্যক্ষ। ধনী পিতা-মাতার একমাত্র কন্যা গৌরী বুদ্ধ বর শিবের হাতে পড়েছেন। দরিদ্র, তাতে অসংযত স্বভাব, অভাবের সংসারে অনেকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে গৌরী'ব তাই ছুঁখের শেষ নাই। মা মেনকা মেয়ের এই দুর্দশা ভেবে দিবারাত্র কাঁদেন। কখনো পাবাণ স্বামীকে এমন পাত্রে কন্যা সমর্পণ করার জন্তে দোষারোপ করেন। কখনো মেয়ের ওপর অভিমান করেন। কখনো বা স্বপ্নে তাঁর যোগিনী রূপ দেখে চমকে ওঠেন। স্বামীকে অত্যাচার করেন, কয়েক দিনের জন্তে মেয়েকে কাছে এনে দেবার জন্তে। মায়ের এই অশঙ্কা, বেদনা ও আকুলতার কান্না এদেশে আগমনী গান নামে বহুকাল থেকে চলে আসছে। পার্বতী আসেন, তিন দিন মাত্র থেকে আবার চলে যান। আবার স্মর হয় মায়ের কান্না। তার নাম এদেশে বিজয়া সঙ্গীত।

এই আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত যথাক্রমে দুর্গোৎসবের আগে ও পরে এখনো তিস্তুকদের মুখে শোনা যায়। কোলীতপ্রথায় দেশের কত পার্বতীই এমনি ধারা অপাত্রে হস্ত হয়ে অভাগিনী মায়ের কান্নার কারণ হয়েছে। কত অজানা অন্তঃপুরের অশ্রুধারা পুঞ্জিত হয়ে আছে এই সব সঙ্গীতে। অল্প দাব্যতেই যে বাঙালী মা যশোদার মূর্তিতে আনাচে-কানাচে কেঁদে বেড়িয়েছেন, এতবড় ব্যথায় বুক তাঁর কতটাই না ভেঙেছে! সে ভাঙার স্মর আছে এই গানগুলিতে।

উমাসঙ্গীত রামপ্রসাদ দিয়ে স্মর হলেও, এ বিষয়ে দান্ত রাঘবেরই সর্বোৎকৃষ্ট রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। সাধারণত লোকের মুখে মুখে যে গানগুলি ফেরে তা সবই দান্তের রচনা। দান্তের প্রকৃত খ্যাতি এদেশে পাঁচালীর জন্তে। ছুঁখের বিষয়, বেশির ভাগ পাঁচালীই তাঁর তদ্রাজনের পাতে দেবার মতো নয়। কিন্তু আগমনী ও বিজয়ার গানে দান্ত রাজা।

রামপ্রসাদই অবশ্য প্রথম ধূয়াটা ধরিয়ে দিয়েছিলেন,

এবার আমার উমা এলে আর তারে পাঠাব না।

বলে মন্দ বলবে লোকে কারুর কথা শুনব না ॥

কতই লোকে প্রচার করে, জামাই নাকি ভিক্ষে করে,

এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া জামাই বলে মানব না ॥

দাশু এরই ওপর স্রের পর স্র চড়িয়েছেন। মা মেনকার বিরহব্যথার বিভিন্ন স্তর তাঁর গানে অপরূপ ভাবায় রূপ পেয়েছে। যথা,

গিরিরাজ কি করো গৃহে বসিয়ে।

সম্বৎসর গত হল উমারে আনো গিয়ে ॥

কিংবা,

গিরি গৌরী আমার এসেছিল।

স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্যরূপিণী

অচৈতন্য করে কোথায় লুকাল ॥

কহিছে শিখরী কি করি অচল,

নাহি চলাচল হলাম হে অচল,

চঞ্চলার মতো জীবন চঞ্চল

অঞ্চলের নিদি পেয়ে হারাল ॥

দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তাব,

মাষের প্রতি মায়া নেই মহামাষার,

আবার ভাবি গিবি কি দোষ অভ্যাব,

পিতৃদোষে মেয়ে পাবাগী হল ॥

কমলাকান্ত, রসিক রায়, ব্রজ বাঘ প্রভৃতিরও অনেক উল্লেখযোগ্য গান আছে এই পর্যায়ে। তবে একটা কথা সত্যের অনুবোধে স্বীকার করতেই হবে যে, মঙ্গলকাব্যেই হক, আর বৈষ্ণব কাব্যেই হক, আর শ্যামাসঙ্গীত উমাসঙ্গীতেই হক, বাংলা সাহিত্যের মৌলিক পুঁজি বেশী নয়। সেই স্বল্প মূলধন এক জনের হাত থেকে পাঁচ জনের হাতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এতে মূল কে. আর কে অহুকারক স্থির করাই কঠিন।

এইখানে বলে রাখা যেতে পারে যে, মঙ্গলকাব্যে শিব-ভূগার যে রূপ আমরা দেখেছি, উমাসঙ্গীতে তাঁদের রূপ তারই ওপর এক পৌঁচ মাত্র। সেই একই ঐতিহ্য অব্যাহতভাবে বয়ে চলেছে।

## বাউল-সঙ্গীত

সচরাচর যে বাউলদের আমরা পথে ঘাটে দেখি, তাঁদের পোশাকও যেমন বিচিত্র টুকরোর সমাবেশে তৈরী, তাঁদের ধর্মমতও তেমনি বিভিন্ন মতের তন্মাংশ নিয়ে গঠিত। এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বাংলার বাইরে নেই এবং ষাণ্ডাসীর

সামাজিক জীবনের বাইবেই তাঁদের স্থিতি। তাঁরা হিন্দুও বাটে, মুসলমানও বাটে, আবার দুইয়ের কোনটাই নয়। মনে ক'বা যেতে পারে, দুই সম্প্রদায়ের মূল শাখা থেকে কোন-না-কোন কারণে ধাঁধা ছাঁট পড়ে গেছেন, তাঁরা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মমতের কতক কতক স্থূল কথা নিয়ে, তাব সঙ্গে কিছু পবিমান নূতন জিনিস মিশেল দিয়ে, নিজেদের মতো করে একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গড়ে নিয়েছেন। প্রচলিত সমাজবিদ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য না হওয়ায় লোকে তাঁদের বলেছে বাউল বা বাতুল।

সমাজ প্রতিষ্ঠার সময় সমন্বয় সাধন ও একীকরণের মন্ব হিসাবে এঁরা তাই প্রচলিত দেব-দেবীর দেব বাতিল করেছেন। এঁদের উপাস্ত হচ্চেন সাঁই বা গুল। কিছু এঁদের উপাসনা-পদ্ধতিতে বৈষ্ণবোচিত নতি ও মাধুর্যের অভাব নেই, আবার গুলীদের ভোগবাদকেও এঁরা উপেক্ষা করেননি। এঁদের সাঁই সা গুল বা ক'টা কথনো পার্থিব গুল, কখনো বা ঈশ্বর। তাঁর নির্দেশ ছাড়া অন্য কোন অশুশাসনই এঁরা মানেন না। এই জগে এঁদের আর এক নাম ক'টাভজা। এঁদেরকে এক শ্রেণীর সহজিয়া ও বলা যেতে পারে। বোধ হয় তাপিক বোদ্ধ আমের সমাজ বহির্ভূত বকমের কতকগুলো সম্প্রদায় দেশে গড়ে উঠেছিল, যাব একটা শাখার পবিগতি বাউলে।

বাউল সম্প্রদায় এঁদের বচনা না হ'ব, এঁদের জগে বচন, তাতে আব সন্দেহ নেই। অদিকাংশ গানেরই বচনা এমন নিখুঁত, বক্তব্য এত গভীর এবং ব্যঞ্জনা এত মধুর যে, এগুলো অশিক্ষিত বাউল সম্প্রদায়ের বচনা বলে ত মনে হয়ই না, উপরন্তু খুব বেশী প্রাচীন বলেও মনে হয় না। এ পর্যন্ত যে সমস্ত সম্বলন প্রকাশিত হয়েছে, তাব কোনটাই নির্ভেজাল ভাবা যায় না। অমুক মান্নি, অমুক কৈবর্ত, অমুক বাপ্পি, অমুক হবক'বা, বিচিত্র নামের স্বাক্ষর নিয়ে সম্বলবিহারী য'ই প্রচাণ করেন না, এঁদের বচনা থেকে শিক্ষিত আধুনিক কবিব হাত তাঁরা গোপন করতে পারেন না। এদের ভাবাই এ বিষয়ে আমাদের প্রধান সাফ্য,

ধন্য আমি বাঁশীতে ভোব আপন মুখের ফুঁক।

এক বাজনে ফুবাই যদি নাটক কোন দুখ ॥

ত্রিলোক ধাম গোমার বাঁশী আমি হোমার ফুঁক।

ভালো মন্দ রঞ্জে বাজি, বাজি দুখ আব সুখ ॥

সকাল বাজি সন্ধ্যা বাজি বাজি নিশুইত রাত ।  
ফাগুন বাজি শাওন বাজি তোমার মনের সাথে ॥

কিংবা,

হৃদয় কমল চলছে ফুটে কত যুগ থেকে ।  
তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা মুক্তি দিবে কে ।  
ফোটে ফোটে ফোটে কমল ফোটোর না হয় শেষ ।  
সেই কমলের গন্ধ একই রূপ যে তাই বিশেষ ॥  
তারে পারে না রে লোভী ভ্রমর যাইতে ফেলে রেখে ।  
তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা মুক্তি দিবে কে ॥

কিংবা,

তোমার পথ তেকেছে মন্দিরে মসজিদে ।  
তোমার ডাক শুনে সাঁই চলতে যে চাই,,  
রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে ॥

কিংবা,

পরাণ আমার সোতের দীয়া,  
মোরে ভাসাইলা কোন ঘাটে ॥

নিঃসন্দেহে এগুলো আধুনিক রচনা। শুধু আধুনিক নয়, ববীন্দ্রযুগের রচনা। এর ভেতর যেটুকু Archaic ভঙ্গি দেখা যায় তা স্বেচ্ছাকৃত, একটু পাণ্ডে দিলেই আর কোথাও অচেনা কিছু থাকে না। এসব রচনা আব যাই হক, ময়মনসিংহ-গীতিকার চেয়ে ঢের বেশী ভেজাল। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গীতের অনেক শাখা, অনেক রূপ আছে। কোথাও তালো জিনিস নেই এমন নয়, কিন্তু সর্বত্র তা অতিশয় গতানুগতিক। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাই এই অদৃষ্টপূর্ব ঘটনাকে স্বীকার করে নেওয়া কঠিন।

## লৌকিক সঙ্গীত : নিধু বাবু ও গ্রীধর

চর্যাপদ থেকে শুরু করে একেবারে বাউল সঙ্গীত পর্যন্ত, বাংলা সাহিত্যে একটানা উপ-ধর্মের আধিপত্য চলে এসেছে। কিসসা-কাব্য ও ময়মনসিংহ-গীতিকা ভিন্ন সামাজিক মানুষের দাবী কোথাও স্বীকৃত হয় নি। মঙ্গলকাব্যে সামাজিক মানুষ আছে, সে দেব-দেবীদের বকলমায়। রামায়ণে একবার

ব্যক্তিগত আকৃতির সুর শুনেছি, সে-ও ধর্মসম্পর্কহীন নয়। কাজেই আমাদের সাহিত্যে প্রেম এসেছে রাধার জবানীতে। বাৎসল্য এসেছে যশোদা বা মেনকার মারফতে। শৌর্য এসেছে চণ্ডিকার দোহাই নিয়ে।

উনবিংশ শতাব্দীর সৃচনায় ক্রমে ব্যক্তিক অমুভূতি ভাঙা ভাঙা ভাবে আসতে সুর করল। যেটাকে আমরা বলি কবিওয়ালাদের যুগ, সেই যুগের গীত সাহিত্য সম্বন্ধে সত্যি কথা বলতে গেলে বলা দরকার যে, বৈষ্ণব কবিতাব পর লিরিক কাব্যের ধারা-বিবর্তনে তার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। যদিও এই সব কবির প্রেমসঙ্গীতের ধারা মূলত বৈষ্ণব কবিতা থেকেই গৃহীত, তবু এখানে রাধা-কৃষ্ণানেই, তার স্থান দখল করেছে সামাজিক স্ত্রী-পুরুষ। তাদেরই অমুরাগ, আবেদন, অভিমান, বিরহ, অপমান, প্রেমের বিভিন্ন অবস্থা অবলম্বন করে এই সব গান লিখিত হয়েছে। নিছক কৃষ্ণসঙ্গীত এবং শ্রীমা-সঙ্গীতের প্রভাব তখনো ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে কাজ করেছে। কৃষ্ণকমলের 'রাই উন্মাদিনী' কিংবা বদন অধিকারী বা নীলকণ্ঠের পদে, কিংবা রসিক রায় বা ব্রজ রায়ের শ্রীমাসঙ্গীতে তার ভগ্নদশার কিঞ্চিং পরিচয় পাই। কিন্তু নূতন সুরেরই প্রাবল্য ঘটেছে। সে সুর ক্ষীণ হতে পারে, তবু উপেক্ষণীয় নয়।

নিধু বাবু, ক্রীধর কথক, রাম বসু, কালী মির্জা, হক ঠাকুর, এই ক-জন এই নূতন দলের অন্তর্গত। নিধু বাবুই এই দলের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিসম্পন্ন। শোরি মিঞার ঠাকুরকে বাংলা ছাঁদে ঢেলে, তিনি একদা দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সেই সব গান আজো বাংলার পল্লী-অঞ্চলে কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। তার ভেতর বিরহের তীব্রতা বা মিলনের মনোবৃত্তি না থাকলেও, চন্দ্রাবতের প্রসন্নতা আছে, যা ভালোই লাগে। যেমন,

বিধু মুখে মধুয হাসি,

দেখিলে সোহাগে ভাসি,

তাই তোমায দেখিতে আসি,

দেখা দিতে আসি না ॥

কিংবা এটা,

তোমার তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে,

আকাশের পূর্ণ শশী সে-ও কঁাদে কলঙ্ক ছলে ॥

সৌরভে আর গোরবে, কে তব তুলনা হবে,

আপনি আপন সম্ভবে, যেন গঙ্গাপূজা গঙ্গার জলে ॥

এ ছুটি গান শ্রীধর কণ্ঠকের নামেও চলতে দেখা যায়, যদিও বেশির ভাগ বইয়ে নিধুর নামই প্রচলিত আছে। শ্রীধর এবং নিধুর রচনাপদ্ধতি অনেকটা এক রকম, দু-জনের বিষয়ও এক, শব্দ-প্রয়োগেও তফাৎ খুব কম। কান্ধাই এ গোলমালের একটা সম্ভব কারণ আছে। কিন্তু এর ওপরেও আর একটা কারণ, গীত আকারে এদের লোকের মুখে মুখে ফেরা। উপায় কি ওপরের গান দুটির সঙ্গে নীচের গানটির তফাৎ ধরার? নীচেরটি শ্রীধরের রচনা বলে প্রচারিত,

তবে তবে কি স্নেহ হত।

আমি যারে ভালোবাসি সে যদি ভালোবাসিত ॥

প্রেম-সাগরের জল ছইত তবে শীতল,

বিচ্ছেদ বাড়বানল যদি তাহে না থাকিত।

এই শ্রেণীর গান বহু কবির আছে। পৃথক পৃথক ভাবে এরা জাহা কোন কবিকে নির্বাচন করা চলে না, সমগ্রভাবে এই পর্যায়ের সারাংশকে একটা বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত করে দেখাষ্টা যায়।

রাম বসু বা কালী মির্জার বিরহসঙ্গীতের আবেদন আর একটু গভীর। অনেক স্থানে তা প্রায় খাঁটি লিবিকের কাহাকাছি এসে পড়েছে, নিধুবাবু বা শ্রীধর কথকে যা হাত পাবেন। রাম বসু বা কালী মির্জার বিরহসঙ্গীত বানানো কথা যে নেই তা নয়, মামুলি উপহার বাহ্যিক যে নেই তাও নয়। তবে সে সবকে ছাপিয়ে ওঠে একটা আকুলতা, একটা অব্যক্ত বেদনা, যা মনকে টানে। যেমন রাম বসুর,

মনে রইল রে মনের বেদনা।

প্রদাসে যখন যায় গো সে,

তাবে বলি বলি বলা হল না।

সবমে মরমের কথা কওয়া গেল না ॥

কিংবা কালী মির্জার (যদিও এতে কিছু পরিমাণে কণ্ঠ-রূপকের আভাস আছে),

আর ত যাব না আমি যমুনার কূলে।

...

...

...

...

গুরুজন ছিল সপথে,

মরে ছিলাম মরমেতে,

ভরিয়ে এনেছি কুন্ড নয়নের জলে ॥



এই ধরনের গানই যে আধুনিক প্রেমসঙ্গীতের পিতা না হ'ক পিতামহ-স্থানীয়, তাতে আব সন্দেহ নেই। নিধু বাবু বা শ্রীধর কথক, কিংবা রাম বসু বা কালী মির্জা এই ধারাটা কোথা থেকে পেলেন, তা নিয়ে গবেষণা কবে দেখতে আমাদের বেশী দূর যেতে হবে না। অনুমান করতে পারা যায়, দেব-দেবী-সঙ্গীত যথেষ্ট হয়ে যাবার পর দেশের চিত্তবৃত্তি মানব-সঙ্গীত খুঁজছিল। তাবই ভাষা আন্দোলনে আন্দোলন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে এইসব প্রেমের গানে বা নিধুব প্রসিদ্ধ বাংলা ভাষা সঙ্ঘর্ষে গানে,

নানান দেশের নানান ভাষা।

বিনে স্বদেশী ভাষা হেঁটে কি আশা।

এই প্রেমসঙ্গীত আরো একটু হাল্কা, কিন্তু আরো অনেক বেশী সাদর্শ্য ভাষায় রূপ পেয়েছে গোপাল উড়েব বিদ্যাসুন্দর গানে। ভাবভেদে বিদ্যাসুন্দর যে মানবিক আবেদনটুকুর অভাবে কান্টি আগাগোড়া অপূর্ণ শব্দ-লীলাব নিকল খেলায় পর্যবসিত হয়েছে, গোপাল উড়েব বাহা-গানে তাব প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কোন কোন বিষয়ে গোপাল উড়েব আধুনিককেও টেকা দেন, যেমন,

কমলবি বনে গেলে কাঁটা ফোটে পায।

তা বলে কি কাঁকে কাঁকে পা বাড়ানো যায়।

ডুবছি না ডুবতে আছি, পাতাল কত দূর দেখি।

নয় হ,

রূপ দেখে কি কুল হাবালান বকুনতলায় এসে ..

নয় হ,

ভেঁড়া চুনে বকুল ফুলে মালা গাঁথছে।

বলা বাহুল্য, কচিব প্রশ্ন নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না। আমাদের মনে বাগতে হবে, একদা এই উড়িয়া মহাশয়ের গান প্রকাশ্য আসবে পাওয়া হ'ত, আব মণ্ডলী কবে বসে বাসকবুজ তাই গুনতেন। চিকিৎসা আড্ডালে কুলনারীবাও গুনে জ্ব-হাতে কান ঢাকতেন না।

## সমসাময়িক

খৃঃ পূঃ ২০০০—বৈদিক আর্য সভ্যতা। বেদে পূর্বাঞ্চলীয় দেশ ও মানুষের উল্লেখ।

খৃঃ পূঃ ১০০০—রাচ (রুড্র), পৌণ্ড্র (গৌড়) ও বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ)। অষ্টিক জাতির সভ্যতা। শিব-শক্তি আরাধনা।

খৃঃ পূঃ ৩০০—মৌর্য শাসন। মগধের অধীনে বাংলায় কতকাংশ। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বাংলায় প্রবেশ।

খৃঃ অঃ ৪০০—গুপ্ত শাসন। বাংলায় আর্যাবর্তের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার। বাঙালীর রূপান্তর।

খৃঃ অঃ ৭০০—কর্ণসুবর্ণে (মুর্শিদাবাদে ?) শশাঙ্ক মহাবাজের আবির্ভাব। হর্ম্যবর্ধন ও শশাঙ্ক।

খৃঃ অঃ ৯০০—বাংলায় পাল বাজাদেব শাসন। ধর্মপালের নিদ্রিভয়। বৌদ্ধ সহজিয়াবাদ এবং চর্যাপদ ও নাথ সাহিত্য।

খৃঃ অঃ ১২০০—সেন বাজাদেব শাসন। কোলীভ্র প্রথা। লক্ষণ সেন ও জয়দেব। সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম। তুর্কী অভিযান। রামাই পণ্ডিতের শূন্য পূর্ণ।

খৃঃ অঃ ১৪০০—মিথিলায় বিজাপতি। বাংলায় বড় চণ্ডীদাস। আদি বৈষ্ণব কবিতা। তাহেরপুরে (রংপুর) কংস নাবায়ণ বা বাজা গণেশ। কৃষ্ণবাসী বামাযণ। ববিশালে বিজয় গুপ্ত ও মহম্মদসিংহ নাবায়ণ দেব। মনসা মঙ্গল। মালাধর ও শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।

খৃঃ অঃ ১৫০০—শ্রীচৈতন্য ও গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম। চয় গোস্বামী ও হান্দেব মত। পদাবলী ও চবিত সাহিত্য। বৈষ্ণবতাব প্রভাব। মুকুন্দদাম ও মাধবাচার্য। চণ্ডী মঙ্গল।

খৃঃ অঃ ১৬০০—কাশীবাস দাস ও মহাতাবত। হনবাম ও ধর্ম মঙ্গল। মুসলীম কিসসা কাব্য। দৌলৎ কাজি ও আলাওল। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখের কবিতা।

খৃঃ অঃ ১৭০০—বামেশ্বরের শিবায়ণ। মহম্মদসিংহ গীতিকা ও লৌকিক ছড়া সাহিত্য।

খৃঃ অঃ ১৮০০—তারতচন্দ্র ও নদীয়াব মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। অন্নদা মঙ্গল। হালিসহরের রামপ্রসাদ ও শ্যামা সঙ্গীত। বাউল গান।

খৃঃ অঃ ১৯০০—গীতিসাহিত্য। দাশরথি, কমলাকান্ত, নিধুবাবু, হরু ঠাকুর ও গোপাল উড়ে। এণ্টুনি, ভোলা ময়রা প্রভৃতি কবিওয়ালা।

ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ : ଆଧୁନିକ କାଳ



## সূচনা

### ইংরেজ অধিকার

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিঁদাউদ্দৌলার পরাজয় হল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি পেল ১৭৬৫ সালে। ১৭৭৩ সালের বেঙ্গলিটিং এক্ট কোম্পানিকে ব্রিটিশ জাতির প্রতিনিধি রূপে বাংলা শাসনের অধিকার দিল। এখান থেকেই শুরু হল ভারত ইংরেজ শাসন এবং নূতন যুগ এল।

নবাবী আমলের সামাজিক বিশৃঙ্খলায় ও শাসক জাতির বৈদ্যমূলক আচরণে হিন্দু-পাঁচ শতাধিক বৎসর নিগূঢ়ত হয়েছিলেন। তাঁরা আন্তরিক ভাবে চাইছিলেন পরিবর্তন। ইংরেজ শাসনকে তাঁরা নাই উন্নতি ও প্রগতি বৃদ্ধি সহায়ক জ্ঞানে স্বাগত করলেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসন সভ্যতাই প্রগতির পরিপোষক হল। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। এর পরে একে একে ডাক কলেজ, কলকাতা, হুগলী ও বহুবলপুর কলেজ হয় এবং ১৮৫৭ সালে গঠিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পুর্বাংশ আমলের শিক্ষা-দীক্ষার উপর ছেদ পড়ল এখান এবং নব সংস্কৃতির সূচনা হল। বামমোহন বায় ১৮২৩ সালে যুগের অমুখ্যায়ী ধারায় এদেশে বিজ্ঞান, ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি পড়ানোর দাবি জানিয়ে তখনকার গবর্নর জেনারেল লর্ড আমহারষ্টকে এক চিঠি দেন। এই চিঠি এবং ১৮৫৪ সনের উদ্ভব Education Despatch থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে আঁস বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

এই নূতন শিক্ষা-দীক্ষার ফলে দেশের সামাজিক জীবনকে আমূল ঢেলে সাজাব তাগিদ অনুভব করলেন দেশবাসী এবং একে একে তাঁদের দাবি অমুখ্যায়ী আইন তৈরি শুরু হল। বামমোহন বায়ের আন্দোলনে সত্যীদাহ নিবারণ আইন হল ( ১৮৩০ ), বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আইন পাশ করালেন ১৮৫৫ সালে। ১৮৫০ সালে জন্মগত বার্ষিক অপসারণ আইন এবং ১৮৭২ সালে অসবর্ণ বিবাহ আইন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আনল আবার বড় পরিবর্তন। ১৮৪৯ সালে

নারীদের শিক্ষার জন্তে প্রতিষ্ঠিত হল বেথুন কলেজ। নারীর সামাজিক অধিকার লাভের এই হল প্রথম সোপান।

রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকেই পুষ্ঠ ও সমুন্নত করেন ১৮৩৯ সালে। কেশবচন্দ্র সেন ও শিবনাথ শাস্ত্রী পরে তিন ধারায় চলে যান যদিও, তবু সমগ্র ভাবে ব্রাহ্মসমাজই দেশে বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, জাতিভেদ লোপ, নারীর শিক্ষার অধিকার প্রভৃতি প্রগতিমূলক আন্দোলন করেছে এবং নূতন যুগ ও জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাহিত্য ও সংস্কৃতিরও পুনর্গঠন করেছে। এই প্রগতিমূলক আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটা সনাতনী আন্দোলন চলে রাখাকাস্ত দেবের নেতৃত্বে। কিন্তু দেশে তা বিশেষ আশ্রয়প্রাপ্তি হতে পারে নি।

### নূতন সংস্কৃতি

ইংরেজ শাসনে নূতন শিক্ষা-দীক্ষা ও নূতন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি দেশে এল বটে, কিন্তু মস্ত একটা কুফলও এল এই সঙ্গে। দেশের অর্থনৈতিক বান্যদ সম্পূর্ণ ধ্বংস পড়ল ইংরেজ জাতিব শোষণের ফলে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্বেই বাষ্প ও বিদ্যুৎকে যান-বাহন চলাচলে এবং শিল্প-উৎপাদনে নিয়োজিত করতে পেরেছিলেন ইংরেজ জাতি। তার ফলে কুটীরশিল্পের যুগ শেষ হয়ে ইংলণ্ডে এসেছিল বৃহৎ শিল্প বা যন্ত্রশিল্পের যুগ।

ভারতবর্ষ থেকে সুলভ মূল্যে সংগৃহীত কাঁচা মাল নিয়ে গিয়ে, ইংলণ্ডের কারখানায় তা দিয়ে পণ্য বানানো এবং ভারতের বাজারে আবার সেই পণ্য এনে বেচা, এই করে ইংরেজরা অসীম ঐশ্বৰ্যের অধিকারী হলেন এই সময় থেকে। আর এই শোষণের ফলে নিঃস্ব সর্বস্বান্ত হতে লাগলেন ভারতবর্ষের চাষী ও কারিগর শ্রেণী। কিন্তু দেশের এই অর্থনৈতিক সর্বনাশ টের পেলে না অনেক দিনই তথাকথিত ভদ্রসমাজ। তাঁদের একাংশকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে জমিদার করেছিলেন ইংরেজরা, আর একশ্রেণীকে ইংরেজীশিক্ষিত স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত বানিয়েছিলেন, যাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংস্রব ছিলনা।

দেশে কিন্তু আস্তে আস্তে আন্দোলন জাগতে লাগল। শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা যখন ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় জমিদার ও ব্যবসায়ী হয়ে ধনসঞ্চয় করতে লাগলেন, অথবা সরকারী চাকুরিয়া রূপে ক্ষমতা, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে লাগলেন, সাধারণ মানুষেরা তখন স্বাধীনতা লাভের

কথা ভাবতে আবদ্ধ কবলেন। এই ভাবনা থেকেই আস্তে আস্তে স্নক হল বিদ্রোহ এবং সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সাঁওতান বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, একেব পব এক কবে দেখা দিতে লাগল। ১৮৫৭ সালেব সিপাহী বিদ্রোহে বাঙালীব কোন বড় ভূমিকা ছিল না, কিন্তু ১৮৬০ সালেব নীল বিদ্রোহে তাঁবা প্রবল শক্তিতে সজেছেন।

শিক্ষিত শতবেদের মধ্যে তবিশ মুখোপাধ্যায় হিন্দু পেট্রিয়টে নীল বিদ্রোহ নিয়ে আন্দোলন কবেছেন। দীনবন্ধু এ নিয়ে নাটক লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রব আনন্দমঠে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ মহিমাশিত হয়েছ। কিন্তু শতবেদের বাজনীতি বিদ্রোহ অপেক্ষা নিয়মতন্ত্রেব পথকেই বেশী খুজেছে। ১৮৬৭ সালেব হিন্দু-মেলায় প্রথম সজ্যবদ্ধ বাজনৈতিক আন্দোলনেব ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসেব মধ্যে এই চেহনাই বিস্তার লাভ কবে। তাবপব বঙ্গভঙ্গ বোধেব প্রয়োজনে ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন দেখা দিল, ক্রমে বঙ্গ-বিপ্লবে ঘটল তাব রূপান্তর। বাজনীতিব ছু-ধাবাই তখন থেকে চলল পাশাপাশি।

দেশেব মুসলমানবা কেউ বেউ জাতীয় আন্দোলনে এসেছিলেন, কিন্তু বেশিব ভাগই দূবে ছিলেন। ইংবেজ্বেব প্রতি বিদ্বেষ বশে তাঁবা আধুনিক শিক্ষা নেননি, তাই এট আন্দোলনেব প্রকৃত তাৎপর্য তাঁবা উপলব্ধি কবেননি। তাছাড়া ১৮৫০ সালেব ওহাবী বিদ্রোহ এবং ১৮৭৯ সালেব আলিগড় কলেজ স্থাপনা মুসলীম মনস্তত্ত্বে দাক্ষণ একটি তেদবুদ্ধিও সৃষ্টি কবেছিল। এই তেদবুদ্ধিই ১৯৩০ সালে শাস্ত্রদায়িক বাঁটোযাবাব সুযোগে লীগ মন্ত্রিসভা গঠনেব এবং ১৯৪৭ সালে বঙ্গবিভাগেব মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়েছ বাংলার চিব দুর্ভাগ্য রূপে।

## আধুনিক সাহিত্যেব বিকাশ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যেব ক্রমবিকাশেব ধাবা বুঝতে হলে, ইংবেজ বাজত্ব স্থাপনেব স্নক (১৭৫৭) থেকে স্বাধীনতা লাভেব (১৯৪৭) অধ্যায় পর্যন্ত, জাতীয় জীবনেব এই ধাবাবাহিক প্রবাহটা অহুধাবন কবা দবকাব। সাহিত্য জাতীয় মানস-প্রকৃতি এবং সমাজ প্রবণতাবেই দর্পণ, সেদিকটা বাদ দিয়ে তাই সাহিত্যেব প্রগতি বোঝাই সম্ভব নয়।

এই সময়েব মধ্যে আমবা দেখলাম, দেশে বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান আমদানিব জন্তে প্রভূত চেষ্ঠা চলছে। সামাজিক কসংস্কার ও নৈতিক কদাচার দূব কবাব

আন্দোলন' চলছে। দেশপ্রেমকে জাতির মানসলোকে সর্গোরবে প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন হচ্ছে। এই নানামুখী বাস্তব প্রয়োজন থেকেই জন্মেছে বাংলা গদ্য, যা প্রথম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার (১৭৬২-১৮১৯), রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩) ও রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) সৃষ্টি করেন।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান প্রথম রচিত হয় এঁদের সময়। ছোট-বড় বহু বই লেখা হয়েছিল। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 'বঙ্গভাষাভিধান' (১৮১৭), রাধাকান্ত দেবের 'বাংলা শিক্ষক' (১৮২০), রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ' (১৮২৬), রামকমল সেনের 'ইংরেজী-বাংলা অভিধান' (১৮৩৪) তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পাদ্রী পণ্ডিতদের মধ্যে হালহেড, আপজন, কেরী, মার্শম্যান, হটন প্রভৃতির কাজ এক্ষেত্রে সব চেয়ে স্মরণীয়। প্রথম সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রেরও এঁদের হাতেই জন্ম। মার্শম্যানের 'সমাচারদর্পণ' (১৮১৮), রামমোহন রায়ের 'সম্বাদকৌমুদী' (১৮২১), ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকর' (১৮৩১) পরের পর লক্ষণীয়।

কিন্তু কেবল মাত্র প্রয়োজনান্নক লেখা নিয়েই ব্যস্ত থাকেনি আধুনিক বাংলা সাহিত্য। যুগোচিত বিচিত্র ভাব-কল্পনা, মননশীলতা ও জীবন-দর্শন তাকে নূতন সাহিত্য রচনাতেও প্রবর্তিত করেছে। কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, নানা পথে যেমন সাহিত্যিকের সৃজনী প্রতিভা উদ্ভূত হয়েছে, তেমনই সমাজ-জীবনের বিচিত্র সম্বন্ধ-সমস্যা তাতে মূর্ত হয়েছে। নর-নারীর সম্পর্কের উপর হয়েছে নূতন আলোকসম্পাত এবং জগৎ ও জীবনের রহস্য রূপায়িত হয়েছে গল্পে, গানে, লিরিক কবিতায়। ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১১-১৮৫৯), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৮৬), অক্ষয় দত্ত (১৮২০-১৮৯১), মাইকেল (১৮২১-১৮৭৩), রঙ্গলাল (১৮২৭-১৮৮৭), দীনবন্ধু (১৮৩০-১৮৭৩), বঙ্কিম (১৮৩৮-১৮৯৪), হেমচন্দ্র (১৮৩৮-১৯০৩), নবীনচন্দ্র (১৮৪৭-১৯০৯), রমেশচন্দ্র (১৮৪৮-১৯০৯), বিহারীলাল (১৮৩৫-১৮৯৪), গিরিশচন্দ্র (১৮৪৪-১৯১১), রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩-১৯১৩), দেবেন দেন (১৮৫৫-১৯২০), অক্ষয় বড়াল (১৮৬৫-১৯১৮), প্রভাত মুখোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৩১), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬), শরৎচন্দ্র (১৮৭৬-১৯৫৮), এই শতাব্দীব্যাপী সাহিত্যযাত্রার কয়েকজন মুখ্য স্রষ্টা। এঁদের সঙ্গেই আছেন আরো বহুজন।



ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাই ছিল সাহিত্য-সৃষ্টির আদি উৎস। সিপাহী বিদ্রোহের অধাক্রান্তা ঝাঙ্গীর রাণী মাইকেলের ‘মেঘনাদবধে’ (১৮৬০) প্রেমীলার মূর্তিতে দেখা দিয়েছেন। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ‘আনন্দমঠে’ এবং বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন ‘বিষয়ক্ষে’ প্রেরণা দিয়েছে বঙ্কিমকে। ‘নীলদর্পণে’র কথা আগেই বলেছি। রবীন্দ্রনাথও স্বদেশী আন্দোলন থেকে ‘গোরা’র (১৯০৭) উদ্দীপনা পেয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রচনাকল্পি দেশ-কালের সীমাতিক্রম করে আন্তর্জাতিক মানবান্নাকে স্পর্শ করেছে তার ভাবের প্রাচুর্য ও আদর্শের মহত্ত্ব। এখান থেকেই আধুনিকতার সুর। শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী ও সমসাময়িক লেখকরা এখান থেকেই তাঁদের যাত্রা সুরু করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সুর থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের হয়েছে আশ্চর্য ও অসামান্য প্রসার। কিন্তু কলকাতা যখন থেকে হয়েছে সারা দেশের রাজধানী এবং দেশের সমস্ত ধন-জন ও জ্ঞান এসে সীমাবদ্ধ হয়েছে কলকাতায়, তখন থেকে দেশের চাষী, কারিগর ও সাধারণ মানুষদের সঙ্গে মানসিক যোগ ছিন্ন হয়ে গেছে আধুনিক লেখকদের। নবযুগের সাহিত্য তাই দেশের বৃহত্তম মানবগোষ্ঠীর কাছে অপরিচিতই থেকে গেছে। এ তিনিস ছিল না সেকালে। মঙ্গল গান, পাঁচালী, কথকতা ও যাত্রার মাধ্যমে দেশের সাহিত্য নিরঙ্কর মানুষদের কাছেও পৌঁছে দেওয়া হত। সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করতে না পারাই হল ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতির প্রধান ব্যর্থতা। একালের সাহিত্যে সাধারণ মানুষদের সমস্যাতে নতুন করে রূপদানের চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু তাঁরা এ সাহিত্যের অংশীদার হতে পারেননি আজ পর্যন্ত।

## প্রথম অধ্যায়

### গল্প

বাংলা গল্প একান্ত ভাবে এ যুগের সৃষ্টি। শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারীরা এবং তাঁদের সহযোগী বাঙালী পণ্ডিতরা যখন গল্প ভাষায় বই-পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা প্রচার করতে শুরু করেন, তখনো দেশে চলছে গল্প রচনার একাধিপত্য। দেশের লোককে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ওয়ার্যাকবহাল করে তুলে, সেই তৈরী জমির ওপর খৃষ্টধর্মের বীজ বপনই ছিল পাদ্রীদের লক্ষ্য। কিন্তু দেশের সাহিত্য তা থেকে আশ্চর্য ভাবে আত্মপ্রসারের প্রেরণা লাভ করল এবং বাংলা গল্প হ-হ করে গড়ে উঠল। এঁদের রচিত বই-পুথির আজ অবশ্য সাহিত্যিক মূল্য বেশী নয়। কিন্তু এঁদের আদর্শই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত পরবর্তী সময়ে স্রষ্টার গল্প লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরী বাংলার পাশাপাশি ছিল আর একটি বাংলা, সে হল চলিত বা খাস বাংলা। পাদ্রী-আমল থেকেই সেটি নিঃশব্দ পদমঞ্চারে চলে আসছিল। সংস্কৃতভিত্তিক পণ্ডিত সমাজের চোখে তা জলাচরণীয় বলে বিবেচিত হয়নি। বিদ্যাসাগর ঘরোয়া বাংলার phrase, idiom, নাম-ধাতু ইত্যাদিকে সংস্কৃতে অনুবাদ করে, একটি ধ্বনিগন্তীর রচনাভঙ্গি গড়ে নিয়েছিলেন। আর এই ঘরোয়া ভঙ্গির নাম হল হতোমী, কারণ কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হতোম পৈঁচার নন্দা’ বইয়ে এই ভঙ্গির সত্যিকার উৎকর্ষ দেখা যায়। টেকচাঁদেদের বা ভবানীচরণের উপহাস বা রামনারায়ণের নাটক প্রধানত হতোমী বাংলায় লেখা এবং অক্ষয় দত্ত, তারারসিক তর্করত্ন, মদনমোহন তর্কালংকার, সবাই বিদ্যাসাগরী বাংলার অনুগামী।

বন্ধিমে এসে এই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন দুটি ধারায় মিল হল। শুধু তাই নয়, সমাজসংস্কার, ধর্মপ্রচার এবং শিক্ষাবিতরণের প্রাত্যহিক উদ্দেশ্য ছেড়ে, রসসৃষ্টির মহত্তর আদর্শ নিয়ে সাহিত্যরচনাও শুরু হল। ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার রূপে বন্ধিম একাই বাংলা গল্পকে বহুদূর এগিয়ে দিয়েছেন। তাঁর

অহুগামী চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন বোস, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখও এদিক থেকে তাঁকে প্রচুর সহায়তা করেছেন। দেশের গুপ্ত দিগ্বে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সমালোচনা-সাহিত্য স্রব্ধ হয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির হাতে তা খানিকটা উদ্দীপনা পায়। বঙ্কিম-যুগে এসে সমালোচনা-সাহিত্য একটি নিজস্ব মর্যাদা লাভ করল। অক্ষয় সরকারকে আজকের হিসাবেও বড় সমালোচক বলা যায়। বঙ্কিম-যুগ থেকেই বাংলা ভাষায় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনচরিত ইত্যাদি রচনার রেওয়াজ বেড়ে গেল। তারপর রবীন্দ্রনাথ বাংলা গল্পকে ঘোল-আনা সাহিত্য-পদবাচ্য করে তুললেন।

রবীন্দ্রনাথের গল্প সাহিত্যকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : সমালোচনা বা সাংবাদিকতা-প্রধান, শিল্প-প্রধান এবং তত্ত্ব-প্রধান। বলা বাহুল্য, এ শ্রেণীবিভাগ বোঝাবার পক্ষে সুবিধাজনক হলেও, আসলে খাঁটি নয়, কারণ রবীন্দ্রনাথ এমন কিছুই লেখেন নি সাহিত্য্যাংশে যার বিশেষত্ব নেই। রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে ধ্বনিসমৃদ্ধ ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গি এবং ব্যঙ্গনাগতীর কথ্যভঙ্গিকে গল্পে বাহন-রূপে ব্যবহার করেছেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা গল্প মূলত তাঁর আদর্শেই রচিত হচ্ছে। জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, স্বিজেন্দ্রলাল রায়, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাংলা গল্পের বিশিষ্ট লেখক ঝাঁপা, তাঁরা সকলেই অল্প-বিস্তর রবীন্দ্র-রীতির দ্বারা প্রভাবিত।

আধুনিক কালের লেখকদের মধ্যে একমাত্র প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) তাঁর নিজস্ব রচনাভঙ্গির জগ্রে যশস্বী হয়েছেন। তাঁর অহুগামী লেখকবর্গ এবং আজকের সমস্ত কথা-সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার যে নূতন রীতির গল্পরচনায অবহিত হয়েছেন, এ তাঁরই প্রভাব! কিন্তু এখনো পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর অতিক্রম করে, সার্থক সাহিত্যিক কৌলীপ্ত অর্জন করেছে সামান্যই।

### মৃত্যুঞ্জয় : কেরী : রামমোহন

বৌদ্ধ গান ও দৌহা থেকে রামপ্রসাদ পর্যন্ত, বাংলা সাহিত্যে শুধু কবিতা এবং গানেরই একাধিপত্য চলে এসেছে। নীতিকথা, ধর্মতত্ত্ব, উপাখ্যান,

জীবনী, ইতিহাস, সবই লেখা হয়েছে পড়ে। ঘরোয়া চিঠি-পত্রে বা দস্তাবেজে একটা গছের চল অবশ্যই ছিল, কিন্তু সাহিত্যে তার স্বীকৃতি ছিল না। সহজিয়াদের পুঁথি-পত্রে ছিটে-ফোঁটা যে গছের নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা মেরুদণ্ডহীন এবং বক্তব্য বিষয় পবিশ্রুট করার পক্ষে নিতান্ত অপটু। প্রকৃত গছ তৈরী হল ইংরেজ আমলে। শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা ধর্মপ্রচারের সুবিধা হবে বলে, বাংলা ভাষার উন্নয়নে মন দেন। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান, সংবাদপত্র, সবই দেখা দিল তাঁদের হাত দিয়ে। এছাড়া পণ্ডিত নিযুক্ত করে তাঁরা ইতিহাস, বিজ্ঞান ও উপকথা-বিষয়ক বহু বই বাংলায় লেখাতে সুরু করলেন। বাংলা ছাপাখানারও জন্ম তাঁদেরই হাতে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামরাম বসু, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তৎকালের প্রসিদ্ধ বাঙালী পণ্ডিতরা এবং তাঁদের সমসাময়িক কেরী, মার্শম্যান, হালহেড প্রমুখ ইংরেজ পাদ্রীরা বাংলা গছেব প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করেন। সেই ভিত্তি উপরই পরবর্তী কালের সাহিত্য-সৌধ গড়ে ওঠে। এই আমলের রচনার নিদর্শন ‘সমাদানন্দপণ’, ‘সম্বাদকৌমুদী’, ‘তিমিরনাশক’ প্রভৃতি সংবাদপত্রের ফাইলে এবং পূর্বোক্ত লেখকদের বইপত্রে পাওয়া যায়। এদের রচনা-ধারা লক্ষ্য করলে একটা জিনিস চোখে পড়ে। দেশী ইডিয়ম-সম্পন্ন সরল কথ্যভঙ্গি এবং দাঁত কিড়িমিড়ি-কবা অমুস্বাব-বিসর্গ-বর্জিত সংস্কৃত ভঙ্গি, অর্থাৎ ঘরোয়া বাংলা ও পণ্ডিতী বাংলা পাশাপাশি চলেছে। কেরীর ‘কথোপ-কথনে’ বা ‘সমাদানন্দপণ’ ও ‘সংবাদপ্রভাকর’ প্রভৃতিতে প্রকাশিত ‘প্রেমিত পত্র’গুলিতে কথ্যভঙ্গির এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের ‘প্রদোষচন্দ্রিকা’য়, রামরাম বসুর ‘প্রতাপাদিত্য-চরিতে’, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের ‘কৃষ্ণচন্দ্র-চরিতে’, এমন কি রামমোহন বায় ও দ্বৈত গুপ্তের প্রবন্ধে পণ্ডিতী বাংলার নিদর্শন পাওয়া যায়। দীর্ঘ দিন এই দুটি আদর্শ পরস্পর পাল্লা দিয়ে চলেছিল। ‘নববাবুবিলাস,’ ‘আলালের ঘরের দুলাল,’ ‘হতোম প্যাচার নক্সা,’ ‘কুলীনকুল-সর্কস্ব,’ ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’, এমন কি ‘সধবার একাদশী’ পর্যন্ত প্রথম এবং রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, তারশঙ্কর তর্করত্ন, মদনমোহন তর্কালংকার পর্যন্ত দ্বিতীয় ধারার সমমাত্রিক গতি লক্ষ্য করা যায়। বন্ধিমে এসে ছুইয়ে একটা আপোষ হয়।

রামমোহন মিশনারী তথা পণ্ডিতী বাংলার সরীসৃপ-দেহে একটি ঝজুতা ও দাট্য এনেছিলেন। দুক্লহ বৈদান্তিক তত্ত্বের আলোচনায় বা সতীদাহ-

নিবারণের প্রচারকার্যে রামমোহন যে বলিষ্ঠ গল্প ভাষা প্রবর্তন করেছিলেন, তা তাঁর নিজেরই সৃষ্টি। তাঁর সমসাময়িক ভাষা থেকে তিনি বিশেষ সাহায্য পান নি। তখনকার কোমর-ভাঙা গল্পে জীবনী-শক্তির অভাব ছিল এত বেশী যে, রামমোহনকে তাঁর প্রবর্তিত গল্প কেমন করে পড়তে হবে, তার নির্দেশ পর্যন্ত দিতে হয়েছিল।

## বিভাসাগর

কিন্তু রামমোহন শব্দ-শিল্পী ছিলেন না, যা ছিলেন বিভাসাগর। তাই বিভাসাগরই সর্বপ্রথম বাংলা রচনা-রীতিতে একটি শিল্পরূপ দিতে পারলেন। কিন্তু বিভাসাগরই হন বা রামমোহনই হন, বাংলা গল্পকে কেউ বোল-আনা প্রাণবন্ত করতে পারেন নি। বিভাসাগর ‘বিধবাবিবাহ-বিদায়ক প্রস্তাবে’ যেমন সহজ পৌরুষের এবং ‘কথামালায়’ যেমন অনলঙ্কৃত সারল্যের পরিচয় দিয়েছেন, ‘শকুন্তলা’য়, ‘সীতার বনবাসে’ তেমনি ধ্বনিমুখর শব্দ-সুখমার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু বাংলা ভাষার আসল প্রাণ যেখানে, তার ফ্রেজ, ইডিয়ম, নাম-ধাতু, বিভাসাগর তার সুযোগ না নিয়ে, তারই অতুল্য কবে সংস্কৃতমূলক শব্দপর্যায় তৈরী করে নিয়েছেন। এই যে আনুবাদিক পদ্ধতি, এর ফলেই বিভাসাগরী বাংলা ঠিক স্বতঃস্ফূর্ত হয়নি। তা অলঙ্কারাত্য, কিন্তু শ্লথগতি।

রামমোহন-মুহূর্ত্তের সমসাময়িক ভবানীচরণে এবং অল্প পূর্বের হতোমে যে গল্প-বাঁতি পাই, তা অনেক বেশী জীবন্ত। তাঁরা যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা তের বেশী স্বচ্ছ হচ্ছে এই জগ্রে যে, তাঁদের কোন ধার-করা রচনাভঙ্গির মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করতে হয়নি। ঘরোয়া শব্দ, দেশী ফ্রেজ-ইডিয়ম, খাস বাংলা ক্রিয়া ও ক্রিয়া-বিশেষণ ইত্যাদির সংযোজনায় তাঁদের বাংলা অনায়াসে মাথা খাড়া কবে দাঁড়াতে পেরেছে। একেবারে আজকের চলতি বাংলার পাশে ফেললেও, এঁদের, বিশেষ করে হতোমের ভাষা-ভঙ্গিটা খুব পুরানো মনে হয় না। অর্থাৎ হতোমী বাংলাটা আমাদের খুব কাছেই জিনিস এবং আমাদের আজকের বাংলায় তার বৈজ্ঞিক রক্ত বেশ টের পাওয়া যায়। কিন্তু পাদ্রী-আমল থেকে হতোমী আমলের গোড়া পর্যন্ত, ভাষা-গঠনই চলেছে, সাহিত্য-বস্তু বিশেষ কিছু জন্মায় নি।

সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করলেন বঙ্কিম। বঙ্কিমী বাংলায় বিভাসাগরী এবং হতোম-আলালী বাংলার মেল-বন্ধন হয়েছিল। তবে বঙ্কিমেরও ঝোঁক

ছিল পণ্ডিতী বাংলার দিকেই। তাঁর দলবর্তীদের মধ্যে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সবাই বঙ্কিমী আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং রচনা-রীতিতে বঙ্কিমের অনুগামী। এঁরা বাংলা গল্পকে স্মৃতিকা-গৃহ থেকে লোকালয়ে নিয়ে এলেন এবং কেবল মাত্র বেঁচে থাকার অক্ষমতা ঘুচিয়ে, তাকে রীতিমতো কেজো করে তুললেন। বাংলা গল্পের সত্যিকার ইতিহাস শুরু এখান থেকে।

শিক্ষা, সংস্কার ও প্রচারকার্যের জন্তে বাংলা ভাষায় প্রথম গল্প লেখা শুরু হয়, একথা আগেই বলেছি। দীর্ঘদিন বাংলা গল্প এই নিয়েই ছিল। পাদ্রী-আমলের বইয়ে বা সংবাদপত্রে জনসাধারণের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের প্রাথমিক চেষ্টা হয়েছিল এবং সে-চেষ্টা নানামুখী। কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির জন্তেও যে গল্প লেখা যেতে পারে, এ কথা সে যুগে কারুর মাথায় আসেনি। রামমোহন রায়ও সতীদাহ নিবারণ, ব্রাহ্মধর্ম-প্রচার, বৈদান্তিক তত্ত্ববিচার, বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ-রচনা ইত্যাদির জন্তেই গল্প লিখেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত ‘প্রভাকরে’ গল্পে সাহিত্য সমালোচনা করেছেন, কিন্তু নিজে সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি।

বাংলা গল্পই তখনো ভালো করে গড়ে ওঠেনি। কোন রকমে কষ্টে-স্বপ্নে বক্তব্য বিষয় পাঠকের গোচরে আনতেই তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। যে সহজ স্বচ্ছতায় সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভবপর, ভাষায় তা ছিল না বলেই অবশ্য সাহিত্য হয় নি। বিদ্যাসাগরে এবং অক্ষয় দত্তে এসে বাংলা গল্প একটা জাত পেল, কিন্তু শিক্ষা ও প্রচারের সাম্প্রতিক উদ্দেশ্য ছাড়িয়ে তখনো তা রসসৃষ্টির পথে পা বাড়াতে পারেনি। বিধবাবিবাহ-প্রচার, বহু বিবাহ-নিরোধ, ছাত্রপাঠ্য উপাখ্যান-রচনা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে বিদ্যাসাগর এবং প্রাণিবিজ্ঞান, সৌরবিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত আলোচনা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে অক্ষয় দত্ত বাংলা গল্পের প্রকাশ-ভঙ্গি ও ধারণা-শক্তি অনেকটা সাদলীল করে এনেছিলেন। কিন্তু বিষয়-নিরপেক্ষ তাবে রসাত্মক রচনা তাঁদের হাত দিয়েও হল না। বিদ্যাসাগরের ‘শকুন্তলা’, ‘সীতার বনবাস’, ‘ব্রাস্তি-বিলাস’ বা অক্ষয় দত্তের ‘বাহুবল্লভের সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার’, ‘ভারতীয় উপাসক-মস্রদায়’ তাই প্রকৃতপক্ষে পাঠ্যপুস্তকের এলাকার বাইরে পড়ত না।

কিন্তু এই অভিজ্ঞাত বাংলার পিছু ধরে, উপেক্ষা ও অবিশ্বাসের ভেতর দিয়ে অত্যন্ত ক্ষীণ জ্ঞাবে একটা সাহিত্য আদি থেকেই গড়ে উঠছিল। সমাচার পত্রিকায় ‘সত্য কাটুনির পত্র’ বা মাহেশের রথে তৎকালীন বাবুদের

‘বিলাসের বিবরণ’, বা এই জাতের আর যে সমস্ত টুকরো টুকরো লেখা ভখনকার পণ্ডিতেরা বাঁ হাত দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, তার ভেতরই বাংলা গল্পের প্রাথমিক সাহিত্যরূপ কতকটা পাওয়া যায়। এই রূপটা আলালে, হতোমে, নববাবুবিলাসে আরো খানিকটা স্পষ্টতা লাভ করল। বিদ্যাসাগর-চক্রের ‘কাদম্বরী,’ টেলিমেকস,’ ‘রামের রাজ্যাভিষেক,’ ‘রোমান্তী’ প্রভৃতি সংস্কৃতাহুগ কাহিনীর পাশে, এই ব্যঙ্গ-রচনাগুলোকে রেখে যদি তুলনা করা যায়, তাহলেই বোঝা যাবে এরা কত বেশী উজ্জ্বল! কিন্তু এদের রচয়িতারাও সম্ভবত এই জাতের লেখাকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখেননি। তাই হতোম-রচয়িতা কালী সিংহ নিজেই বিদ্যাসাগরী ভাষায় মহাভারত লিখেছেন।

### বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিম এসেও বাংলা গল্পের শিক্ষকতার রূপটাই রয়ে গেল মুখ্যভাবে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা সাহিত্যরূপও আস্তে আস্তে স্বীকৃত হল। বঙ্কিমের ‘কমলাকান্ত’, ‘লোকরহস্য’, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের ‘উদ্ভাস্ত প্রেম’, চন্দ্রনাথ বসুর ‘ত্রি-ধারা’, কালীপ্রসন্ন ঘোষের ‘নিহৃত চিন্তা’, ‘নিশীথচিন্তা’, অক্ষয় সরকারের ‘সনাতনী’, রাজনারায়ণ বসুর ‘সেকাল ও একাল’ বইগুলি এই সময় রচিত হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল লোকশিক্ষা নয়, জাতিগঠন নয়, সনাতনসংস্কার নয়, নিছক রস-পরিবেষণ।

অবশ্য প্রবন্ধ-সাহিত্য বলতে আজ আমরা যা বুঝি, এইসব বচনায় তার প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপিত হলেও, এরাও সর্পিঙ্গ-সম্পূর্ণ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত নয়। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের ‘সেই মুখখানি’ বা কালীপ্রসন্ন ঘোষের ‘ঐহিক অমরতা’ প্রভৃতি রচনা খেলো ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ। চন্দ্রনাথ বসুর ‘একটি পাখা’, ‘পল্লীবাসের সুখ-দুঃখ’ বা রাজনারায়ণ বসুর ‘সেকালের গুরু-মহাশয়’ বা ‘সাহেব-সুবার চিত্র’ এসবের চেয়ে বরং বেশী সুখপাঠ্য। অক্ষয় সরকারের ‘পিতাপুত্র’, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পালামো’ এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই-প্রবাস’ বইয়ের কথাও এই স্তরে উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি বই, বিশেষত সঞ্জীবচন্দ্রের ‘পালামো’ ত হাচ্চা রচনার আদর্শ বলেই গণ্য হতে পারে। বঙ্কিম-যুগের কোন লেখক, এমন কি স্বয়ং বঙ্কিমও লেখার ধারে এর কাছাকাছি যেঁতে পারেন কিনা সন্দেহ!

অর্থাৎ অনতিজাত ও জলানাচরগীয় রূপে যে সাহিত্য-ধারা গোড়ায় জন্ম

নিষেদ্ধি, সেই নববাবু, নববিবি, হতোম প্যাঁচাই কমলাকান্তে, মুচিরাম গুড়ে, লোক-রহস্তে বা সেকাল ও একালে রূপান্তর লাভ করেছে এবং এই আমলের গল্প সাহিত্যের যা আজো পড়ে উপভোগ করা যায়, তা কোন প্রয়োজনের বিষয় নিয়ে তৈরী হয়নি।

অবশ্য দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, পুরাণ, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি গুরু বিষয় নিয়ে বই-পত্র লিখেছেন ষাঁরা তাঁরা কেউ উপেক্ষার নন। দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির, রাজনীতি ও সমাজ-কল্যাণের দিক থেকে তাঁদের নাম অন্ধার সঙ্গেই অবশ্যই। কিন্তু বিপদ এই যে, এই সমস্ত জিনিসকে সাহিত্যের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয়।

বিষয় জিনিসটা হচ্ছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেহের মতো। দেহ বড় সন্দেহ নেই, কিন্তু যে প্রাণ-শক্তির জোবে এই দেহটা জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল, তাব অভাব হলে দেহের কতটুকু কদর থাকে? বচনার ক্ষেত্রেও বিষয়-বস্তু হচ্ছে জড় উপাদান মাত্র, সেই উপাদানকে জীবন্ত কবে ভঙ্গি। ভঙ্গিহীন বস্তুপুঞ্জ তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘরে সমানব পাষ, সাহিত্যেও প্রবহমান প্রাণ-ধারা থেকে তার যোগসূত্র যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে।

আমাদের দেশে গল্প বচনাব বাচল্য আছে, কিন্তু সাহিত্যধর্মী গল্পের অভাব। আদি থেকে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব পর্যন্ত, বাংলা ভাষায় বস্তুবই একাদিপত্র্য চলেছে। নৃত্যঙ্গণ বিভাসংকাব, রামবাম বসু, বার্জাবলোচন মুখোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পর্যন্ত যে গল্প লেখা হয়েছে, তাব কথা ছেড়েই দিই। বিভাসাগর, অক্ষয় দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রূপমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত এসে, বিষয় এবং ভাষার আভিজাত্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অস্ত্রের বেশ তখনো দূরে। বঙ্কিমের এবং তাঁর পারিষদবর্গের লেখাতেই প্রথম প্রাণের সুর শোনা গেল। কিন্তু ঠাঁরও মূলত বস্তুকেই দিয়েছেন প্রাণের, তাই অমসাহ্য বহু রচনাই তাঁদের পুরোপুরি সাহিত্য-পদবাচ্য হয়ে উঠতে পারে নি।

## রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা গল্পের শরীরে সর্বাদীর্ণ সাহিত্যিকতা প্রতিষ্ঠা করলেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, সাহিত্যের পক্ষে কি বলা হচ্ছে সেটা মূল্যবান হলেও, কেমন করে বলা হচ্ছে সেটা আরো মূল্যবান। অর্থাৎ সাহিত্যে ও



অ-সাহিত্যে যে তফাৎ, তা হল দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশ-রীতির তফাৎ। ববীন্দ্রনাথের ত বটেই, ববীন্দ্র-সমসাময়িক যে-কোন লেখকের লেখাতেই এই সাহিত্যিক কৌলীজ লক্ষ্য করা যায় এবং বলা বাহুল্য, তাব মূলে আছে ববীন্দ্রনাথেরই অনতিক্রমণীয় প্রভাব।

ববীন্দ্রনাথের গল্পগ্রন্থের সংখ্যাও যেমন অনেক, তাব বিষয় এবং রীতির বৈচিত্র্যও তেমনি অফুরন্ত। ‘ছিন্নপত্র’, ‘জীবনস্মৃতি’, ‘পঞ্চভূত’, ‘বিচিত্র প্রবন্ধ’, ‘প্রাচীন সাহিত্য’, ‘আধুনিক সাহিত্য’, ‘শিক্ষা’, ‘সমাজ’, ‘কালান্তর’, ‘শব্দতত্ত্ব’, ‘ছন্দ’, প্রভৃতি বইয়ে কত না নূতন-নূতন পথে তিনি বাংলা গল্পের ধারাকে প্রবাহিত করেছেন। সব স্তর জড়িয়ে বাংলা গল্পকে তিনি যা দিয়েছেন, কি বস্তব দিক থেকে, কি বিজ্ঞাসের দিক থেকে, বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এক ভাবে আব কোন লেখকের কাছেই বোধহয় তা পাওয়া যায় নি।

ববীন্দ্রনাথ তাঁব সুদীর্ঘ জীবনে এক এক কবে তিনটি পদস্পর্শবিধিষ্ট গল্পরীতি প্রবর্তন করেছেন। প্রথম ‘ভাবগী’ব যুগে, দ্বিতীয় ‘সামনা’ ও ‘বঙ্গদর্শন’ব যুগে, তৃতীয় ‘সবুজপত্র’ব যুগে। এই ত্রি-ধাবার কোন-না-কোনটাকে কেন্দ্র করেই এ পর্যন্ত বাংলা গল্পসাহিত্য আবর্তিত হয়েছে। অলংকারবহুল ক্যামিক্যার ভঙ্গি থেকে শুরু করে আটপোতা কথ্যভঙ্গি পর্যন্ত, যত বকমের মাইল বাংলায় আনা যেত পারে, ববীন্দ্রনাথই তাব চূড়ান্ত পরীক্ষা করেছেন। ববীন্দ্র-সমসাময়িকদের অনেকে এবং ববীন্দ্রোত্তর কালের সকলেই এই পুঁজি ভাঙিয়ে যশস্বী হয়েছেন।

ববীন্দ্র-পূর্ববর্তী গল্পরচনার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়েছি যে, তাতে শিক্ষা ও সংস্কারের উদ্দেশ্যকে বসন্থিবে চেয়ে বড় বলে স্বাবাব করা হত। শৈশবাবস্থায় সাহিত্যের পক্ষে এটা হয়ত অপ্রত্যাশিত নয়। ববীন্দ্রনাথের আমবা প্রথম বাংলা গল্পের সেই বাল্যাবস্থা প্রতিরূপ করে, তাব পূর্ণ যৌবনের শস্তসমৃদ্ধ অজস্রতাব মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। এখন থেকে যা আমাদের গল্প, তাব একটা মাপকাঠি নির্ণয় সহজ। কাবণ যে-কোন চলনসই লেখকের লেখাও এবপব থেকে একটা বিশেষ স্তরের নীচে নামে না, তাখাব ধারণা-শক্তি ও প্রকাশ-ভঙ্গি এমনি একটা উন্নত মান ববীন্দ্রনাথের হাত দিয়ে বঁধা হয়ে গেছে।

ববীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে শক্তিমান গল্পলেখক অনেকেই ছিলেন। তাঁদের রচনার বৈশিষ্ট্যও নিতান্ত কম নয়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বাখালদাস

বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ্র, নিখিলনাথ রায় প্রভৃতির ঐতিহাসিক রচনা, রামেন্দুসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক রচনা, বিবেকানন্দের ধর্ম ও সংস্কৃতি-বিষয়ক রচনা, প্রিয়নাথ সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতির সাহিত্য-সম্বন্ধীয় আলোচনা, জলধর সেনের ভ্রমণকাহিনী, দীনেন্দ্রকুমার রায়, যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রভৃতির রেখা-চিত্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। এই সমস্ত রচনায় কোন-না-কোন আকারে রবীন্দ্রনাথের রচনাতন্ত্রই প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, এ অবশ্য না বললেও চলে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্য তাঁর গল্প সাহিত্যকে অনেকটা আড়াল করে ফেলেছে। এমন কি, অনেকে তাঁকে খুব বিশিষ্ট শ্রেণীর গল্পলেখক বলে জানেনও না। কিন্তু গল্প, উপহাস, স্মৃতিকথা, লঘু রচনা, তত্ত্ববিচার, সর্ব শ্রেণীর রচনায় সমান সিদ্ধহস্ত রবীন্দ্রনাথ একাই বাংলা গল্পকে একশো বছরের পথ এগিয়ে দিয়েছেন, পরবর্তীদের ভেঁজে আরো এগিয়ে যাবার পুঞ্জি রেখে গেছেন, এটা মনে রাখতে হবে।

## প্রমথ চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলায় আর একমাত্র লেখক হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী, যিনি বাংলা গল্পকে নূতন পথে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন এবং পরবর্তী হয়েও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ওপর সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন। আমরা এর আগে বাংলা কথ্যভঙ্গির সঙ্গে বিদ্যাসাগরী ও বঙ্কিমী স্টাইলের তুলনা করে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, বাংলা ভাষার সত্যিকার প্রাণ নিবদ্ধ আছে প্রথমোক্ত পর্বেই। প্রমথ চৌধুরী এটা অস্বত্ব করলেন এবং নূতন করে তিনিই বাংলা গল্প-ধারাকে আবার হতোমী ধারার সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলেন। বাংলা গল্প এতদিনে তার স্বাভাবিক শক্তি-কেন্দ্রের সন্ধান পেল এবং কৃত্রিম ভাষার অবরোধ ভেঙে অবাধ মুক্তির পথে পা বাড়াল। আজকের বাংলা গল্প চলছে এই পথেই। হতোম ও বীরবলের সময়ের মাঝখানে যে স্তব্ধ গল্প সাহিত্যের পর্যায়টি রয়ে গেছে, তার মূল্য আজ যতটা ঐতিহাসিক, ততটা সাহিত্যিক নয়, একথা নিরপেক্ষ মানুষকে মানতে হবে। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী যতটা শক্তিতে ভাষা সংস্কার করেছেন, ততটা শক্তিতে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন

নি। তবে ছোটো বড় কাজ তিনি করেছেন, বাংলা গল্পকে হালকা পায়ে চলবার প্রেরণা দিয়েছেন, আর রবীন্দ্র-সাহিত্যের নৈব্যক্তিকতার স্থানে ব্যক্তিকতার প্রবর্তন করেছেন। এর পর ব্যক্তিক রচনা (Personal Essay) জন্মানো শুধু স্বাভাবিক নয়, সর্বতোভাবে উচিত।

এই প্রসঙ্গে একটা ছুঁথের কথা অনেকের মনে হবে। রবীন্দ্র-সমসাময়িক বাঙালী পণ্ডিতরা অনেকে ইংরেজী লেখায় যত মন দিয়েছেন, বাংলায় তা দেননি। বিশ্বের পণ্ডিত সমাজে বাঙালীর বিজ্ঞা ও বৈদম্ব্য প্রতিষ্ঠিত করার ভাষে ইংরেজীর মতো একটা সার্বজাতিক ভাষার আশ্রয় নেওয়া হয়ত দরকার এবং সে দিক থেকে তাঁরা অত্যাশঙ্কিত কিছু করেন নি। কিন্তু দেশের ভিজ্ঞান দৃষ্টির ওপর অপরিচয়ের পর্দা টেনে দেওয়া ও তাঁদের পক্ষে সমীচীন হয় নি। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জগদীশচন্দ্র বসুর 'Response of the Living and the Non-living', প্রফুল্লচন্দ্রের 'History of Hindu Chemistry' বা 'Life of an Indian Chemist' মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হীরলাল হালদার, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যতুনাথ সরকার, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার, মহেন্দ্রনাথ সরকার, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, গিরীন্দ্রশেখর বসু, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ সেন, এ কালের বাঙালী পণ্ডিতদের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সর্ববিষয়ক রচনাই আজো ইংরেজী ভাষার কাবাগারে আটক রয়েছে। ইংরেজী-না-জানা দেশবাসী এঁদের নামই শুনেছেন, কিন্তু বিজ্ঞান নাগাল পান নি।

অবশ্য বিবেকানন্দের সমস্ত এবং অরবিন্দেব কিছু রচনার বাংলা অনূবাদ হয়েছে। এঁদের মধ্যে বিবেকানন্দ বাংলায় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', জগদীশচন্দ্র 'অব্যাক্ত' এবং অরবিন্দ 'কারাকাহিনী' ও 'গীতার ভূমিকা' লিখে বিশেষ ভাবেই প্রমাণ করেছেন যে, বাংলা লেখার ক্ষমতা তাঁদের কম ছিল না। বিপিনচন্দ্র কিন্তু প্রচুর বাংলাও লিখেছেন এবং বাংলা ভাষার একজন বিশিষ্ট গল্প লেখক বলে তাঁর প্রতিষ্ঠাও আছে। 'চরিত্রকথা', 'জেলের খাতা', 'সত্যমিথ্যা' প্রভৃতি অযত্নলিখিত কয়েকখানি বইয়ে এবং অসংখ্য অসংগৃহীত প্রবন্ধে তাঁর মনীষা, চিন্তাশীলতা ও লিপি-চাতুর্যের যে পরিচয় পাই, তাতে একথা

অসঙ্কোচেই বলতে পারি যে, সাহিত্যসেবায় অধিকতর মনোনিবেশ না করে দেশকে তিনি বঞ্চিতই করেছেন।

পরবর্তীদের মধ্যে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের ‘দারিদ্রের ক্রন্দন’, ‘বাঙালী ও বাংলা’, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ‘দার্শনিকী’, ‘রবিদীপিতা’, গিরীন্দ্রশেখর বসুর ‘স্বপ্ন’, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা’, ‘জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য’, মহেন্দ্রনাথ সরকারের ‘উপনিষদের আলো’ প্রভৃতি বই এবং সাময়িক পত্রে প্রকাশিত মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়া আধুনিক পণ্ডিতদের বাংলা রচনার কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন চোখে পড়ে না। একমাত্র বিনয়কুমার সরকার বাংলা লেখাকে কোনদিন উপেক্ষা করেন নি। ‘ভাবী সমাজের ভিত্তি’, ‘নয়া বাংলার গোড়াপত্তম’, ‘বাড়তির পথে বাঙালী’, ‘রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতের বাণী’ প্রভৃতি বইয়ে তিনি বহু প্রয়োজনীয় তথ্য বাঙালী পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন তাঁর চিন্তাশীলতা ও স্বাভাৱ্যবোধের নিদর্শন হিসাবে।

অবশ্য এই সমস্ত রচনার বেশির ভাগই সাহিত্যের সামান্য বাইরে। কিন্তু সাহিত্যের প্রাণ-শক্তি, তাব চিন্তা-সম্পদ ও প্রকাশ-ভঙ্গি পরিপূর্ণ লাভ করে তার পেছনে বৈদ্যের একটি বলিষ্ঠ পটভূমি থাকলেই, যা না থাকায় বাংলা গল্প আজো ফরাসী বা ইংবেজার মতো শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে সমর্থ হয় নি। বাংলা ভাষায় যে আজো দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সাহিত্য, শিল্পতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা করার উপযোগী ধারণা-শক্তি ও পরিতামা জন্মায় নি, তার কারণ কি এই নয় যে, ভাষার সমুদ্রতটে আমরা বিশেষ মন দিই নি? স্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শশাঙ্কমোহন সেন, হীবেন্দ্রনাথ দত্ত, দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রভৃতির পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ এই ভাষায় লেখা সম্ভব হয়েছে, এতেই কি প্রমাণ হয় না যে, বাংলা ভাষাও ইংরেজী বা ফরাসীর মতোই শক্তিমান হতে পারে?

## আধুনিক গল্পলেখকরা

প্রথম চৌধুরীর পরে বা সঙ্গে আর যারা গল্প লিখে খ্যাত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, মোহিতলাল মজুমদার, সুরেশ চক্রবর্তী, দিলীপকুমার রায়, ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম দেশে সুপরিচিত। এঁদের মধ্যে অতুল গুপ্তের রচনা-ভঙ্গি বেশ

প্রসন্ন, ‘কাব্যজিজ্ঞাসা’র মতো তাত্ত্বিক বইও সেই জন্তে তাঁর হাতে এতখানি সরস হয়েছে। নলিনীকান্তের লেখায় পারিভাসিক ছন্দহতার সঙ্গে পাণ্ডিত্যের বনবটা মিশে, তাতে বেশ একটু কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়েছে। ‘সাহিত্যিকা’ বই সেই জন্তে অচিন্তাপূর্ণ হবেও অস্থপাঠ্য হয় নি। সুরেশ চক্রবর্তীর লেখায় ঝাল-মুনের পরিমাণ বেশী, প্যাঁচোষা উক্তি ও শব্দ-ক্রোড়ার কলাকৌশলে তিনি ছবছ প্রমথ চৌধুরীর শিষ্য। তাঁর ‘হসন্তের পত্র’ সত্যিই খুব মনোজ্ঞ রচনা। ধূর্জটিপ্রসাদ অশুভিত এবং তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিধিও ব্যাপক, কিন্তু ভাষা তাঁর হাতে যেন কেমন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। তাঁর চিন্তায় ঠিক সেই জাতের ক্রনামুবন্ধও পাওয়া যায় না, যা সুরচনার পক্ষে অপরিহার্য। তাঁর ‘চিহ্নমসি’, ‘আমরা ও তাঁহারা’ ইত্যাদি বইয়ের এক সময় অবশ্য সুনাম ছিল। দিলীপকুমারের ভাষা মিষ্টি, তাঁর দৃষ্টি এবং মননশক্তিও গভীর। কতকগুলি বাস্তবিক এবং মুদ্রাবোষ থাকলেও তিনি নিঃসন্দেহে একজন উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধকাব। তাঁর ‘গীর্ধকব’ বইকে ইংল্যান্ড ম্যানিন বা লিটন যুগ্মাচারী এই জাতের লেখার সঙ্গে অনায়াসে এক পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। তাঁর ‘আমায়ামণ’ও চমৎকাব স্মৃতিচিত্র।

আধুনিক দলেব নামী লেখক দাঁবা, তাঁরা সবাই গল্প-উপন্যাস, নবত কবিতা লিখেছেন, প্রবন্ধ প্রায় কেউই লেখেন নি। যা মুষ্টিমেয় প্রবন্ধ এই সময়েব ভেতর লেখা হয়েছে, তাব ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত। বলা বাহুল্য, এখানে নিছক সাহিত্যিক প্রবন্ধের কথাই বলা হচ্ছে। অন্নদাশঙ্কর বাবেব ‘পথে প্রবাসে’, ‘তারুণ্য’, বুদ্ধদেব বসুব ‘হঠাৎ আলোব ঝলকানি’, প্রবোধকুমার সান্তালোব ‘অরণ্যপথ’, ‘মহাপ্রস্থানের পথে’ ছাড়া সত্যি জাতের প্রবন্ধ আর বিশেষ কিছু নেই। এঁরা সকলেই, বিশেষ কবে প্রথম তিন জন কথাসাহিত্য বচনা করে অধিকতর খ্যাতিমান হয়েছেন। যদিও বাস্তবিক অমুভূতি ও চিন্তার, দর্শন ও অতিজ্ঞতার সঞ্চয় ভাঙিয়ে হাক্কা হাতে লেখা প্রবন্ধেই এঁদের লিখন-শক্তির পূর্ণতর বিকাশ হয়েছে। শিবরাম চক্রবর্তীর ‘আজ ও আগামী কাল’, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়ের ‘মেজদার ডায়েরী’, মহেন্দ্র রাঘেব মেটাবলিঙ্ক সঞ্চকীয় রচনাবলা বা ‘কিশলয়’ এবং মজতুব আলীব ‘দেশে-বিদেশে’ও আধুনিক প্রবন্ধ সাহিত্যে সম্মানের আসন পাবার যোগ্য।

বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, যোগেশ রায় বিজ্ঞানিধি, অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীলকুমার দে, অরোধচন্দ্র সেনগুপ্ত,

সুকুমার সেন, নীহাররঞ্জন রায়, অশোভন সরকার, প্রমথনাথ বিশী, শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রমুখ অধ্যাপকেরা ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্পতত্ত্ব ও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান বই লিখেছেন। বিশুদ্ধ সাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত নয় বলে তাব আলোচনা এখানে করা হল না। জবাসন্ধ, যাযাবর, ইন্দ্রজিৎ, নীলকণ্ঠ, কালপেঁচা, রঞ্জন, রূপদর্শী প্রকৃতির ছদ্মনামে যে সমস্ত লঘু নিবন্ধ বা রম্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে, সুখপাঠ্য হলেও তা প্রধানত সাময়িক রচনা। সার্থক ও সময়োচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি করে যশস্বী হবেন এঁরা, এ আশাই করেন সবাই।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### সাময়িক পত্র

পুষ্টান পাদ্রীদের উত্থোগে বাংলা ভাষায় প্রথম গল্প লেখা শুরু হয়েছিল, একথা আমরা আগেই বলেছি। পাদ্রীরা চেয়েছিলেন দেশের লোককে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে উন্নত করে নিয়ে, তাঁদের খৃষ্টধর্মের প্রতি আকর্ষণ করতে। কিন্তু দেশের চিন্তাধারা এ থেকে আপন মুক্তির পথ খুঁজে পেল। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম সাময়িক পত্র ‘সমাচারদপণ’ের আদর্শেই রামমোহন রায়, দৈন্যর গুপ্ত, বিজ্ঞাসাগর, দেবেন্দ্র ঠাকুর প্রমুখ নেতারা পরে সাময়িক পত্রের তেভর দিয়ে এক দিকে সমাজ ও ধর্মসংস্কারে, অত্র দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারে অগ্রপ্রাণিত হয়েছিলেন।

আমাদের এই পূর্বানো সমাজ ও ধর্মে যুগার্জিত যে সমস্ত কুসংস্কার ও কদাচার জমেছিল, তা দূর করায় এবং বাংলা গল্পকে আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের উপযোগী করে গড়ে তোলায়, ‘সম্বাদকৌমুদী’, ‘প্রভাকর’, ‘তত্ত্ববোধিনী’ প্রভৃতি যে কাজ করেছে তা অসামান্য। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শনে’ এক সঙ্গে এল সাহিত্য এবং স্বাদেশিকতা। এই সময় থেকেই সাহিত্যপত্র এবং সংবাদপত্র আলাদা হয়ে গেল, গোড়াতে যা ছিল এক। বঙ্কিম-সমসাময়িক ও পরবর্তী সাহিত্য-পত্রিকার মধ্যে ‘বাকুব’, ‘আর্যদর্শন’, ‘সাহিত্য’, ‘ভারতী’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আর সংবাদপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘সোমপ্রকাশ’, ‘বঙ্গবাদী’, ‘হিতবাদী’, ‘সঞ্জীবনী’, ‘বঙ্গমতী’।

স্বদেশী আন্দোলন এবং পরে গান্ধী-আন্দোলন থেকে এদেশে রাজনৈতিক সাংবাদিকতা সবিশেষ পুষ্টি লাভ করে, আর তার ফলেই সংবাদপত্র লাভজনক ব্যবসা হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্ব-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ বাতীর সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-পত্রিকারও উন্নতি হতে থাকে। ‘প্রবাসী’, ‘সবুজপত্র’, ‘কল্লোল’, সেই উন্নতির একদিকের উদাহরণ, আর একদিকের উদাহরণ ‘আনন্দবাজার’, ‘বঙ্গবাদী’, ‘যুগান্তর’। এখনো পর্যন্ত আমরা মোটের ওপর এই আবহাওয়ার মধ্যেই রয়েছি।

## সমাচারদর্পণ

বাংলা গল্প সাহিত্যের আলোচনা আমরা শেষ করেছি। এই আলোচনা থেকে একটা প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে রাখা হয়েছিল, পৃথক ভাবে আলোচনা করবার জন্তে। সে প্রসঙ্গটি হল বাংলা গল্পের উৎপত্তি ও ক্রম-পরিণতির মূলে বাংলা সাময়িক পত্রের দানের কথা। গোড়াতেই দেখিয়েছি যে, বাংলা গল্পের জন্ম শ্রীরামপুরের পাঞ্জীদের হাতে এবং ‘সমাচারদর্পণ’ হল বাংলা সাময়িক পত্রের প্রথম অরণীয় নিদর্শন। এই আদি পত্রিকা থেকে একেবারে আজ পর্যন্ত, প্রধানত সাময়িক পত্রের অয়নকে কেন্দ্র করেই বাংলা গল্প নানা রূপান্তরের ভেতর দিয়ে তার আধুনিক উন্নত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এর পেছনে পৃথক পৃথক ভাবে নানা প্রতিভাধর লেখকের একক দান আছে ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী রয়েছে সাময়িক পত্রের ছোট-বড় ভালো-মন্দ অঙ্গশ্র লেখকের সম্মিলিত দান।

উল্লেখযোগ্য বাংলা সাময়িক পত্রগুলির প্রত্যেকটিই কোন-না-কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সম্পাদনায় বের হত। সাহিত্যের ইতিহাসে এই সমস্ত সম্পাদক-সাহিত্যিক অনেকে সম্মানের আসন লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রতিভা বেঁধে রাখা করে ছোট-বড়-মাকারি আর যে সমস্ত লেখক উঠেছেন, তাঁদের পৃথক কোন স্বীকৃতির দাবী না থাকলেও সমগ্র ভাবে তাঁদের দানও উপেক্ষার নয়। প্রতিভাধর এক-এক যুগে একটি-দুটির বেশি জন্মান না। তাঁরা আদ্যে নূতনের বার্তা নিয়ে, যা পুরানো, যা প্রাত্যহিক, যা অভ্যাসমলিন, তার বিরুদ্ধে নিদ্রোহের বাণী নিয়ে। কাজেই প্রচলিত সমাজ হঠাৎ তাঁদের চিনতে পারে না, সহ্য করতেও পারে না। তখন তাঁদের আশে পাশে সাধারণ লেখক ধারা জড়ো হন, তাঁরাই নূতন যুগের বাণীকে সাধারণ্যে প্রচার করে যুগের সঙ্গে জন-মনের সংযোগ ঘটিয়ে থাকেন। এক যুগ থেকে আর এক যুগে, ভাবে, কর্ণে, দৃষ্টিতে মানুষের যে স্বাভাবিক বিবর্তন, তার বীজ থাকে ভাব-নাশকদের চিন্তায়, কিন্তু বিস্তার নির্ভর করে সাধারণ কর্মীদের কৃতিত্বের ওপর। আর সব ক্ষেত্রের মতো সাহিত্যক্ষেত্রেও এই নিয়ম। কিন্তু সময় চলে যাবার পর প্রতিভাই বাঁচে, তার প্রচারকরা যান লুপ্ত হয়ে। পুরাতন সাময়িক পত্রের ফাইল খাঁটলেই তাঁদের অনেকের দেখা মেলে।

আগেই বলা হয়েছে, ইংরেজ আমলে দেশের লোককে পাশ্চাত্য জ্ঞান-



বিজ্ঞানে ওয়াকিবহাল এবং পাশ্চাত্য চিন্তা-ধারায় অনুপ্রাণিত করে, অজ্ঞাতসারে ঋগ্বেদধর্মের প্রতি আকৃষ্ট কবাব জতোই এ দেশে পাদ্রী-পণ্ডিতরা কলেজ বসিয়ে-ছিলেন, সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন, বাংলা বই-পুঁথি লিখিয়েছিলেন। ঋগ্বেদধর্মের দেশে আশাহুরূপ বাড়ে নি। কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এ দেশের সংস্কৃতি নাড়া পেয়ে জেগে উঠেছিল। আমাদের সংস্কৃতি তখন ক্ষয়ের মুখে, দেশে তখন জমা হয়েছে ঘোরতর অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের কালো মেঘ। সেই অনশ্চেতনামূলক নিস্তরঙ্গ আবহাওয়া ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ধাক্কা ঘুলিয়ে উঠল।

দেশবাসী একটানা জীবনযাপনের পথে টক্কর খেয়ে জেগে উঠে দেখলেন, সময় এগিয়েছে, তার সঙ্গে তাল বেখে তাঁবা এগোন নি। তখন সুর হ'ল পুরানোকে ভাঙা এবং নূতন করে তাকে গড়ে নেওয়া। সতীদাহ-নিবারণ, বহুবিবাহ-নিবারণ, বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন, স্ত্রী শিক্ষা-প্রচার, দু-পাতা মুদ্রাবোধ, দু-কলি তাফেজের বয়েত আর রঘুব ছুটি শ্লোক মুখস্থ কবা ছেড়ে, দেশ-বিদেশের দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাস-মহন। অর্থাৎ এক কথায় যাকে বলা যাবে আধুনিকতা, তাব সূচনা হল। শ্রীরামপুরের পাদ্রীবা, হিন্দু কলেজের স্থাপয়িতারা, ব্রাহ্ম-সমাজের উদ্বোধকরা, সকলেই এদিক থেকে শরীর সঙ্গে স্রবণীয়।

যে সমস্ত নাম এই প্রসঙ্গে সকলেব আগে মনে পড়ে, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, আজকের বাঙালী সংস্কৃতি তাঁদের সকলেব কাছেই অশেষ ঋণী। তাঁবা ও তাঁদের অগণ্য সহযোগীরা সেদিন দেশকে নবজীবনের সন্ধান দিয়েছিলেন। শুধু যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির হাওয়াই তাঁবা দেশে বয়ে এনেছিলেন, বহিঃপৃথিবীর বিস্তৃত আকাশে দেশের বিমূঢ় দৃষ্টিকে অব্যাহত করে দিয়েছিলেন, তা নয়। দেশের যা ভালো, যা সত্য, যা মহৎ, তাকেও সমন্বিত আদর্শে সম্মিলিত এবং সংস্কৃত করে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

সতীদাহ-নিবারণে রামমোহন এবং বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনে বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজ নীতির মহত্তর আদর্শই অনুসরণ করেছিলেন। বৈষ্ণবতার নামে কিশোরীভজন, তান্ত্রিকতার নামে বামাচার, পশুবলি, মত্গপান এবং ধর্ষাচরণের নামে আরো বিবিধ যথেষ্টাচার তাড়িয়ে এবং পরব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্তন করে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সেন হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠিত

করেছিলেন। সমাজ ও ধর্মে এই যে নানামুখী সংস্কার, এর অনেকটাই সম্ভবপর হয়েছিল সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে।

## সম্বাদকোমুদী ও প্রভাকর

পাদ্রী-পণ্ডিতদের কাগজের উল্লেখ আগেই করেছি। এর পর উল্লেখযোগ্য রামমোহনের ‘সম্বাদকোমুদী’, দীক্ষরঙের ‘সংবাদপ্রভাকর’ এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘তত্ত্ববোধিনী’। ‘সমাচারদর্পণ’, ‘সম্বাদকোমুদী’ এবং ‘প্রভাকর’ ছিল একাধারে সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্র। সমসাময়িক সংবাদে সঙ্গেই এগুলিতে ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং শিক্ষা-সম্বন্ধীয় নানা প্রবন্ধ বের হত। তাছাড়া অনেক সুখপাঠ্য ও কৌতুকপ্রদ পত্র এবং শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও সামাজিক ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে নানা জনের আলাপ-আলোচনা, বিচার-বিতর্ক ইত্যাদি থাকত। সম্বাদকোমুদীতে আবার খুগোল, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, এমন কি ব্যাকরণ-বিষয়ক প্রবন্ধও থাকত এবং তার বেশির ভাগ লিখতেন স্বয়ং রামমোহন। তত্ত্ববোধিনী ছিল খাঁটি জাতের সাহিত্যপত্রিকা, আর অক্ষয় দত্ত ছিলেন এর সম্পাদক। এতে অক্ষয় দত্তের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বিদ্যাসাগরের মহাত্ম্য-অমুবাদ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেদান্তধর্ম-ব্যাখ্যান, অযোধ্যানাথ পাকড়াণীর বক্তৃতা, বহু উল্লেখযোগ্য বচন বের হত।

স্কুল-কলেজে মুষ্টিমেয় শহুরে লোক শিক্ষা পেতেন, কিন্তু দেশের জন-মনে নব সংস্কৃতির প্রভাব সঞ্চারিত করায় এই কাগজগুলিই সেদিন করেছিল সব চেয়ে বেশী সহায়তা। তখন গল্পের অবস্থাই বা কি ছিল? কোন রকমে কষ্টে-শ্রুটে বক্তব্য বিষয় পাঠকের গোচরে আনতেই তাব প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠত। তাবার সেই শৈশব অবস্থাতেই এদেশের সাময়িক পত্র যে সব গুরু বিষয় নিয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তা তাবলে অস্বাভাবিক হতে হয়।

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদ-প্রচার, বিপুল বৈদান্তিক আদর্শে ধর্মসংস্কার, স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা ও নারীর উত্তরাধিকার-প্রাপ্ততা, মার্ত পণ্ডিতদের বিধি-বিধান খণ্ডন করে বিধবা দহন নিষেধ এবং তার পুনর্বিবাহ-প্রবর্তন, বাংলা বর্ণমালার উচ্ছেদ করে তার স্থানে রোমান লিপি চলিত করার আবশ্যকতা, এক কথায় আজকের সংবাদপত্রের আলোচনীয় যাবতীয় বিষয়ই সেদিন লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তাঁরা সে সমস্ত বিষয় নিয়ে তাঁদের মতো করে বিচার-বিশ্লেষণও করেছিলেন। এই সঙ্গে দেশ-

বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধ্যান-ধারণাকে বতর্টা সম্ভব দেশের মাটিতে পল্লনও করেছিলেন তাঁরা। কতক অসুবাদ করেছিলেন, কতক বা অসুসরণ করে লিখেছিলেন। এই সমস্ত রচনার কিছু অংশ পরে বই আকারে গ্রথিত হয়েছে, কিন্তু বেশির ভাগই গেছে লুপ্ত হয়ে। ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’ বইয়ে এই সব লেখার কিছু কিছু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে।

আগেই বলেছি যে, এই সব পত্রিকা একাদ্বারের সংবাদপত্র এবং সাহিত্য-পত্র ছিল। সেই জন্মে সমসাময়িক ব্যক্তিদের কার্য-কলাপ সম্বন্ধে এগুলিতে সময় সময় অতি তীব্র সমালোচনা বের হত। সে সমালোচনা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধরত কদর্য আক্রমণের রূপ। রামমোহন রায়ের বিলাতযাত্রা অথবা তাঁর মুসলমানী-বিবাহ নিয়ে যে সমস্ত উত্তোর কাটাকাটি হয়েছিল, তা পড়লে আজ গা বমিবমি করে। বিধবাবিবাহ নিয়ে যে সমস্ত খিস্তি-খেউড় চলেছিল তা-ও সমান জঘন্য! গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যির ‘রসরাজে’ আর ঈশ্বর গুপ্তের ‘প্রভাকরে’ যে সমস্ত বাদ-বিবাদ চলত, তার সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসুর মন্তব্য প্রাধান্য-যোগ্য। তিনি বলেছেন, দুটি মেথরে যদি রাজপথে ঝগড়া বাধে এবং সেই ঝগড়ার মুখে তারা পরস্পরের পায়ে যদি স্ব স্ব হাঁড়ির দিঠা নিক্ষেপ করে, তাহলে যা হয়, এদের ঝগড়া হত সেই রকম। দুঃখের বিষয়, সাময়িক পত্রিকার জগতে এই মেথরামি আজো কিছুটা আছে।

## সাহিত্যপত্র

দ্বিতীয় পর্বে যে সব সাময়িক পত্র উল্লেখযোগ্য, তার মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ‘বিবিস্বার্থসংগ্রহ’, টেকচাঁদেব (প্যাবীচাঁদ মিত্রের) ‘মাসিক পত্র’, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘এডুকেশন গেজেট’, বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের ‘সোমপ্রকাশ’, স্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ভারতী’, অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ‘সাধারণী’, কালীপ্রসন্ন ঘোষের ‘বান্ধব’ ইত্যাদির নাম অনেক জানেন। এর ভেতর এডুকেশন গেজেট এবং সোমপ্রকাশ ছাড়া আর সবগুলিই মাসিকপত্র এবং সবগুলিই পুরোপুরি সাহিত্যপত্র। সাংবাদিকতা আর সাহিত্যিকতা এই সময় থেকে ছোটো আলাদা জাতের জিনিস বলে গণ্য হয়ে আসছে।

বিগত শতাব্দীর ইতিহাস হল বাংলা দেশের পক্ষে সুদীর্ঘ একটা সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাস। যে সমস্ত সংস্কার আধুনিক বাংলাকে প্রাচীন বাংলা থেকে

স্বতন্ত্র করেছে এবং এ যুগের ইতিহাসকে তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে অভিষিক্ত করেছে, তাদের জন্ম বিগত শতাব্দীতেই। মধ্যযুগীয় বাংলায় বিবিধ অভ্যাসের দৌরাত্ম্য কি প্রবল ছিল এবং তা থেকে মুক্ত করে দেশকে আধুনিকতার পথে আনতে বিগত শতাব্দীর সংস্কারকদের কি কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। যুগোচিত সংস্কার দেশের মর্মস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে সেদিন তাঁদের সাময়িক পত্র ছাড়া অথ কোন সহায়ক ছিল না। দেশের আবহাওয়ায় নূতন যুগের বাণী পৌঁছে দেওয়া ও পুরাতনের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে চেতনা সঞ্চার করার কাজে বিভিন্ন সাময়িকপত্র যা করেছে, তার পরিচয় আগেই দিয়েছি। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এক দিকে যেমন সামাজিক ও নৈতিক জীবনকে এই ভাবে ঢেলে সাজা চলেছে, অতীতকে তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা জ্ঞাতব্য তথ্য বাংলা ভাষায় পরিবেশন করে দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে আধুনিকতার সন্ধানও দেওয়া হয়েছে।

### তত্ত্ববোধিনী ও বিবিধার্থসংগ্রহ

ঈশ্বর গুপ্তের ‘সংবাদপ্রভাকর’ আর একটা বড় কাজ করেছে। পুরাতন কবিদের কবিতা এবং জীবন-রস্তুস্ত এতে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হত, আবার নবীন লেখকদের উৎসাহ দেওয়ার জন্তে তাঁদের রচনাসমূহও মুদ্রিত হত। পরবর্তী কালের বড় লেখক ঈশ্বর, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ অধিকারী, সকলেরই হাতে-খড়ি ‘প্রভাকরে’। ‘তত্ত্ববোধিনী’তে যেমন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর প্রমুখ পণ্ডিতদের হাত দিয়ে দেশে বিস্তৃত প্রজ্ঞার আবহাওয়া তৈরী হচ্ছিল, ‘প্রভাকরে’র লেখকদের হাত দিয়ে তেমনি তৈরী হচ্ছিল ভারী সাহিত্যের আবহাওয়া। রাজেন্দ্রলাল মিশ্রের ‘বিবিধার্থসংগ্রহে’ সাহিত্য এবং সংস্কৃতির রূপ অধিকতর স্পষ্টতা লাভ করল। বলে রাখা দরকার যে, বিবিধার্থ-ই বাংলা ভাষায় প্রথম সাহিত্য-সমালোচনা প্রবর্তন করেছিল। সুপণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল সাহিত্য, ইতিহাস এবং পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে একাই বহু প্রবন্ধ লিখতেন এতে। এর অত্যন্তম লেখক ছিলেন মাইকেল মধুসূদন। তাঁর ‘তিলোত্তমা-সম্ভব’ এতে বেরিয়েছিল।

## বঙ্গদর্শন

এব পর বঙ্কিমের ‘বঙ্গদর্শন’। বঙ্গদর্শনেই বাংলা সাহিত্য তাব পূর্ণ বয়সে এসে পৌঁছল। বাংলা গণতন্ত্র প্রাথমিক অবস্থায় সমাজ ও ধর্ম-সংস্কার এবং সংস্কৃতি-বিস্তারের ত্রুত পালন করিতে পূর্ববর্তী পত্রিকাগুলিকে প্রচুর মেহনত করিতে হইয়াছিল। ভাষার অপূর্ণতাই অবশ্য এই মেহনতের প্রধান কাবণ। কিন্তু তাঁদের সম্মিলিত সাধনা ব্যর্থ হয় নি, তাঁদের তৈরী বাস্তা দিয়েই বঙ্গদর্শনের বাজবথ সবেগে বয়ে চলেছে। বিদগ্ধ জাতির সাহিত্য-সৃষ্টিব এবং উন্নততর সংস্কৃতি-বিস্তরণের কাজে বঙ্কিমের যে কৃতিত্ব, তাব মূলে আছে এঁদের এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা। বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে হেনচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবি এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সবকায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গণ্ডলগক দেখা দিয়েছিলেন, এ-ও তাক্ষ একটি দৌভাগ্য। বঙ্গদর্শন থেকেই দেশে প্রথম স্বাদেশিকতাব ও স্চনা। এর আগেব পর্ব গেছে সামাজিক সমস্কার সমাধান নিয়ে, এবাব এল বাজনৈতিক সমস্কার এবং এদিক থেকে দেশে প্রথম চেতনা-সঙ্কাবেব দাবী প্রধানত বঙ্কিমের।

বঙ্কিম-সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ লেখকদের অনেকেবই নিজের নিজের কাগজ ছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘এডুকেশন গেজেট’, কালীপ্রসন্ন ঘোষের ‘বাক্ষ’, অক্ষয় সবকায়ের ‘সাবাবণী’, চন্দ্রশেখরের ‘উপাসনা’ ছিল তখনকার জনপ্রিয় কাগজ। এঁদের ভালো লেখা যা-কিছু, সমস্তই প্রথমে এঁদের নিজের নিজের কাগজে বেবিয়েছিল। এই কাগজগুলি সম্মিলিত ভাবে দেশের চিন্তা ও চিন্তা-ধাবাকে সর্বপ্রথম যুগের হাওয়ায় সজাগ করে তোলে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে আধুনিক ভারতে বাঙালী যে সর্বপ্রথম জেগেছিল, তা সম্ভব হইছিল শুধু এই কাগজ-গুলিব বহুল প্রচারেব ফলে। আগাছা তুলে নূতন বীজের পতন আগেই মুক হয়েছিল, এত দিনে দেখা দিল সত্যিকার শস্ত্রসম্পদ।

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, বঙ্গদর্শনের যুগ ভাবে ভাষায় এতখানি সম্পদের উত্তরাধিকার না বেখে গেলে, পববর্তী ববীন্দ্র-যুগ এতটা ঐশ্বর্যশালী এত সহজেই হত না! পৃথক পৃথক ভাবে এ যুগের লেখকদের মূল্য যাই হক, একযোগে তাঁরাই যে বাংলা সংস্কৃতিকে তাব আধুনিক সম্ভাবনীয়তার পাথ এগিয়ে দিয়েছেন, একথা অনস্বীকার্য। ঠাকুরবাড়ির ‘ভারতীর’ নামও এই

সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিম-যুগের শেষাংশে ও রবীন্দ্র-যুগের সূচনায় এই মাসিক পত্রটি অববাহিকার মতো থেকে ছুটি যুগকে গ্রহণবদ্ধ করেছে।

### সংবাদপত্র

প্রথম আমলের সাময়িক পত্রগুলি ছিল একাধারে সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্র। বঙ্কিম-যুগে এসে ওরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তখন থেকে সংবাদপত্র চলে গেল সাহিত্যের এলাকার বাইরে এবং রাষ্ট্র, সমাজ ও শিক্ষার সাম্প্রতিক আলোচনাই হল তার একমাত্র কাজ। আর সাহিত্যপত্র নিল রসস্বষ্টি এবং সংস্কৃতি-বিস্তারের ব্রত।

গত শতাব্দীর সংবাদপত্রগুলির মধ্যে ‘সোমপ্রকাশ’, ‘সঞ্জীবনী’, ‘বঙ্গবাসী’, ‘হিতবাদী’, ‘বঙ্গমতী’ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের চাকুলির ছুর্দশা-নিবারণে সঞ্জীবনীর আন্দোলন বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল। আর বঙ্গবাসীর সম্পাদকই বোধ হয় সর্বপ্রথম রাজ-দ্রোহের অপরাধে কাবান্ডা ভোগ করেন। বঙ্গবাসীতে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পঞ্চানন্দ’ এবং হিতবাদীতে যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ‘বুদ্ধিবচন’ তখনকার সমাজে বিশেষ আদৃত ছিল।

পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলন দেশে যত প্রসার লাভ করতে লাগল, ততই দেশবাসীর ভেতর আত্মশুদ্ধির তাগিদ স্পষ্ট হতে লাগল। প্রথমত এল সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের চিড়িক। সেটা ক্রমশ পিঠিয়ে স্বাধার পর এল রাজনৈতিক আন্দোলন। পরের পর এই ছুটি ধাপই দেশ অতিক্রম করতে পেরেছিল এত তাড়াহাড়ি, তার কারণ দেশে সাময়িক-পত্রের বিস্তার উত্তরোত্তর বিশেষ ব্যাপক হয়ে চলেছিল। হতে পারে, দেশের বহনশীল মন আত্মপ্রকাশের উদ্দামতায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল বলেই সাংবাদিকতা এমন দ্রুত উন্নতির পথে চলছিল। অথবা সাংবাদিকতা এত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল বলেই দেশ তার সঙ্গে তাল রেখে চলছিল!

এই সঙ্গে অবশ্য মুদ্রাযন্ত্রের ক্রমোন্নতির প্রসঙ্গটা ভাববার আছে, আর আছে খবরাখবর-লেন-দেন-ব্যবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতির প্রসঙ্গ। খবর-বিক্রয়ের এজেন্সি, টেলিগ্রাফ, বেতার বার্তা, অনেক কিছুই আজ সাংবাদিকতাকে এতটা প্রসারিত হবার সুবিধা দিয়েছে। কিন্তু যেদিন এসব ছিল না, অথচ সংবাদপত্র চালাতে হত, সেদিন সাংবাদিকদের অনুবিধা কত বেশী ছিল,

তা সহজেই অশ্রুমেয়। সেদিন তাই সাপ্তাহিক ছাড়া আর যে কোনরকম কাগজই ছিল অভাব্য। আশ্চর্যের বিষয়, তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অগ্রগামী মন বাধা পায় নি! ঈশ্বর গুপ্ত অল্প কিছুদিন দৈনিক প্রভাকরও বের করেছিলেন।

## স্বদেশী আন্দোলন

সাংবাদিকতার প্রকৃত উন্নতি স্বদেশী আন্দোলন থেকে। যেদিন স্বাধীনতা, সমানাদিকার ও আত্মমর্যাদা-বোধের বাণী নিষে দেখা দিলেন বঙ্কিম সেই দিন থেকেই ইঙ্গ-ভারতে জাতীয় জাগরণের সূত্র। সেই শুভ সূচনাই দুই দশক পরে স্বদেশী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। সেই আন্দোলনের টেউ ‘বন্দে মাতরম্,’ ‘সন্ধ্যা,’ ‘যুগান্তর’ নানা পত্রিকার ভেতর দিয়ে দেশের মর্মস্থানে এসে পৌঁছেছে। বাংলাব সীমানা ছাড়িয়ে এ মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, গুজরাট, মাদ্রাজে ছড়িয়ে পড়েছে।

বাংলার রাজনৈতিক সাংবাদিকতা যা, তার জন্ম এইখানে। কিন্তু তখনো পর্যন্ত রাজনীতি-চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল শিক্ষিত সমাজের মধ্যে। তাই ইংরেজীই ছিল তার প্রধান বাহন। ‘হিন্দু পোট্রিগট’ থেকে সূত্র করে ‘বেঙ্গলী,’ ‘ইণ্ডিয়ান মিরর,’ ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ সেকালের প্রসিদ্ধ খবরের কাগজ সবই ছিল ইংরেজী। শযুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, নরেন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, অরবিন্দ ঘোষ, শিশিরকুমার ঘোষ, মহিলাল ঘোষ, বাংলার সাংবাদিক ইতিহাসে যাদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, দেশের রাজনৈতিক চেতনায় যাদের প্রভাব মৃত-সঞ্জীবনীর কাজ কবেছে, তাঁরা কেউ বাংলা লেখেন নি।

তবে সৌভাগ্য এই যে, দ্বারিকানাথ বিজ্ঞানভূষণ, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তির সেদিনই টের পেয়েছিলেন যে, বাংলা সাংবাদিকতাকে তফাতে রেখে বাংলা স্বাদেশিকতা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। দেশের জন-মনে স্বাধীনতার প্রথম সাদা এনেছিলেন এঁরাই এবং এদিক থেকে দেশ এঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

এর পর বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে দ্বিতীয় দফা জোয়ার এল অসহযোগ আন্দোলনের সময়। কিন্তু সে ইতিহাস মাত্র সেদিনের, তাই

তার উল্লেখ নিম্নয়োজন। প্রথম মহাসমরের পর যেদিন আসমুদ্র হিমাচল তার তবর্ষ স্বাধীনতা-অর্জনের জন্তে উদ্যম হয়ে উঠেছিল, কারাগার, লাঞ্ছনা, অপমান, মৃত্যু, কোন কিছুতেই পেছপা হয় নি, সেদিন সংবাদপত্রই তাকে দিয়েছিল সেই সাহসের সঞ্চয়। যে সব সংবাদপত্র এই সময় মাথা তুলেছিল, তার মধ্যে দৈনিক ‘আনন্দবাজার’, ‘বঙ্গবাণী’ এবং সাপ্তাহিক ‘আত্মশক্তি’র নামই বোধ করি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সাংবাদিকের কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড, নির্যাতন এর আগেও হয়েছে। কিন্তু এখন থেকে সেটা হয়ে দাঁড়াল নিত্যকার ব্যাপার এবং বাজ-রোধের উত্তর দণ্ড মাথায় নিয়েই তাঁদের চলতে হল।

সংবাদপত্রের এই দ্রুত উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে, সাহিত্য-পত্রিকাও একেবারে আজ পর্যন্ত লম্বা পায়ে এগিয়ে এসেছে। বঙ্কিম-যুগের শেষ এবং রবীন্দ্র-যুগের সূচনায ‘ভারতী’র অবির্ভাব হয়েছিল, একথা আগেই বলেছি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কিছুদিন ‘বঙ্গদর্শন’ের সম্পাদনা করেছিলেন, তাবপব প্রকাশ করেছিলেন ‘সাদনা’।

## সাহিত্য

নবপর্যায় বঙ্গদর্শন এবং সাদনা থেকেই দেশ ভালো করে এ-যুগের শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখকদের সাক্ষাৎ পেল। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রিয়নাথ সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি। আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ত ছিলেনই। এই শক্তিশালী লেখকদের গোষ্ঠীপতি-রূপে কবি বাংলা গল্পের প্রাণ-শক্তি যত বড় করে দিলেন, তার পর তা আর বিশেষ বেড়েছে কিনা সন্দেহ!

বিজ্ঞানসাগর-দোহিতা সুরেশ সমাজপতির ‘সাহিত্য’ পত্রিকা হিসাবে ভারতী ও বঙ্গদর্শনের পরই অঙ্গার আসন দাবী করতে পারে। এর লেখকবর্গ ষাঁরা, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, স্বয়ং সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দোনেল্লকুমার রায় প্রভৃতি বাংলা গল্প সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী গৌরবের আসন লাভ করেছেন। রবীন্দ্র-গোষ্ঠী এবং সমাজপতি-গোষ্ঠী পরস্পর সমান্তরাল ভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করে দর্শনে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, রসতত্ত্বে, প্রবন্ধে নিবন্ধে, গল্পে উপন্যাসে, বাংলা গল্পকে সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণতা দিয়েছেন।

হুই দলে মতবৈধ যা-ই থাকুক, উভয় দলের সম্মিলিত সাধনায় বাংলা



গত যে অসামান্য সাবলীলতা এবং শক্তি স্বর্জন করবে, তা বলাই বাহুল্য এবং অপক্ষপাত সহজ দৃষ্টি নিয়ে বিচার কবলে, এ কথা আজকের সমালোচককে স্বাক্ষর কবতেই হবে যে, বিপ্লবস্বী বলে যাবা সেদিন দেশে চাকল্যের সৃষ্টি করেছিলেন, বচনা-ভঙ্গি এবং চিন্তা-পদ্ধতির দিক থেকে তাঁরা আসলে ববীন্দ্র-নাথকেই অনুসরণ করেছিলেন। এঁদের আসব জুড়িয়ে আসাব পব ববীন্দ্র-যুগ যাবা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। বামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত ‘প্রবাসী’ হল সেই যুগাদর্শের সর্বশ্রেষ্ঠ মুখপত্র। এবই পাশে পাশে ক্ষণশ্রোতা ‘বমুন’ও তেঁদের দিয়ে শবৎচন্দ্রের আবির্ভাব, সাময়িক পত্রের ইতিহাস সে এক দৈব ঘটনাব মতো।

### সবুজপত্র

ববীন্দ্র-যুগের মধ্যপর্বে সাময়িক সাহিত্যে আদ্য একটা বিপ্লবের হাওয়া এল প্রমথ চৌধুরীর ‘সবুজপত্র’ থেকে। এই বিপ্লবের প্রভাবটা প্রধানত বাইরের দিকে কাজ করেছে। সে হল সাহিত্যে কথ্যভাষার ব্যবহার, যা স্বয়ং ববীন্দ্রনাথও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অন্তরের দিকেও এর প্রভাব একটা কাজ করেছে। তা বাংলা সাহিত্যের আসবে বিপ্লব প্রজ্ঞার অবতারণা করা, বুদ্ধিবাদকে আধুনিক মানুষের উপযোগী সাহিত্য বচনা করা। দুঃখের বিষয়, শেষ পর্যন্ত জিনিসটা হয়ে দাঁড়াল একটা দলগত আনুষ্ঠানিকতা-স্বরূপ।

কিন্তু প্রমথ চৌধুরী এটা বোধহয় চান নি। তিনি চেয়েছিলেন, তাবালুতা উচ্ছেদ করে, যুক্তিসিদ্ধ অথচ জনপ্রিয় সাহিত্য সৃষ্টি কবতেই। নইলে প্রচলিত সাধু ভাষার আড়ষ্টতাকে তিনি কখনই পবিসার কবতেন না। কিন্তু দেশের বিদ্বৎসমাজ তাঁকে সঠিক বোঝেন নি। তাই ‘সবুজপত্র’-গোষ্ঠীর প্রায় সকলেই ভালো লেখক হলেও কেউ বড় লেখক হন নি, অবশ্য প্রমথ চৌধুরী নিজে ছাড়া। ‘সবুজপত্রের’ পব ‘কলৌল’, ‘কালি-কলম’ প্রভৃতির উল্লেখ না কবলে এই আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না। আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ লেখক যাবা, তাঁদের আবির্ভাব এই দুই পত্রিকায়। এব পব আর একমাত্র পত্রিকা ‘পবিসম’, যাব নামমাত্র উল্লেখ করেই এই আলোচনা শেষ হবে।

## তৃতীয় অধ্যায়

### কাব্য ও কবিতা

ভারতচন্দ্র, বামপ্রসাদ এবং তাঁদের পরবর্তী গীতকারদের রচনা দিয়ে প্রাচীন যুগ শেষ হল। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে শুরু হল নূতন যুগ। প্রাচীন যুগে সাহিত্যেব এক মাত্র বাহন ছিল পদ্য। গল্প, কাহিনী, জীবনচরিত, তত্ত্ববিচার, সবই লেখা হত পদ্যে। প্রাচীন সাহিত্যের জাতি-গোত্রও ছিল অনেকটা একই ধরনের। তাব সমস্ত শাখা-প্রশাখাবই জন্ম ধর্মকে আশ্রয় করে। তাই কি দৃষ্টি-ভঙ্গিতে, আব কি বচনা-পদ্ধতিতে, কবিদের স্বাধীন্যের পরিচয় বড় বেশী পাওয়া যায় না।

আধুনিক কালে এসে সাহিত্যে শ্রম-বিভাগ দেখা দিল। উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, নানা দিক দিয়ে সাহিত্য প্রকাশের পথ পেল বলেই, পদ্য-সাহিত্য অনেকটা তারমুক্ত হয়ে চলবাব সুবিধা পেল। পদ্যেব জাতি-গোত্রও আধুনিক কালে গেল আমূল বদলে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ভেতব দিয়ে দেশে এল পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব এবং সেই প্রভাব থেকে যেমন এ যুগে সাহিত্যের প্রাণ-শক্তি পেল নূতন নূতন প্রবর্তনা, তেমনি নূতন নূতন পথে শুরু হল সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি নিয়েও পরীক্ষা। কাব্যে এই পরীক্ষার ফলে মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, লিরিক, সনেট, নানা বিচিত্র ধারা নূতন করে দেখা দিল এই সময় থেকে।

ঈশ্বর গুপ্ত নিজে সৃষ্টির কাজ বেশী করতে পারেন নি, কিন্তু জমি তৈরী করেন তিনিই। সেই ভিত্তিভূমির ওপর পরে মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র মহাকাব্যের ইমারত খাড়া করলেন, আর নিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ, স্বজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি করলেন লিরিকের। তারপর এলেন রবীন্দ্রনাথ, যিনি বাংলা সাহিত্যের গদ্য ও পদ্য, নাটক ও কথাসাহিত্য, সমস্ত দিকই আপনাত অসামান্য স্বজনী-প্রতিভার আলোয় উজ্জ্বল করে তুললেন। রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে স্বজেন্দ্রলাল, অক্ষয়কুমার, গোবিন্দচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবি কালে রবীন্দ্র-নাথের প্রতিভার পাশে অনেকটা নিম্নত হয়ে গেছেন।

রবীন্দ্রোত্তর কবিদের ভেতর কয়েকজনের লেখায় ইদানীং প্রতিক্রিয়া স্ফূর্ত হয়েছে। এই প্রতিক্রিয়া-যুগের কবিতাকেই বলা হয় আধুনিক কবিতা।

## ঈশ্বর গুপ্ত

তারতচন্দ্রই খাঁটি বাংলা আদর্শের সর্বশ্রেণ কবি। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে নূতন যুগের সূত্রপাত হল। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে যথেষ্ট ইংরেজী-নবীশ ছিলেন বিনা সন্দেহ। কিন্তু বিদেশী চিন্তা-ধারা ও সাহিত্যাদর্শ আমাদের সাহিত্যে এল তাঁরই হাত দিয়ে। তারপর থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সঙ্গে প্রাচীন যুগের যোগসূত্র গেল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং প্রাচীন সাহিত্যের স্তম্ভ-রস সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, আধুনিক সাহিত্য তার স্বকীয় প্রাণ-প্রেরণায় বেড়ে উঠতে লাগল। পরবর্তী কালের বিশিষ্ট সাংগিতিক বীরা, মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, কারো ওপরই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রভাব দেখা যায় না। তাঁদের সাংগিত্যিক দৃষ্টি ও শিল্পাদর্শ তৈরী হয়েছে একান্ত ভাবে বিদেশী প্রভাবে। ববীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা কাব্য আবার দৈব কবিতা, বাউল সঙ্গীত এবং ছেলে-ভুলানো ছড়ার দিকে একটু মোড় ফিরেছে। কিন্তু তার আগেই সাহিত্যের মোটামুটি কাঠামোটা তৈরী হয়ে গেছে বিদেশী মালমসনা দিয়ে। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন এদের আনলেন, তখন স্বভাবদর্মেই এরা যেন একটা জন্মান্তরেব ভেতর দিয়ে এল। অর্থাৎ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অব্যাহত ধারায় স্পষ্ট ছেদ পড়ল ঈশ্বর গুপ্তে এবং আব একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারা জন্ম নিল।

ঈশ্বর গুপ্ত স্বয়ং যে সাহিত্য সৃষ্টি কবেছিলেন, তা আজো টিকে নেই। কিন্তু তাতে ঈশ্বর গুপ্তের গোবদ কিছুমাত্র কমে না। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় অনেকগুলো নূতন জিনিস আনেন, যাব মধ্যে প্রধান দুটি হচ্ছে, হান্তরস আর দেশপ্রেম।

পুরানো আমলে বিজয় গুপ্তের পদ্মাপ্রবাহে, রামেশ্বরবাব শিবায়ণে এবং দাশু রায়ের পাঁচালিতে হান্তরস-সৃষ্টির চেষ্টা আছে। কিন্তু তা বিশুদ্ধির স্তরে উঠেছে কদাচিৎ। ঈশ্বর গুপ্তের হাসিতেও কুরুচি আছে ঠিকই, কিন্তু মুক্তিরও চেষ্টা আছে প্রচুর। তপসে মাছ, পাঁঠা, মেম সাহেব, এদের নিয়েও যে নির্দোষ হাসি সম্ভব, এ ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম দেখান। তাঁর আগে বাঙালী

সাহিত্যিক শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গেয়েছেন শুধু দেব-মাহাত্ম্য। ঈশ্বর  
গুণ্ডাই প্রথম বললেন,

ভ্রাতৃত্বাব ভারি মনে,                      দেখ দেশবাসীগণে,  
 প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া ।

কত রূপ যত্ন করি,            দেশের কুকুর ধরি,  
বিদেশের ঠাকুরে ফেলিয়া ।

কাল-ধৰ্মে দেশাস্থিবোধের এই আদৰ্শকে আমরা হয়ত পছন্দ না করতেই  
শিখেছি। কিন্তু একশো বছর আগে এই আহ্বান কম অৰ্থপূৰ্ণ ছিল না।

কিন্তু ঐশ্বর গুপ্ত সব চেয়ে বড় কাজ করেছেন সাহিত্যপ্রস্টি-রূপে নয়, সাহিত্যসংস্কারক-রূপে এবং এই দিক থেকেই ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাঁকে শ্রদ্ধা সঙ্গে স্মরণ করবে। তাঁর আমলে তাঁরই চেষ্টিয়া বাংলা সাহিত্যের সমস্ত মফঃস্বলবাহিনী ধারা কলকাতার এক মূল উৎসে এসে মিশল। সে হল তাঁর ‘প্রভাকর’। এখনকার দিনে পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য-গোষ্ঠী তৈরী হয়, তার সূচনা প্রভাকরে এবং ঐশ্বর গুপ্তই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্বের সর্বপ্রথম ডিক্টেটর। ঐশ্বর গুপ্ত ছোটো দিকে নজর রেখে প্রভাকর চালাতেন, এক নূতন লেখক-সৃষ্টি, আর পুরাতন লেখক-প্রচার। নূতন লেখকদের মধ্যে তাঁর শাগরেদি করে এবং তাঁর কাগজে হাত পাকিয়ে পরে যারা যশস্বী হন, তাঁদের কয়েকজন হলেন রঙ্গলাল, দীনবন্ধু বস্কিম। সুতরাং ঐশ্বর গুপ্ত যে প্রতিভা চিনতেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন পাকা জহরীর মতোই, তার আর প্রমাণ দরকার নেই। তাঁর এই জহরীপনার আর একটু নিবিড় পরিচয় আছে। ছোকরা বস্কিমকে তিনি পথ ছেড়ে গল্প লেখার উপদেশ দিয়েছিলেন।

নিখুবাবু, হরু ঠাকুর, রাম বসু, শ্রীধর কথক, নিতাই বৈরাগী প্রভৃতি কবি-  
গণের রচনা সংগ্রহ ও সম্পাদনা করা এবং টীকা-টীপসহ, জীবনী ও  
সমালোচনাসহ প্রকাশ করাও তাঁর আর একটি কীর্তি। সেদিক থেকে তিনিই  
বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের প্রথম প্রবর্তক। এতগুলো কাজ এক জীবনে  
যিনি করেছেন, সম্পাদনা, সমালোচনা, সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্যের পৃষ্ঠ-  
পোষকতা, তিনি নিশ্চয় অসাধারণ পুরুষ। তাঁর রচনার অঙ্গীলতা বা  
অল্পপ্রাসের বাড়াবাড়ি নিয়ে ঠাট্টা করার আগে একথা যেন আমরা স্মরণে  
রখি।

## রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন সাহিত্যের সমাধি-শয্যার উপর নবীন সাহিত্যের বিগ্রহ স্থাপন করে যান। কিন্তু তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করার মতো সৃজনী-প্রতিভা তাঁর ছিল না। তাঁর সমস্ত আয়োজনই তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সীমাবদ্ধ থেকে যায়। পরবর্তী যুগে মাইকেল এবং বঙ্কিম এসে একে কাব্যে এবং ‘অশ্বে’ গড়ে বাংলা সাহিত্যে নবজীবন সঞ্চার করলেন। এখান থেকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আসল ইতিহাস আরম্ভ। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে মাইকেলে আসতে, মাঝখানে অল্প যে সময়টুকু পড়ে, তার একমাত্র উল্লেখযোগ্য কবি হচ্ছেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। দেব-দেবীর মহিমামূলক মঙ্গল ছেড়ে ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে উপাখ্যান-কাব্য লেখার রীতি প্রবর্তন করেছেন তিনি। ‘পদ্মিনী-উপাখ্যান’ মেবারের এবং ‘কাশ্মি-কাবেরী’তে উড়িষ্যার ইতিহাস তাঁকে কাব্য-রচনার উদ্দীপনা দিয়েছে।

বিষয়ের দিক দিয়ে যেমন, রচনা রীতির দিক দিয়েও তেমনি, রঙ্গলাল মঙ্গলকাব্যের রাস্তা মাড়ান নি। তিনি সোজাসুজি অম্লসরণ করেছেন স্বট, বাইরন, স্তদে প্রমুখ ইংরেজ কবিদের। তাঁর প্রসিদ্ধ ‘স্বাধীনতা চীনতায়’ অংশটা ত হুবহু ইংরেজীরই অম্লদান। রঙ্গলালের রচনায বৈশিষ্ট্য কিছু থাকলেও, বৈচিত্র্য কম। বাদলের কাহিনী বা কাশ্মি-কাবেরীর প্রারম্ভ বা এমনি দু-একটা জায়গায় তাঁর কলমে এসেছে একটু বেগ, একটু উন্মাদনা। নইলে আগাগোড়াই তা পয়ারের ভ্যানভ্যানি। অবশ্য ঈশ্বর গুপ্তের স্রিয়মাণ দেশ-প্ৰীতি রঙ্গলালে এসে বলিষ্ঠ চেহারা ধবেছে, তারই প্রেরণায় তিনি দেশের অতীত ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন কাব্যের মাধ্যমে।

এই সময়ের আর একজন কবি হচ্ছেন মনমোহন তর্কালংকার, যার ‘বাসব-দত্তা’ কাব্য এক সময় দেশে আদৃত ছিল। ইংরেজ আমলের কবিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যার ওপর ইংরেজী সাহিত্যদর্শ বিনুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। খাঁটি দেশী আদর্শ-অম্লসরণে লেখা এই কাব্যে অক্ষরে-অক্ষরে কবি ভারতচন্দ্রকে অম্লসরণ করেছেন। কাহিনী, চরিত্র, আঙ্গিক, ভাষা, যাবতীয় ব্যাপারেই। সংস্কৃত ছন্দের ওপর দখল ছাড়া আর কোন কিছুতে তাঁর কোন রকম অস্বীয়তার পরিচয় নেই। স্বপ্নদৃষ্ট কুমারীর সন্ধানে তরুণ নায়কের নিরাকার বাণী, সেখানে ক্রপের ছটায় কুলকামিনীদের চিত্তে

চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা, তারপর দ্বিতীয় সহায়তানাভ এবং সেই ভাবে কুমারী রাজকন্ডার সঙ্গে মিতালি, গ্রেপ্তার এবং দৈব মধ্যস্থতায় মুক্তি ও বিবাহ! এক কথায় বিদ্যাসুন্দরের আত্মপূর্বিক নকল এবং সে সকল গণেশবন্দনা থেকে সুর করে, পবটিকা ছন্দে উৎসব-বর্ণনা পর্যন্ত। অধুনালুপ্ত বলেই বইটি উল্লেখযোগ্য।

## মাইকেল

এর পর মাইকেল, স্বজনী-প্রতিভায় ধীর সমকক্ষ কবি তাঁর পূর্বে বাংলা দেশ দেখে নি। দেশ-বিদেশের ক্লাসিক্যাল সাহিত্য তিনি মন্বন করেছিলেন। তারি সঙ্গে আবিষ্কার করেছিলেন বাংলা যুক্তাক্ষরের অন্তর্নিহিত শক্তি। এই দুইষের সমাবেশে তিনি যে নূতন কাব্য-রীতির প্রবর্তন করলেন, তা এমনই দুর্ধর্ষ রকমে স্বতন্ত্র যে, দেশ প্রথমটা তা বরদাস্ত করতে পারে নি। উপ-ধর্মের গণ্ডি-ঘেরা বাংলা কবিতার ক্ষীণধারা মাইকেলের বলিষ্ঠ বাহর আলোড়নে খুলিয়ে উঠেছে, গৃহাঙ্গনের সীমা ছাড়িয়ে তা ছুটেছে মহাসাগরের অভিমুখে।

বাংলা কবিতা এখন থেকে কেবলমাত্র বাংলাব কবিতা না থেকে, বিশ্বের কবিতার সঙ্গে সমানজাতিত্বের দাবী করতে পেরেছে। মাইকেল খুঁটান ছিলেন বলে নয়, পাশ্চাত্য সাহিত্যে তদানীন্তন ভারতবাসীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন বলে নয়, মনে-প্রাণে অ-বাঙালীমূলভ বিদ্রোহ ও পুরুষকারের উপাসক ছিলেন বলেই, তিনি জাতীয় সংস্কৃতিব মর্মমূলে বিপুল নাড়া দিয়েছেন। যুগ-সঙ্কীর্ণ জড়তা ও অন্ধ আচারনিষ্ঠার বন্ধন ভেঙে জীবনকে এনে তিনি স্থাপিত করেছেন দিগন্তপ্রসারী বিস্তৃতির পটভূমিতে। মাইকেল এঞ্জেলোর মূর্তির মতো বিরাট আর তেমনই জীবন্ত নর-নারী তাঁর সবল তুলিকাম্পর্শে মূর্ত হয়ে উঠেছে, যা বাংলা সাহিত্যে আগে হয় নি। মাইকেলের এই পৌরুষের পাশে বন্ধিমের প্রতিভাকেও যেন নিপ্তত মনে হয়।

এই অসীম প্রাণ-শক্তিই তাঁকে যেমন চিত্রাচারিত রীতির বিরোধী করেছিল, তেমনি করেছিল প্রচলিত ঐতিহ্যের প্রতিকূল। পযার-ত্রিপদী-প্রাবিত বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তন এবং রাম-লক্ষ্মণকে ছেড়ে রাবণ-মেঘনাদে অধিকতর মহত্ত্ব-আরোপের মূল মাইকেলের এই মনোধর্ম। উপমা-প্রয়োগে বা অলংকার-বিছাসেও মাইকেল প্রচলিত প্রসিদ্ধির অনুসরণ করেন নি। আগাগোড়া ধার করেছেন পাশ্চাত্য থেকে। এক কথায় ইউরোপীয় রস-দৃষ্টি এবং চিন্তা-ধারার সংযোজনায় তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় ওজোবলসম্পন্ন

উচ্চাঙ্গের কাব্য-ধারা এনেছেন। আমাদের দেশে ইউরোপীয় আদর্শের মহাকাব্য, বিয়োগাত্মক নাটক, প্রহসন, সনেট, নাট্যধর্মী খণ্ডকাব্য, সবই মাইকেলের সৃষ্টি, একথা আজ তাবলে বিশ্বয়বোধ হয়।

আধুনিক সমালোচনার নিরিখে বিচার করলে অবশ্য মাইকেলের কাব্যে আজ সব চেয়ে বড় যে খুঁত পাওয়া যায়, তা হচ্ছে তাঁর আবেদনের স্থূলতা। কি চরিত্র-সৃষ্টিতে, কি ঘটনা-বিকাশে, আর কি ছন্দযাবেগ-ব্যাখ্যায়, সর্বত্র মাইকেলের হাতে মোটা তুলি। উপমার পর উপমা, শব্দের পর শব্দ বসিয়ে তিনি গেয়ে চলেন, কিন্তু তাঁর কাব্য আসলে চলে কম, চলার আয়োজন করে বেশী। রচনার এই স্থূলতার জন্তে তাঁর সৃষ্ট চবিত্তগুলো যেমন হয়েছে মোটা মোটা তাঁর ভাষাও হেমনি ব্যঞ্জনা-গভীর হতে পারে নি। মেঘনাদে ত নয়ই, তাঁর বীরাজনাতোও কদাচিৎ আবেদনের অশ্রুস্ফুটি দেখা যায়। এর একটা কারণ অবশ্য এই যে, মাইকেল ক্র্যাসিকাল সাহিত্যকে আদর্শ নিয়ে রোমান্টিক কাব্য লিখতে বসেছিলেন। কিন্তু আসল কারণ বোধহয় এই যে, বাংলা ভাষার ‘জ্ঞানে’ব সঙ্গে মাইকেলের সত্যিকার পরিচয় হয় নি। অসামান্য অধ্যবসায় তিনি তাকে আয়ত্তে এনেছিলেন, কিন্তু আয়ত্ত করতে পারেন নি। তাই তিনি সবই করেছেন, কিন্তু তাঁর কাব্য-শরীরে সব জায়াগায় স্তম্ভভীর প্রাণ-রস সঞ্চার করতে পারেন নি। এমন কি সনেটে বা একান্ত ব্যক্তিগত ‘আত্ম-বিলাপে’ও না।

## হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র

মাইকেল-প্রবর্তিত মহাকাব্যের ধারা তাঁর পর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেনের হাত দিয়ে অল্প দিকে মোড় ফিরল। হেমচন্দ্র আসলে ‘জ্ঞাত কবি’ ছিলেন না, অধ্যবসায় তাঁকে দিয়ে কিছু কাব্য লিখিয়ে নিয়েছে। তাঁর খণ্ড-কবিতা বা লিরিকের আলোচনা পূর্বের অধ্যায়ে করব। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বই ‘বুত্রসংহারে’ই বর্তমান প্রসঙ্গ সীমাবদ্ধ থাকবে। বুত্রসংহারের নাম থেকে স্পষ্ট করে ভেতরকার চরিত্র পর্যন্ত আগাগোড়া মেঘনাদবধের অমুকরণ। উভয় ক্ষেত্রেই দৈবশক্তির সঙ্গে দানবশক্তির সংঘর্ষ এবং শেষ পর্যন্ত দানবশক্তির পরাজয়। একে রাম আর রাবণ, অথো ইন্দ্র আর যুজ। তারপর মেঘনাদ ও প্রমীলা, রুদ্রাপীড় ও ঐন্দ্রিলা, গীতা ও সরমা, শচী ও ইন্দুবালা। ঘটনা-সংস্থানেও হেমচন্দ্র মাইকেলের ছায়া অনুসরণ করেছেন,

শুধু দধীচির আত্মত্যাগ এবং বিশ্বকর্মার কর্মশালা-বর্ণনাটুকু ছাড়া। কিন্তু কল্পনার অজস্রতায়, বর্ণনার তেজস্বিতায়, শব্দযোজনায় গাঢ়তায় মেঘনাদবধে যে জমজমাট ভাবটি আছে, বৃত্তসংহাবে তা নেই। নানা ছন্দের ব্যবহার যেমন এক দিকে কাব্যের অব্যাহত গতিকে ধোঁড়া করেছে, অন্য দিকে তেমন কবি কোথাও কোন উচ্চ চিন্তা বা জীবন-বোধকে ভাষা দিতে পারেন নি।

বৃত্তসংহারের আরম্ভ এবং শেষ সত্যিই ভালো এবং সমগ্র কাব্যের মধ্যে ঐ দুটি জায়গাতেই তাঁর লেখনীর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। আরম্ভটা প্যারাডাইস্ লস্টের প্যাণ্ডিমনিয়ম মনে করিয়ে দেয়, 'আব বিশ্বকর্মা'ব কর্মশালাও সুন্দর, দাস্তের নকল হওয়া সত্ত্বেও।

নকল মাইকেলও করেছেন। ইলিয়াডের হেক্টর-এণ্ড্রোমেকি তাঁব হাতে এসে মেঘনাদে-প্রমীলায় রূপান্তর লাভ করেছে। কোমসেব স্ত্রীত্বাব বিবরণ থেকে তিনি জল-তল-নিবাসিনী বারুণীব কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। ইউলিসিজের নরক-যাত্রা থেকে নিয়েছেন বামের প্রেতপুত্রী-ভ্রমণের বিষয়। ভার্জিল, দাস্তে, ট্যাসো প্রভৃতি থেকে টুকরো অংশ আনেন যে কত নিয়েছেন মেঘনাদে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তাঁব নিজের ছিল এমনই একটি প্রাণবন্ত সৃজনী-শক্তি যে বহিরূপাদান তিনি যেখান থেকেই আহরণ করুন, তাকে নিজের করে নিতে পেরেছেন। হেমচন্দ্রের সৃজনী-প্রতিভা ছিল সীমাবদ্ধ, ভাষা ছিল অতিশয় অপটু, তাই তাঁর রচনায় ভালো মাল-মসলা প্রচুর থাকলেও, সবসুদু জড়িয়ে বড় জিনিস কিছু হয়ে ওঠে নি।

নবীনচন্দ্র প্রাক-রবীন্দ্র কবিদের মধ্যে বিহারীলাল ছাড়া আর সকলের চেয়েই বড়। তাঁর লেখাষ একটি সত্যিকার বেগবান কবি-হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়া যায়। সে পলাশীর যুদ্ধের মতো কাঁচা লেখাতেই হক, আর প্রভাস, কুরুক্ষেত্র, ও রৈবতকের মতো সুলিখিত এবং সুপরিণত কাব্যেই হক। পলাশীর যুদ্ধ সত্যিই তাঁর খুব কাঁচা লেখা। বাইরনের সুরা, শোণিত ও স্বাধীনতার উদ্গাদনায় উচ্ছ্বসিত 'চাইল্ড হেরল্ড' কাব্যকে উমির্চাদ, মিরজাকর, আর গোটা কয়েক শতাব্দীর চক্রান্তে রাজ্যচ্যুত নাবালক নবাবের নিধন-কাহিনীর ভেতর রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি এই কাব্যে। কিন্তু বাইরনের কাব্য হচ্ছে বর্ণনামূলক, আর নবীনচন্দ্র লিখেছেন ঐতিহাসিক উপাখ্যান-কাব্য। তবে যুদ্ধ-বর্ণনায়, সিরাজের স্বপ্ন-বর্ণনায় এবং সর্বশেষে তাঁর হত্যা-



বর্ণনায় পলাশীর যুদ্ধেও যে ঔজ্জ্বল্যের পরিচয় আছে, তা বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও ছিল না।

‘রৈবতক’, ‘কুরুক্ষেত্র’, ‘প্রভাস’ আসলে একখানাই কাব্য। কৃষ্ণ-সীতার তিনটি পর্যায় নিয়ে পৃথক পৃথক তিন খণ্ড লিখিত হলেও, তিনের মধ্যে তাই আখ্যানগত একটি যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ আছে। নবীন সেনের এই Trilogy মাইকেলস্কোর এবং প্রাক্-রবীন্দ্র পর্বের এক অপূর্ব বই। ছোট ছোট কয়েকটা নিদর্শন নেওয়া যাক। রৈবতক পর্বতে অন্তরীণ অর্জুনের কাছে শ্রীকৃষ্ণের শৈশবকাহিনী-বর্ণনা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মৃত্যু-কণ্টকিত মুহূর্তে স্নলোচনার সেবারত ও উত্তরার স্বপ্ন, শ্রীকৃষ্ণের ধর্মরাজ্য-পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দুর্বাসার বিদ্রোহ, নাগজাতির অভ্যুত্থান এবং তাদের পুরোভাগে থেকে অশ্বিনবুদ্ধি দুর্বাসার কপট যজ্ঞানুষ্ঠান...কাব্যের অধ্যায় হিসাবে যেমন মহত্বব্যাঞ্জক, বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যে তেমনি অনাস্বাদিতপূর্ব। পরিকল্পনায় এবং ভাব-ব্যঞ্জনায় বৃত্তসংহারের চেয়ে ত বটেই, মেঘনাদবধের চেয়েও এরা উন্নত রুচির নির্দেশক। আমরা নবীনচন্দ্রেই সর্বপ্রথম দেখলাম, লাক্ষ্মিও মানবতাবিদ্ভোহ-অভিযান। বর্ণ-হিন্দুর সমগ্র প্রসারিত ভেদবুদ্ধিব বেড়া-জাল ছিঁড়ে তারা বেবিয়েছে তেড়েফুঁড়ে, বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে বিপ্লবারক্ত চোখে, যার মুখে শ্রীকৃষ্ণের ধর্মরাজ্য স্থাপনের মহৎ পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত পর্ববসিত হল প্রভাসের প্রসঙ্গ সমাপ্তিতে। এই রসঘনতা রবীন্দ্রযুগেরই পূর্বাভাস সূচনা করে। অমিত্রাক্ষর-লক্ষণাক্রান্ত পয়ার যা রবীন্দ্রনাথের হাতে পূর্ণতা পেয়েছে, নবীন সেনে তাবও স্থরপাত। বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, কর্ণকুন্তী-সংবাদ, কচ ও দেবযানী প্রভৃতির পাশে প্রভাস, কুরুক্ষেত্র, রৈবতক রেখে পড়লে, সহজেই বোঝা যায়, এরা ওদের অব্যবহিত পূর্বপুরুষ।

নবীন সেনের Trilogy-র আর একটি উল্লেখযোগ্য জিনিস শৈলজার চরিত্র। শৈলজার মোটামুটি পরিকল্পনাটা রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা চরিত্রেরই অপ্রক্ষুট রূপ, যেমন রঘুপতির বিদ্রোহ নাগবিদ্রোহেরই পূর্ণতর রূপ। অবশ্য রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রসঙ্গে প্রভাসের কথাটা অবান্তর, তবু ইতিহাস-লেখকের একটা ব্যবহারিক হিসাব ত চাই। নবীন সেনের Trilogy-র প্রধান দোষ তার ভাষা। যথেষ্ট গতিশীল এবং চিত্রধর্মী ভাষাতেই অবশ্য কবি লেখনী চালনা করেছেন, কিন্তু শব্দ-ভাণ্ডার তাঁর খুব সীমাবদ্ধ। তাই থেকে তাঁর লেখা পড়ে

ষায়। হৃদয়াবেগের প্রাচুর্যে কাব্য-বস্তু যখন খুব জমে ওঠে, ভাষা তার ঠে না পেয়ে বাইরে মাথা ঠুকে মরে।

## মাইকেলোত্তর কবিতা

নবীন সেন থেকেই মহাকাব্যের ইতিহাস শেষ। মাইকেলে এর জন্ম এবং নবীন সেনে শেষ, মধ্যে হেমচন্দ্র। বলা বাহুল্য, বাংলা ভাষায় মহাকাব্য জিনিসটা এ যুগের দান। পুরানো মঙ্গলকাব্যগুলো কাব্যিকার উপাখ্যান। প্যারাডাইস লস্ট যে জাতের মহাকাব্য, সেই জাতের মহাকাব্য প্রাচীন বাংলায় ছিল না, তার প্রবর্তন করেন এঁরা। উপাখ্যান-কাব্যের সঙ্গে মহাকাব্যের তফাৎ শুধু আকারে নয়, প্রকারেও। (একটি ছন্দময় বিষয়-বস্তুকে কেন্দ্র করে পরস্পর-বিরোধী কতকগুলো চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করা এবং তা থেকে একটি স্বগতীর পরিণামের নির্দেশ দেওয়াই হল মহাকাব্যের প্রধান লক্ষ্য। তাই তার আঙ্গিক এবং ভাষা হয় গুরুগম্ভীর। উপাখ্যানের লক্ষ্য হল গল্প বলা এবং তা থেকে মধুর একটা রসের সন্ধান দেওয়া। তাই তাতে দরকার হয় লালিত্যের। অর্থাৎ মহাকাব্যের প্রাণ-ধর্মে আছে নাটক, আর উপাখ্যানে আছে লিরিক। মাইকেল-যুগের অন্তে বাংলা কাব্যে আবার লিরিক ফিরে এল এবং সে-ও এল পাশ্চাত্য প্রবর্তনা থেকেই।

মহাকাব্যের ভাঙা আসরে অস্থবৃষ্টি চলেছিল অবশ্য অনেকদিন। আনন্দচন্দ্র মিত্রের ‘হেলেনা কাব্য’, হবগোবিন্দ লস্কর চৌধুরীর ‘দশাননবধ’, বলদেব পালিতের ‘কর্ণার্জুন,’ সর্বশেষ যোগীন্দ্রনাথ বসুর ‘পৃথ্বীরাজ,’ ‘শিবাজী’ এক সময় অনেকের আনন্দ বর্ধন করেছে। এঁরা মহাকাব্যের ক্ষয়িষ্ণু ধারাকে কিছুকাল বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেন নি। মহাকাব্য জিনিসটা হচ্ছে অতি-কায় জীবের মতো। সংস্কৃতি-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষয় অনিবার্য।

উপাখ্যান-কাব্যের বিলুপ্তি আগেই হয়েছিল। এ যুগে তাকেও আর একবার ফেরাবার চেষ্টা হয়। হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন ‘যোগেশ’ নামে একখানি সামাজিক কাব্যকাহিনী। ছুটি প্রতিদ্বন্দ্বী নারীর আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে ফেলে নায়ক যোগেশের হৃদয়-বন্দ এবং তার অনিবার্য ট্র্যাজেডি-বর্ণনাই হল এই কাব্যের বিষয়। মনস্তত্ত্বের খেলা এতে সমংকার, ভাষাও দিব্যি ঝরঝরে। তার ওপর গল্পাংশে কোথাও অলৌকিকতার

বলাই নেই, নীতি-উপদেশের উৎপাত নেই। ববং আখ্যায়িকাব স্বাভাবিক পৰিণতিক কবি অসঙ্কোচে এবং বেশ অকপটেই ফোটাতে চেষ্টা কৰেছেন। মাইকেলোত্তৰ বাংলা সাহিত্যে একাধিক দিক থেকে উল্লেখযোগ্য এই কাব্যটিব কিন্তু দেশে যথোচিত সমাদৰ হয় নি। হয়ত অগ্রজ হেমচন্দ্রের অতি-খ্যাতিৰ আড়ালে ঈশানচন্দ্র ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন। তবে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এবং নবীন সেন তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা কৰতেন। যোগেশ কাব্যখানি মবল অমিত্রাক্ষৰ ছন্দে এবং সম্ভৱত টেনিসনেৰ Enoch Arden-জাতীয় কাব্যেৰ অল্পকবণে লেখা।

দ্বিজেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰেৰ ‘স্বপ্ন-প্ৰয়াণ’ কাব্যও উপাখ্যান-পৰ্যায়েৰ আব একটি উল্লেখযোগ্য বই। এ একখানি ৰূপক কাব্য। কল্পনাৰ অনায়াস লীলায়, বহু বিচিত্র চিত্ৰেৰ অজস্ৰতায় অপৰূপ এই কাব্যখানিও বাংলা সাহিত্যেৰ মূল্যবান সম্পদ। কত হান্ধা হাতে লেখনী চালালে, তবে এই মায়াময় স্বপ্নেৰ আবধাওয়াটি বজায় থাকে তা অন্তমান বৰা সহজ নয়। সবচেয়ে বিস্ময়কৰ এব ছন্দ। সে যেন নেচে চলেছে বৰ্ণাৰ মতো, কোথাও তাব পথে এতটুকু বাধা নেই।

হোথায মহাবত, শিবে জট, অতি নিবিড়,  
পালিছে চুপে চাপে, খোপ খোপে, অযুত নাড়।

কিংবা,

গবজন স্তবিকট                      হইল সন্নিবৃত  
গোগণ ঝটপট খোজে আডাল,  
কহু বা খোপ-ঝাড়,              কবিতা হোলপাড়  
পালায় ছুদাড় মুগেৰ পাল।

পড়তে পড়তে নেশা লাগে। যুক্তাক্ষৰেৰ স্বব-তবপ্ৰেৰ ওপৰ নিৰ্ভৰ কৰে ছন্দেৰ যতি-নিৰ্ণয় কৰাব পদ্ধতিও বোৰ হয় বাংলা ভাষায় এসেছে স্বপ্ন-প্ৰয়াণ থেকেই, যা মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীন সেন, কাক্সৰ লেখাতেই পাই না। কেবল-মাত্র অক্ষৰেৰ হিসাব থেকে তাঁরা ছন্দেৰ তাল ঠিক কৰতেন, তাই আজকেৰ বিচাবে তাঁদেৰ পৰ্যাবাতিবিক্ত মিত্রাক্ষৰে পদে পদে ছন্দঃপতন দেখা যায়। এটা দূৰ হয়েছো দ্বিজেন্দ্ৰনাথে এসে। তিনিই প্ৰথম স্ববপ্ৰধান ছন্দে অক্ষৰেৰ হিসাব ছেড়ে মাত্রাব হিসাবকে মান-ৰূপে গ্ৰহণ কৰেছেন।

## বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথ

এরপর বিহারীলাল। আধুনিক লিরিকের পুনরুজ্জীবনে বিহারীলালের দান অসংখ্য রবীন্দ্রনাথ কণ্ঠক স্বীকৃত হয়েছে। বিহারীলালকে তিনি তাঁর কবি-জীবনের প্রারম্ভিক প্রবর্তনা দেওয়ার জন্যে শুরু বলে স্বীকার করেছেন। বিহারীলালের প্রভাব রবীন্দ্রনাথ অবশ্য অল্প বয়সেই কাটিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু বিহারীলালের দৃষ্টি বাংলা কবিতার মোড় যেদিকে ফিরিয়ে দিয়েছিল, সেই পথ ধরেই তার পরবর্তী বিকাশ হয়েছে।

আধুনিক কালে যে লিরিক আমরা পড়তে অভ্যস্ত, রবীন্দ্রনাথ যে বিচিত্র সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহের অমুভূতি-সমৃদ্ধ কবিতা দেশকে উপহার দিয়েছেন, তা বাংলা কাব্যে আগে ছিল না। মাইকেল-যুগ পর্যন্ত পুরানোরই জের চলেছে। মাইকেলের ‘আত্ম-বিলাপে’ বা মুষ্টিমেয় সনেটে ব্যক্তিগত অমুভূতিব সুর পাই। হেমচন্দ্রের ‘আবার গগনে কেন’ বা নবীন সেনের ‘অবকাশ-রঞ্জিনী’র কোন কোন কবিতাতেও পাই। কিন্তু সে অমুভূতি ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনার গতিতে সীমাবদ্ধ। ব্যক্তিগত অমুভূতিকে সার্বজনিক করা তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয় নি। এটা করলেন বিহারীলাল। বাংলা কাব্যে তিনিই প্রথম বাহ্য প্রকৃতির এবং অন্তঃপ্রকৃতির রহস্য-লোকের সন্ধান পান। তাঁর আগে মাইকেলে, হেমচন্দ্রে, নবীনচন্দ্রে কোন ভাব বা চিন্তা বা ঘটনার জড়-উপাদানকে সরাসরি ছন্দে রূপায়িত করা হয়েছে। উপাদানের গুণে বা লিপি-চাতুর্যের বৈশিষ্ট্যে সময় সময় তা সুখপাঠ্য হলেও, আসলে সার্থক কবিতা হয়নি। প্রাণ-ধর্মের বিচারে সে সব কবিতার বেশির ভাগই দেউলে।

বিহারীলালেই প্রথম উপাদানের বদলে অমুভূতিকে, ভাবের বদলে রসকে লিরিক কবিতার উপজীব্য হিসাবে নেওয়া হল। ‘সারদা-মঙ্গল’ের গোড়ার কবিতাটাই ধরা যাক,

কিবা মনোবিমোহন মুরতি তোমার,  
সদা যেন হাসিতেছে আলয় আমার।  
সদা যেন ঘরে ঘরে,  
কমলা বিরাজ করে,  
ঘরে ঘরে দেব-বীণা বাজে সারদার।

ধাইয়ে হরষতরে, কোলাহল করে করে

হাসি মুখে ঘুরে ফেরে কুমারী-কুমার।

মরুময় ধরাতল,

তুমি শুভ শতদল,

করিতেছ ঢল ঢল সমুখে আমার।

হয়ে কত জ্বালাতন,

করি অন্ন আহরণ,

ঘরে এলে উবে যায় হৃদয়ের ভার।

জুধা-ভৃক্ষা দূরে রাখি, ভোর হয়ে বসে থাকি,

নয়ন-পরান দিয়ে দেখি অনিবার।

তুমি লক্ষ্মী সবস্বতী,

আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,

হকগে এ বসুমতী যার খুণী তাব।

প্রসিদ্ধ 'চিমালায়' কবিতা থেকেও একটু উদ্ধৃত করা যেতে পারে,

পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম, তুচ্ছ গিরি স্বর্গ সোম,

নক্ষত্রে নখাগ্রে যেন গণিবাব পারে।

সমুখে সাগরান্ধরা, ছডায়ে রয়েছে ধরা,

কটাক্ষে কখনো যেন চাহিছে উহারে।

প্রিয়াকেই হক, আর প্রকৃতিকেই হক, এই যে বিশেষ একটা দৃষ্টিতে দেখা, একে বলা যাবে গীতি-কবিতাব মেগাজ। সারদা সরস্বতীই হন, আর কবির মানসীই হন, আর কোন বাস্তবী নারীই হন, আসলে তিনি কাব্যলক্ষ্মী। শেলীর Spirit of Eternal Beauty বা রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতারই তিনি স্বজাতীয়।

অবশ্য এ কথা মনে করলে ভুল হবে যে, বিহারীলালের হাতেই বাংলা লিরিক সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। বিহারীলাল বাংলা কবিতাকে ভাবী সম্ভাবনার পথে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর অধিকাংশ কবিতা কালের পরীক্ষায় টেকে নি। তাতে নূতন দৃষ্টি আছে, কিন্তু সেই দৃষ্টি সংহত হয়ে ওঠে নি। মাঝে মাঝে অসাধারণতার চমক আছে, কিন্তু আগাগোড়া জড়িয়ে তা সত্যিকার মহৎ সৃষ্টি হয়ে ওঠে নি। ঘূর্ণমান নীহারিকার মতো তা

শুধু আবর্তিতই হয়েছে, দানা বাঁধতে পারে নি। তাঁর কবিতায় অবোধ্যতার মূলও এইখানে।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পূর্ণ অন্য জাতের কবি। তিনি আপন কবিধর্ম ব্যাখ্যা করে বলেছেন,

হে কবি-কল্পনা-মায়া, সত্যের সোনালী ছায়া,  
কাব্য-ইন্দ্রজাল-ভাহুমতী,  
সুখে তুমি যথা ইচ্ছা যাও রূপবতী।  
চড়িয়া কল্পনা-রথে, অম পিয়া ছায়াপথে,  
কর ইন্দ্রচাপ বিরচন,  
কিংবা কর পরী সাথে চন্দ্রিকা ভোজন।  
আমি না করিব দেবী তব আরাধন।  
বিধাতার এ সংসারে, যারে না ভূমিতে পাবে,  
যে কবির মহতী কামনা,  
তাহারা করিবে শুধু তব আরাধনা।  
তত লোকাভীত নয় বাসনা আমার,  
লক্ষ্য মম সামান্য এ সত্যের সংসার।

‘মহিলা’ কাব্যের মঙ্গলাচরণেও তিনি প্রায় এই কথাবই প্রতিধ্বনি করেছেন,

না চাই বর্ণিতে নদ, নদী, সরোবর,  
শৈল, সিন্ধু, মরুভূ, প্রান্তর।  
গাব গান খুলি হৃদি-দ্বার,  
মহীয়সী মতিমা, মোহিনী মহিলার।

আশ্চর্যের বিষয়, বিহারীলাল কল্পনার অমুরঞ্জন বাস্তবকে অতি-বাস্তবে রূপায়িত করছিলেন যে সময়, ঠিক সেই সময় তাঁর সমসাময়িক কবি সুরেন্দ্রনাথ কল্পনাবাদ পরিহার করে ‘সত্যের সংসার’কে চিত্রিত করবার জন্তে লেখনী ধরেছিলেন। অর্থাৎ দু-জনে রসাদর্শের পরস্পর-বিরোধী দুটি সীমানা ধরে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এক সমসাময়িকতা ছাড়া দু-জনের মধ্যে তাই আর কোন দিক থেকে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের এই বাস্তবতা বস্তু-সংসারকে যথাযথ অঙ্কিত করা নয়, বস্তুকে তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে বোঝানো এবং সেই কারণেই তা অতিমাত্রায় intellectual।

এই প্রজ্ঞান্ধতার আতিশয্যে মহিলা কাব্যের পাঠকে বাবংবাব হোঁচট খেতে হয়।

প্রত্যক্ষ সংসারে মাতা, ভগিনী, জায়া, কন্যা, নানাকপে নাবী মানুষের জীবনকে ধরে আছেন। আসলে এ হল প্রাণ-শক্তিবই বহু নিচিহ্ন পথে আল্প-প্রকাশ এবং সৃষ্টির ধারা বজায় রাখাই এর লক্ষ্য। আব এ-ই হল মহিলা কাব্যের মূলতত্ত্ব। বইটি কবি শেষ করে যেতে পাবেন নি। কিন্তু যতটা পাওয়া গেছে, তাতেই সমগ্রতার যে পরিচয় পাই, তা বিষয়কব।

কিন্তু একটা জিনিস লক্ষণীয়। সুবেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতো কবি বদীপ্পনাথের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করেন নি।

সুবেন্দ্রনাথ মজুমদারের শিষ্য বিহাবীলাল চক্রবর্তীর সমগ্র বচনা নিয়ে আলোচনা করার স্থান বা অবকাশ নেই। ছু-তনের ছুটি শ্রেষ্ঠ বচনা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া সুবেন্দ্রনাথ মজুমদারের অসমাপ্ত কাব্য ‘সদিতা-সুদর্শন’ এবং ‘সদ্যাব পদীপ’, ‘বন্দ-বন্দিন’ প্রভৃতি কবিতা যেকোন পাঠকের মনোহরণ করবে। বিহাবীলালের ‘বঙ্গসুন্দরী’, ‘দাদার আসন’, ‘বন্ধু-বদ্বাগ’, ‘নিসর্গ-দর্শন’ ইত্যাদিও বহু অংশে নন্দিত হবে না।

বিহাবীলাল ও সুবেন্দ্রনাথের সমসাময়িক আব একজন শক্তিশালী কবি হলেন গোবিন্দচন্দ্র বায়। এঁর অল্প কয়েকটি মাত্র বচনা হাতে পাওয়া যায়। গোবিন্দ বায় প্রাক-বদীন্দ্র যুগের একজন বিশিষ্ট কবি। এমন কি বিহাবীলাল, সুবেন্দ্রনাথের চেয়েও এঁর লেখনীর দাব বেণী। গোবিন্দ বায়ের সবচেয়ে গবেণীয় কবিতা ‘যমুনালহরী’ আজকের পাঠক অনেকেরই হৃদয় পড়ে থাকবেন। এই কবিতায় মিলহীন মিত্রাক্ষরে কেবল মাত্র স্বব-তবস্বের সাহায্যে ছন্দ-সঙ্গীত সৃষ্টি করা যেমন লক্ষ্য অর্থাৎ মতো, তখনই এর অস্বাভাবিক সত্যাস্থিতিও অল্পোপেক্ষীয়। সুবেন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে যে নিবাসকৃত ওস্তদৃষ্টিব উল্লেখ করেছি, গোবিন্দ বায়ে সেই দৃষ্টিবই পূর্ণরূপে প্রকাশ দেওয়া পাই। হিন্দু ও মুসলিম ভাবতের বিলুপ্ত কীর্তির মহাশ্মশান ধৌত করে বইছে যে যমুনা-লহরী, তাকে কবি দেখছেন একটি ধ্বংসশীল চৈতন্যধারা-রূপে, যা কেবল একের পর এক করে নূতন খেলাব ছক পেতে চলেছে এবং চোখ ফেরাতে না ফেরাতেই সব ভেঙে-চূবে আবার নূতনের পত্তন করে যাচ্ছে। ধ্বংস ও সৃষ্টির এই অবিশ্রাম প্রবাহের মাঝে ছেদ বচনা করে দাঁড়িয়ে আছে যে

তাজমহল, তার কাছে আসতেই কবির দৃষ্টির সামনে একটি নূতন চিন্তা-লোকের দরজা খুলে গেছে। তিনি বলছেন,

ঐ তব তীরে, শুভ্র শরীরে, দণ্ডায়িত গৃহরাজ ও,  
যার সমুদ্রে, দিক দিক হইতে, কর্ষে মনুজ-সমাজ ও।  
অহো কত কাল, রবে এ বিরাজিত, তটিনী তব তট ভূষি ও,  
ভূষণ হইয়া, তব তটনীরে, ব্যঞ্জিতে মনো অভিলাষে ও !  
কত নব-পঙ্করে, নির্মল উহারে, শোষি শোণিতধারা কোষে ও,  
দর্শাইতে সব দর্শক জনে, প্রমদা-গৌরব শেষে ও !

প্রমদা-গৌরব-প্রতিষ্ঠার জন্তে এবং তার ভেতর দিয়ে আসলে আপন অহংকাব-প্রতিষ্ঠার জন্তে কোটি কোটি দবিদ্রের বক্ষ-পঙ্কবে নির্মিত তাজমহল নামক বিবাত শোক-নাট্যেব অন্তর্নিহিত প্রহসনকে এমন করে আর কেউ উদ্ঘাটিত করেছেন কিনা সন্দেহ।

গোবিন্দচন্দ্রের আর একটি প্রসিদ্ধ কবিতা প্রায় সকলেবই কর্ণস্থ। কিন্তু তাব রচয়িতার নাম অনেকের জানা নেই। সে হচ্ছে ‘হিন্দুমেলা’র গান,

কতকাল পবে বলা ভারত বে,  
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।  
অবসাদ-হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে,  
ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে।  
পরো দীপমালা নগরে নগরে,  
ভূমি যে তিমিরে, ভূমি সে তিমিরে ॥

মনে রাখতে হবে, কংগ্রেসের তখন শৈশব, দেশের জনসাধারণের মনে জাতীয়তা-বোধ তখনো স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ কবে নি। শিক্ষিত সমাজের জাতীয় আন্দোলন তখন সীমাবদ্ধ রয়েছে আবেদন-নিবেদনে। শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত যুবক ইতস্তত মরচে-পড়া তলোয়ার নিসে ছোট ছোট গোপন সভা করছেন এবং প্রকাশ্যে করছেন হিন্দুমেলায় অহুগান! সেই অবসাদ-হিমের অন্ধচ্ছ অন্ধকারে কবি কঁদেছিলেন অকপট প্রাণের কান্না, যার সমান আন্তরিকতা হেমচন্দ্রের ‘ভারত তিষ্ঠা’য় বা নবীন সেনের ‘পলাশীর যুদ্ধে’ পাওয়া যাবে না।

হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করে অপরাপর কবির লেখাতেও অবশ্য স্বাদেশিকতার সুর বেজেছিল। ঢাকার কবি দীনেশচরণ বহুর ‘কবিকাহিনী’তে, শিবনাথ শাস্ত্রীর স্বদেশী গানে, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘মিলে সব ভারত-সম্মান’ গানে



ক্ষীণভাবে একটা জাতীয় চেতনাব আমগনী শোনা গিয়েছিল। পবিত্র কালের বশ্মে মাতবন্-আন্দোলনে হঠাৎ যখন সমগ্র ভারত জুড়ে দেশান্ত্রবোধে বহা এসেছিল, তখন এই সব প্রাথমিক কলকাকলী ছাড়া দেশেব প্রাণ-বাণী-প্রকাশের আব কোনো ভাষা ছিল না।

## ববীন্দ্রনাথ

ববীন্দ্র-কাব্যেব বিস্তারিত আলোচনা এত অল্প পবিসংবে কবা সম্ভব নয়। মাইকেলী কাব্যেব বহিঃপ্রবন্ধ ও বিচারীলাল প্রমুখ কবিব হাত দিয়ে ক্রমে ক্রমে অন্তর্মুখিতাব দিকে ঝোড় ফিবেছে, এ আমবা আগেই দেখিয়েছি। তবু সে ববুদেবের পূর্ববর্তী একটি অকণালোকিত মুহূর্ত ম'ত। ববিব পবিপূর্ণ কিবণ-সম্পাতের পব তা দিগন্তে বিনীন হয়ে গেছে।

তাবপব থেকে সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী কাল বাংলাব সাহিত্য-ভুবন আলোকিত, উদ্ভাসিত ও সঞ্জ'যিত হয়ে বয়েছে শুধু ববাব্দ্রনাথের একক জ্যোতিত। ববীন্দ্রনাথের মতো অতি-মাতুদী প্রতিভাব আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাসে একটি আকস্মিক ঘটনাব ম'ত। দেশেব প্রচলিত সাহিত্য-ধাবাব ক্রমপবিণতি হিসাবেই এত বড় প্রতিভাব বিকাশ হয় নি।

অবশু ববীন্দ্রনাথ পুবানো ঐতিহ্যেব প্রভাব নেই এমন নয়। তাঁব গানে বাংলা বৈষ্ণব ও বাউল গানেব ছায়া আছে। কান্তাপ্রেমেব কবিতায় ও গানে আছে মধ্যযুগীয় মবমিষাদেব বচনাব প্রতিধ্বনি। শকালংকাবগয স্বভাবোক্তিব কবিতায় ক্লাসিকাল সংস্কৃতেব অমুসবণ আছে। পাবনার্থিক কবিতায় উপনিষদেব স্পর্শ আছে। (কিন্তু সবচেয়ে যেটা বড় কথা, ববীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতির সঙ্গে হৃদয়-সম্পর্কেব যে লীলা, তা কবি দেশীয় ঐতিহ্য থেকে পান নি, পেয়েছেন পাশ্চাত্য কাব্য থেকে। যে 'Creative-Evolution তাঁব জগৎ, জীবন ও প্রেম-সম্বন্ধীয় কবিতাব প্রধান অবলম্বন, তা-ও তিনি পেয়েছেন পাশ্চাত্য দর্শন থেকে। তাঁব গাথা-কবিতায় এবং বর্ণনাম্বক কবিগাথ টেনিসদানবও প্রভাব দেখা যায় অল্প-বিস্তব।)

অবশু ববীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে প্রভাবেব কথা অবাস্তব। নানা দিগ্দেশেব নানা ধাবা তাঁতে এসে মিশলেও, সব কিছুব সমবায়ে তাঁব মনোর্থ্য এবং জীবন-দর্শন অপূর্ব একটি স্বকীয়তা আহবণ কবেছে। শুধু একটা কথা বলে বাখা দবকার যে, ববীন্দ্রনাথের অধিকাংশ লিখিক কবিতাব আবেদনই নৈব্যক্তিক।

ড্রাইনিঙ বা শেলী'র তীব্র আত্মকেন্দ্রিকতা তাতে নেই। রবীন্দ্র-কাব্যের শাস্ত্রিক ব্যঞ্জনাই সব চেয়ে বড় জিনিস এবং এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ কবি আব দেখা যায় নি।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্যকে মোটামুটি চার অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। 'মানসী' ও 'সোনার তরী'র অধ্যায়, 'চিত্রা', 'চেতানী' ও 'নৈবেদ্য'র অধ্যায়, 'বলাকা', 'পূবরী' ও 'মহা'র অধ্যায় এবং 'জন্মদিন', 'বোগশয্যা' ও 'আবোগ্যে'র অধ্যায়। প্রথম অব্যাহত কবি প্রকৃতি ও প্রেমের পূজারী। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি নিঃশেষে নিবেদন করেছেন নিজেকে জীবন-দেবতার কাছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি অমৃতত্ব কবেছেন এক আনন্দময় অতিব্যক্তির লীলা। আর শেষ অধ্যায়ে বঞ্চিত মানুষ ও পার্থিব বেদনা তাঁকে নাড়া দিয়েছে।

### রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবি

রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবির অভাব ছিল না। তাঁদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস। তাঁর কবিতায় বঙ্গাহান আরেগে অস্তব উজাড় করে দেবার অনায়াসতা বিশেষভাবে লক্ষ্যীয়। বাছাই করা ভাব ও শব্দ নিয়ে ভক্ত, পবিত্র ও সংহত বাঁতিব কবিতা বচনা তার ধাতুতে ছিল না। সেই জন্মেই তিনি এমন সমস্ত উজ্জ্বল পঙ্ক্তি নিয়ে এত অবাধে খেলা করে গেছেন,

আমি বালিকা খেলবি যদি এ এক নূতন খেলা।

তোমার সঙ্গে গেলে ছাই,

সকাল আসত তুল হয়ে যায়,

তমের মরি ফিবতে একা, সবুজ সঙ্কে বেলা।

চুপ চুপ চুপ, কসনে কাবেও, এ এক নূতন খেলা।

নয়ত,

তবলতা ঘুম যায়, ঘুম যায় ফুল,

পল্লবের কোলে কোলে ঘুমায়ে মুকুল।

আকাশে হেলান দিয়ে ঘুমায়ে পর্বত,

সমুদ্রে সমুদ্র পাতা মহাশয্যাবৎ।

নিবাসের নিষ্পেষিত মহা মকতুমে,

কত বক্ষ অস্থি-চূর্ণ আছে ঘোব ঘুমে।

ঘাসে ঘাসে ঘুম যায় কত অশ্রুজল,  
সৈকতে শোকের খাস ঘুনেতে বিহ্বল।  
দিকবন্ধ শ্যাম মাঠ, অনিবন্ধ নীবি,  
স্থলিত অঞ্চল অঙ্গে ঘুমায়ে পৃথিবী।

অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য উপযুক্ত সংযম ও মাত্রা-জ্ঞানের অভাবে তাঁর কবিতা খুব শিষ্ট হয় নি। কবি সাংসারিক জীবনে শাস্তি লাভ করেন নি। ব্যক্তিগত জীবনের সেই বিষাক্ত বাস্তবতা কবিকে এত বেশী অভিভূত করেছিল যে, তাঁর সনগ্রহ দৃষ্টিভঙ্গিই যেন কেনন এমটা গম্ভীর আতিশয্যে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর বচনায় স্বতঃস্ফূর্ত বাস্তবতাব সঙ্গে সহজ প্রশান্তি নেই, দ্বিধোভেব সঙ্গে গাঢ় বিরুদ্ধতাব সংযোগ হয়েছে, তাই তিনি এত বড় কবি হয়েও জনপ্রিয় হতে পারেন নি।

অক্ষয় বড়ালে ভাবের ঐশ্বর্য এবং ভাবের শুচিতা অসাধারণ, যদিও তাঁর লেখাষ ধূহুভূর্ত্তব উত্তমতা নেই। অক্ষয় বড়াল হলেন সংযত আবেগের কবি। তাঁর ভাষা পরিচ্ছন্ন, ভাব নিম্নল, কিন্তু বলাবোধ্য খুব জীবন্ত নয়। গোবিন্দ দাস বে-পরোয়া যৌবনের কবি, ঐশ্বর্য ও শাস্তিব ধাবও দাবেন না। তাঁর প্রসিদ্ধি লাইনে আবেগের প্রমত্ত রূপ। পত্নী-বিয়োগে ব্যথিত হলে উভয়েই কবিতা লিখেছেন। কিন্তু অক্ষয় বড়ালের 'এষা' এবং গোবিন্দ দাসের 'কস্তুরী'র সনেটগুলি পাশাপাশি বেখে পড়লেই বোঝা যাবে, দু-জনে তফাৎ কোথায়। অবশ্য অক্ষয় বড়ালও সাধারণ কবি নন, বর্দমান-সমসাময়িকদের মধ্যে তাঁর একটা নিঃস্ব উঁচু স্থান আছে। একটু দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক,

এসো এ হৃদয়ে মম,                      অশ্রুট চন্দ্রিকা সম,  
এসো প্রেমে, স্নিগ্ধ ককণায,  
ঢেকে দাও সব ব্যথা,                      অসমতা অক্ষমতা,  
ছড়ায় জড়ায় মমতায়।  
লায়ে প্রেমস্থধা হাসি,                      এসো দেবী এসো দাসী,  
এসো সখী, এসো প্রাণপ্রিয়া,  
সব স্বপ্ন-দুঃখ ঘুবে,                      ও ন্য-মৃত্যু ভেঙে চূবে,  
স্থিতি-স্থিতি-প্রণয় ব্যাপিষা।

অক্ষয় বড়ালের রচনাব এই শাস্ত্র শুচিতা ও গাঢ়তা ভাবের সহজ অভিব্যক্তি সকলেরই ভালো লাগে। বিহারীলালের মন্থনিষ্ঠা হয়েও বচনভঙ্গিতে তিনি

খানিকটা ক্ল্যাসিকাল, আবার রবীন্দ্রনাথ থেকেও এই খানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। প্রিয়াকে তিনি বিশ্ব-মানবী বা আদর্শনারী-রূপে দেখেন নি। এষা কাব্যের সূচনায় তিনি বলেছেন, ‘মানবীর তরে কাঁদি, চাহিনা দেবতা’ এবং প্রিয়ার লোকান্তর-প্রাপ্তিতে তিনি মৃত্যুর নির্বিশেষ রূপ দেখেন নি, তার মাধুর্যও অম্লভব করেন নি। তিনি ভেবেছেন,

পতি নাই, পুত্র নাই, অতি অসহায়,  
সকল বন্ধন ছিঁড়ে, পাগলিনী কোথা ফিরে,  
অনলে অনিলে শূন্যে, কোথায় কোথায় !

পদ্মাतीরে বেল কাঠ মাথায় চিতা-শয্যায় শায়িতা প্রিয়ার স্মৃতিতে উদ্ভাস্ত গোবিন্দ দাসের উচ্ছ্বসিত কান্না এ নয়, আবার মৃত্যু-মহোৎসবের তেতর দিয়ে চিরন্তন অমরছে অতিথিতা প্রিয়ার স্মৃতিতে আশ্রস্ত রবীন্দ্রনাথের নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বদৃষ্টিও এ নয়। এ হল সেই সুগভীর বেদনার অভিব্যক্তি, যা সবজনের সহজ অহুভূতি।

এর পর উল্লেখযোগ্য কবি দেবেন্দ্রনাথ ষেন। দেবেন্দ্রনাথ সেনে গোবিন্দ দাসের বাঁধন-ছেড়া আবেগ নেই, অক্ষয় বড়ালের সমাহিত স্নিগ্ধতা নেই, তার স্থানে আছে প্রবীণতার প্রসন্ন পীতাম্ব। অক্ষয় বড়ালের মতো শব্দপ্রয়োগের জহরীপনা তাঁর নেই। গোবিন্দ দাসের মতো ভাব ও ছন্দ নিয়ে ছিনিমিনি-খেলার অজস্রতাও নেই। তক্তিবিনম্র আন্তরিকতার গুণেই তিনি রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট কবি। দেবেন্দ্রনাথকে ‘সোনার তরী’ উৎসর্গ করে রবীন্দ্রনাথও এই সিদ্ধান্তই অম্লমোদন করেছেন। একটু নিদর্শন নেওয়া যাক,

অপূর্ব রূপসী মরি তোমার মুখর চাহনিতে  
থাকে স্তম্ভ হৃদয়ের কথা,  
প্রথম কান্ধনে যথা থাকে চাপা চাঁপার কলিতে  
বসন্তের পূর্ণ মাদকতা।  
বাল বিধবার যথা অতি নুহ মলিন হাসিতে  
থাকে চাপা বোর আকুলতা,  
শেফালী ইঙ্গিতে যথা বলি যায় ঝরিতে ঝরিতে  
আপনার সৌরভ বারতা !

সুন্দর নয় কি ? এই রকম সুন্দর পঙ্ক্তি দেবেন্দ্র সেনের কবিতায় রাশি  
বাশি পাওয়া যাবে। ঠিক এমন সুন্দর,

মুক্ত মেঘ-বাতায়নে বাস,  
এলোকেশী কে ঐ রূপসী,

জল-যন্ত্র ঘুরায়ে ঘুরায়ে  
জলরাশি দিতেছে ছড়ায়ে।

নীলবর্ণ শাড়ীখানি পরি

অপূর্ব মল্লার বাগ ধরেছে সুন্দরী।

শ্রুত কেশদাম হতে বেলফুল চৌদিকে ঝবিছে,

কালোরূপ কাটিয়া পড়িছে।

যাই বলিহারী।

দেবেন সেনের কতকগুলি সনেটও চমৎকার। বাংলা ভাষায় সনেট প্রবর্তন করেন মাইকেল। তাঁর পর রবীন্দ্রনাথ, গোবিন্দ দাস, চিত্তরঞ্জন, অনেকেই সনেট লিখেছেন। কিন্তু খাঁটি ইটালীয়ান চণ্ডে Octave এবং Sestet বজায় রেখে লখিত পূর্বের সনেট প্রথম দেবেন সেনই লিখেছেন। আর তাঁর পূর্বে লিখেছেন মোহিতলাল মজুমদার এবং আরো কোন কোন আধুনিক কবি। দেবেন সেনের সনেটগুলির মধ্যে ‘নয়নে নয়নে কথা ভালো নাহি লাগে,’ ‘চাহি না আনার যেন অভিমানে কুব’ প্রভৃতি যে-কোন কাব্যরসিকেরই মনোহরণ করবে। ‘ডাঘমণ্ডকাটা মল,’ ‘বিধবাব আরশি’ প্রভৃতি কবিতাগুলোকে তাঁর কবি-কীর্তির নিদর্শন-রূপে খাড়া করে না তুলে, এই সনেটগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কবির প্রতি অনেক বেশী স্তুতিচার করা হবে।

গোবিন্দচন্দ্র দাস, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, এই তিনজন কবির কাব্য-ধর্ম নিয়ে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা হল। প্রথমে ‘কুহুম,’ ‘কস্তুরী,’ ‘বৈজয়ন্তী,’ ‘ফুলরেণু,’ দ্বিতীয়ের ‘শব্দ,’ ‘এষা,’ ‘কনকাজ্জলি,’ ‘প্রদীপ,’ তৃতীয়ের ‘অশোকগুচ্ছ,’ ‘গোলাপগুচ্ছ,’ ‘শেফালীগুচ্ছ,’ ‘অপূর্ব নৈবেদ্য’ প্রভৃতি রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিতা-সংগ্রহগুলির বিস্তৃততর আলোচনা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় আজো রসিকজন সেনদিকে বিশেষ মনোনিবেশ করেন নি।

এই তিনজনের পর আসেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দ্বিজেন্দ্রলালও প্রথম শ্রেণীর কবি। কিন্তু তাঁর বেশির ভাগ শক্তিই নিয়োজিত হয়েছিল নাটক, গান

এবং হাসির গান-রচনায়, যা নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে। ‘মল্ল’, ‘আলেখ্য’, ‘ত্রিবেণী’ প্রভৃতি বইয়ে তাঁর যে লিরিক কবিতাগুলো সংগৃহীত হয়েছে, তাব ভেতর তালো কবিতার অভাব নেই। গভীরের সঙ্গে তরল সুরের মিশাল দিয়ে, তিনি আশ্চর্য রসসৃষ্টি করেছেন অনেক কবিতায়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ যে মুক্ত-ছন্দ (Vers libre) ‘বলাকা’র প্রথম ব্যবহার করেন, ভাঙাচোবা ভাবে তার প্রাথমিক আভাস দিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালই। যেমন,

এসেছো তুমি,  
বসন্তের মতো স্নিগ্ধ,  
... ..  
কহু ভাবি মনে, তুমি নহ শীত ধবণীব।  
কোন সূর্যলোকে হতে থসি,  
নন্দন কিবণে  
লালিত লালিত এক অমর স্বপন।

দ্বিজেন্দ্রলালের ‘ঘুমন্ত শিশু’, ‘হাসি ও অশ্রু’, ‘সমুদ্র’, ‘বাইবান্নের প্রতি’ প্রভৃতি কবিতা বা পদ্য-বিশোধের কবিতাগুলি এক সময়ে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল সারা দেশে।

## অন্যান্য কবি

রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিদের মধ্যে নিত্যকৃষ্ণ বসু, অক্ষয়কুমার চৌধুরী, ‘অবসর’ কাব্য-রচয়িতা বরদাচরণ মিত্র, ‘বেলা’, ‘পরিমল’ প্রভৃতির কবি গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, ‘মন্দির’ কাব্যের লেখক কিরণচাঁদ দরবেশ, ‘যজ্ঞ-ভস্ম’-রচয়িতা বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির কবিতায় বেশ একটু স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘প্রতিধ্বনি’ বা রজনীকান্ত সেনের ‘বাণী’ ও ‘কল্যাণী’কেও এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। উল্লিখিত কবিদের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের ‘ধূতুরা ফুল’, ‘অন্ধকার’, বরদাচরণ মিত্রের ‘আলোক’, ‘অন্ধকার’, ‘সুপ্তোখিতা’, দরবেশের ‘উর্বশী ও পুরুষবা’, গিরিজানাথের ‘মধ্যাহ্ন’, ‘হে মরণ’, বিজয়চন্দ্রের ‘লক্ষ্যপথে’ প্রভৃতি কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাশে আজ হয়ত নিম্নত দেখায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দেশের সাহিত্যে সর্বাঙ্গীণ ভাবে বিস্তার লাভ করার আগেই এদের

জন্ম। সে হিসাবে এই সব কবির সৃষ্টিকে একেবারে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।  
নিত্যকৃষ্ণ বসু এবং অক্ষয় চৌধুরীরও বহু প্রথম শ্রেণীর কবিতা আছে। অক্ষয়  
চৌধুরীর,

ডাগর ডাগর                      স্কুটেছে টগর  
গোলাপ প্রলাপ বাড়ায় মনে,  
কামিনীর ফুল,                      হেসেই আকুল,  
কেতকী কত-কি ছলনা জানে।  
আমার হৃদয়                      আমারি হৃদয়,  
বেচিনি ত তাহা কারুর কাছে,  
ভাঙা-চোরা হক,                      যা হক তা হক,  
আমার হৃদয় আমারি আছে !

ইত্যাদি কবিতা এক সময় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আদর পেয়েছিল। ছুংথের বিষয়,  
নিত্যকৃষ্ণ বসু বা অক্ষয় চৌধুরীর রচনা মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত  
হয় নি। নিত্যকৃষ্ণ বসুর ‘সাহিত্যসেবকের ডায়েরী’ বইখানিও আজ বিলুপ্ত।  
অথচ এই বইটি সমসাময়িক জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য  
পূর্ণ। প্রিয়নাথ সেন এবং বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাও সুখপাঠ্য, কিন্তু তাঁরা  
প্রধানত গল্প-লিখিষে এবং গড়েই তাঁদের শক্তিব পূর্ণতর বিকাশ হয়েছে।

এর পর থেকে ক্রমে রবীন্দ্র-ধারার অমুসরণই বাংলা কবিতাব একমাত্র  
অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। এক নিঃশ্বাসে নাম কবে যাওয়া যায়—ভূজঙ্গধর  
রায়চৌধুরী, রমণীমোহন ঘোষ, জগদীন্দ্রনাথ রায়, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী,  
চিত্তরঞ্জন দাশ, দেবকুমার রায়চৌধুরী, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে।  
এঁদের ভাষা, ভঙ্গি, বক্তব্য, সবই রবীন্দ্রনাথ থেকে আহৃত। ভূজঙ্গধরের  
কয়েকটি বৈষ্ণব কবিতা, প্রমথ রায়চৌধুরীর ‘ভাজমহল’, চিত্তরঞ্জনর ‘সাগর-  
সঙ্গীতের’ দু-চারিটি ছত্র বা ‘মালধের’ কোন কোন সনেট এবং নবকৃষ্ণ  
ভট্টাচার্যের ছেলেদের জন্তে লেখা ‘টুকটুকে রামায়ণ’ ছাড়া এই পর্যায়ের আর  
কোন রচনার কোন উচ্চ সাহিত্যিক মূল্য আছে কিনা সন্দেহ।

রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে কয়েকজন মহিলা-কবির এবং কয়েকজন  
মুসলমান কবির নামও উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘মধ্যাহ্ন’, ‘প্রভাত’  
প্রভৃতি হালকা সুরের বর্ণনামূলক কবিতা বা কয়েকটি গাথা-কবিতা বেশ সুখপাঠ্য।  
কামিনী রায়ের ‘আলো ও ছায়া’য়, গিরীন্দ্রমোহিনীর ‘অশ্রুকাণ’য়, মানকুমারী

বহুর ‘কাব্য-কুসুমাজ্জলি’তে কিছু কিছু উপভোগ্য কবিতা পাওয়া যাবে। এঁদের বা প্রসন্নময়ী দেবীর, তাঁর কন্যা প্রিয়ম্বদা দেবীর, বা প্রমীলা নাগ, ইন্দিরা দেবী প্রভৃতির কবিতা এক সময় অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এক প্রিয়ম্বদা দেবী ছাড়া এঁরা সকলেই হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রকে আদর্শ-রূপে গ্রহণ করেছিলেন। কায়কোবাদ কবির ‘মহাশ্মশান’ এবং সৈয়দ হোসেনের ‘শিবমন্দির’, ‘যমজ ভগিনী’ প্রভৃতি কাব্য অবশ্যই বিস্তৃততর আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

## আধুনিক কবি ও কবিতা

রবীন্দ্রশিষ্য-রূপে পরিচিত কবিরাই ধীরে ধীরে কাব্যের বিষয় ও আঙ্গিক উভয় দিকে নূতনত্ব-আমদানির প্রয়োজন অনুভব করেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় প্রমুখ কবির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দেশ-বিদেশের কবিতার অনুবাদ করেই সব চেয়ে বেশী খ্যাতিমান হয়েছেন। তাঁর ‘তীর্থসলিল’ ও ‘মণি-মঞ্জুষা’ দু’খানি উল্লেখযোগ্য বই। বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহারে এবং রকমারি তথ্যবস্তুকে কাব্যায়িত করার তাঁর অসামান্য দক্ষতা। করুণানিধান মিস্ট্রি সুরের স্বপ্নবিহ্বল কবি গণ লিখেছেন। ‘ঝরা ফুল’, ‘শান্তিজল’ তাঁর উল্লেখযোগ্য বই। যতীন্দ্রমোহন বাগচী এবং কুমুদরঞ্জন উভয়েই প্রধানত পল্লীকবি। বঙ্গপল্লীর সুখ-দুঃখ, শোভা-সৌন্দর্য তাঁদের রচনায় মনোরম হয়ে রূপ পেয়েছে। প্রথমে ‘লেখা,’ ‘রেখা,’ ‘নাগকেশর’ এবং দ্বিতীয়ের ‘উজ্জানী,’ ‘বন-তুলসী,’ ‘অজয়’ প্রশংসনীয় লেখা। কালিদাস রায় পুরানো ক্লাসিক্সের আদর্শে লিখেছেন ‘ঋতুমঞ্জল,’ বৈষ্ণব কবিতার আদর্শে ‘ব্রজবেণু’ এবং এই দুই দিকের কবিতাই তাঁর সব চেয়ে বিশেষত্বপূর্ণ। এছাড়া আধুনিক সুরের কবিতাসংগ্রহ ‘হৈমন্তী’ও তাঁর উল্লেখযোগ্য বই।

এঁরা কিন্তু সকলেই ভাষা ও শব্দপর্যায় গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে। জীবন-দর্শনও এঁদের আলাদা নয়। নূতন দর্শন ও নূতন কাব্য-ভাষা নিয়ে দেখা দিলেন অন্তত তিনজন কবি, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল ইসলাম। এঁরাই বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন।

মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের দেহাতীত কল্প-কামনার পরিবর্তে রক্তমাংসময় বাস্তবের ক্ষুধা-তৃষ্ণাকেই বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর ‘বিশ্বরঙ্গী’ ও



‘স্মরণরত্ন’ বিখ্যাত বই। যশীন্দ্র সেনগুপ্ত বনীন্দ্রসাহিত্যেব আনন্দবাদকে কঠিন হাতে আঘাত কবেছেন। সৃষ্টিব স্তরে স্তবে যত বেদনা, যত বন্ধনা, তাকেই তিনি ব্যক্ত কবেছেন তাঁর ইঞ্জিনীয়াব-মূলত গ্রন্থিবহল ভাষায়। এই সঙ্গেই তাঁর লেখায় আছে শাণিত বিদ্রুপেব ছোঁয়া। ‘মকশিখা’, ‘মবীচিকা’, ‘মক্সামা’ ও ‘সায়ম্’ কাব্যে তাঁর সর্বোত্তম কবিতাগুলি গ্রথিত হয়েছে। এ দু-জনের তুলনায় নজরুলে কবি-প্রতিভা অগতীব, যদিও যৌবনবেগ ও জীবনোত্তাপে তাঁরই অগ্রগণ্য আসন।

এই কবিত্রয়ের, বিশেষত শেষ দু-জনের দৃষ্টি সমাজের সর্বাধিকাব-বঞ্চিত সাধাবণ মানুষদেব দিকে প্রথম আকৃষ্ট হয়েছে, যার মধ্যে সমতর্জ কল্পনা-বিলাস নেই, আছে বিদ্রোহেব বাণী। নজরুলেব ‘অগ্নিবীণা’, ‘দোলন চাপা’, ‘ফণী-মনসা’ প্রসিদ্ধ বই।

এই সঙ্গে কিরণদন চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রলাল বায়, হুবেশচন্দ্র চক্রবর্তী, অপবাজিতা দেবী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, জসিমউদ্দীন প্রভৃতি কবিব নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু বর্তমান শতাব্দীব তৃতীয় দশক থেকে বাংলা কাব্য সাহিত্যে এল নূতন একটি যুগ-চেতনা। কাব্যেব বিষয়বস্তু ও প্রকাশ-ভঙ্গি উভয় ক্ষেত্রেই প্রচলিত ঐতিহ্যেব বিবোধী হয়ে উঠলেন কতক কবি এবং এক দিকে যেমন তাঁরা গদ্য ও পদ্যেব মাঝখানকার ভাষাগত দূর্বল মুছে ফেলাব জন্তে চেষ্টা কবতে লাগলেন, অন্যদিকে তেমনি আবেগ-প্রাধাত্যেব স্থানে আনতে চাইলেন বুদ্ধি-প্রাধান্য। কতক কবি অবশ্য যুগ-চেতনাকে স্বীকাব কবে নিষেও ঐতিহ্য-বিবোধী হলেন না।

এই দুই পর্যায়েব কবিহাই সাধাবণ ভাবে আধুনিক কবিতা নামে পরিচিত। এঁদেব মধ্যে জীবনানন্দ দাশ (মহাপৃথিবী ও ধূসব পাণ্ডুলিপি), প্রেমেন্দ্র মিত্র (প্রথমা, ফেরাবী ফোজ), বুদ্ধদেব বসু (বন্দীব বন্দনা, কঙ্কাবতী), অজিত দত্ত (পাতাল-কচ্ছা) এক দিকেব এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (কন্দলী, সংবর্ত), অমিষ চক্রবর্তী (খসড়া, পালাবদল), বিষ্ণু দে (চোবাবালি), স্মভাষ মুখোপাধ্যায় (পদাতিক), সূকান্ত ভট্টাচার্য (ছাডপত্র) অন্য দিকেব প্রশংসিত কবি। এছাড়া মনীষ ঘটক, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দিনেশ দাস, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অশোকবিজয় বাহা, হবপ্রসাদ মিত্র, নীরেন চক্রবর্তী, মণীন্দ্র বায়, শুক্লসত্ত্ব বসু প্রমুখ কবিও প্রতিভাব পরিচয় দিয়েছেন।

## চতুর্থ অধ্যায়

### গান

ইতিপূর্বে বহু শাখায় বিতরুণ প্রাচীন গীতি-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা কবেছি এবং তাতে দেখিয়েছি যে, এক-একটা ধর্ম সম্প্রদায়ের আওতায তাদের এক-একটি শাখার উদ্ভব হয়েছে। সেই সঙ্গে এ কথাও বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ মিলন-বিরহকে ধর্মের রূপকে আড়াল করে প্রকাশ করাই ছিল তখনকার রীতি। কিন্তু শিক্ষিত সমাজের বাইরে জনসাধারণের ভেতর যে সব গান জন্মেছে, বাউল, ভাটিয়ালী, মুর্শিদা প্রভৃতি পল্লীসঙ্গীত, তাতে এই প্রচলিত প্রসিদ্ধির অমুসরণ দেখা যায় না। রচনা-পদ্ধতিতেও সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের বাঁধা বুলি আবৃত্তি করার চিহ্ন নেই সে সব গানে। এছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে মানবিক প্রেমকে স্বীকার করে নেবার একটা প্রয়াস এসেছিল রাম বসু, নিধুবাবু প্রভৃতিতে; কিন্তু তা পূর্ণতা লাভ করে নি।

ইংরেজী আমলে দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবন-নীতি যখন আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল, তখন দেশের সাহিত্যদর্শণও প্রাচীন সাহিত্যের ধারা অস্বীকার করে নবযুগের প্রেরণায় রূপান্তরিত হতে লাগল। এযুগের গীত-সাহিত্যে যুগধর্মের এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ধর্মসঙ্গীতের স্থানে এযুগে এল ব্রহ্ম-সঙ্গীত, দেব-দেবী-সঙ্গীতের স্থানে এল স্বদেশী সঙ্গীত, প্রকৃতি ও প্রেম নিয়ে রচিত হল নূতন প্রেম-সঙ্গীত। এছাড়া এল কৌতুক-সঙ্গীত, নৃত্য-সঙ্গীত, আরো রকমারি গান।

রামমোহন রায়, বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, মনোমোহন বসু, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, বহু কবির সম্মিলিত দানে আধুনিক বাংলা গানের ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে। এঁদের পরও গানের ধারা অব্যাহত বেগে চলেছে। তার মধ্যে নজরুল ইসলাম ও অতুলপ্রসাদ নিঃস্বতার পরিচয় দিয়ে যশস্বী হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ, বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্তের স্বদেশী গান, বিজেন্দ্রলালের হাসির গান, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের

গান এবং নজরুল ইসলামের গজল গান ঘরে ঘরে প্রচার লাভ করেছে। আজকের গীতকারদের ওপর এঁদের, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অসাধারণ। দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা গানে প্রথম ইংরেজী সুর সংযোজন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত করেছেন নানা মিশ্রসুর। দেশী কীর্তন ও বাউল এবং ক্র্যাসিকাল সুরের সঙ্গেই তিনি বিদেশী সুরও এনেছেন প্রচুর।

### রামমোহন রায়

আধুনিক বাংলা গান প্রাচীন গান থেকে বিষয়, বিজ্ঞাস এবং সুর, তিন দিক থেকেই সম্পূর্ণ আলাদা। এই পার্থক্যেব প্রথম নিদর্শন হল ব্রহ্ম-সঙ্গীত। উপধর্ম-প্রদীড়িত বাংলা সাহিত্যে ভগবৎ-সঙ্গীত নূতন জিনিস নয়, কিন্তু ভগবৎ-স্বরূপ উপলব্ধি করার যে নূতন দৃষ্টি দেশে আসে ব্রাহ্মধর্ম থেকে, ব্রহ্ম-সঙ্গীতে তাকেই পাওয়া গেল নূতন করে। ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন বায়ই প্রথম ব্রহ্ম-সঙ্গীত রচনা করে বাংলা গানের শ্রোতাকে এই দিকে ফিরিয়ে দেন। রামমোহন রায়ের গানের কোথাও কাব্য-স্বপ্নমা নেই। নিছক নির্বিশেষ তত্ত্বকথাকে তিনি রূঢ় বৈদান্তিক ভাষায় ছন্দোবদ্ধ করেছেন। যেমন,

একদিন হবে যদি অবশ্য মরণ।

এ ত দম্ভ অহংকার কব কি কারণ।

এই যে মানবদেহ,

যারে এত কর স্নেহ,

ভগ্নসার হবে তাব মস্তক চরণ ॥

কিংবা,

মন বে মনে কর শেষের সেদিন ভয়ংকর।

অন্তে কথা কইবে কিন্তু তুমি রৈবে নিরুত্তর।

বলা বাহুল্য, রসিক মনের পক্ষে এ সব সঙ্গীত নিতান্তই গুরুপাক। সোভাগোর বিষয়, ঠাকুর-ভাস্কর্য, চিরঞ্জীব শর্মা, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ কবিরা পরবর্তী কালে রামমোহন-প্রবর্তিত এই তত্ত্বসঙ্গীতের কঙ্কালে রস-রক্ত সংযোজন করে তাকে সজীব করে তোলেন। সত্যিকার ব্রহ্ম-সঙ্গীতের জন্ম এই সময় থেকে এবং এঁদের পর খ্যাত-অখ্যাত বহু কবিই ব্রহ্ম-সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। ‘ব্রহ্ম-সঙ্গীত’ বইয়ে এই সব গান সংগৃহীত হয়েছে।

‘এই বিশ্ব-মাঝে যেখানে যা সাজে’, ‘মন চলো নিজ নিকেতনে,’ ‘অস্তর-দেবতা তিনি’, ‘গাও রে তাঁহার গুণগান’, ‘ভূমি আমাদের পিতা’ প্রভৃতি গান নিশ্চয় অনেকে শুনেছেন। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, সাহিত্য-সম্পদে এরা প্রাচীন সঙ্গীত থেকে অনেক বেশী পশ্চাৎগামী। তার কারণ বোধ হয় এই যে, রচয়িতারা যত বড় ব্রাহ্ম ছিলেন, তত বড় কবি ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে সেই অসম্পূর্ণতা দূর হল। তাঁর হাত দিয়ে যে ব্রাহ্ম-সঙ্গীত এল, তা প্রথমত সঙ্গীত, তারপর ব্রাহ্ম-জিজ্ঞাসা।

গীতাঞ্জলি, গীতালী, গীতিমালা ইত্যাদি গানের বইয়ে রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম-সঙ্গীত সংকলিত হয়েছে। কিন্তু একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম-সঙ্গীতকে প্রেম-সঙ্গীত বা প্রকৃতি-সঙ্গীত রূপে নিতেও বাধা হয় না। জ্ঞান-পষা এবং ভক্তি-পষা দুইয়ের সঙ্গেই তাতে মিশ্রণ হয়েছে জাগ্রত কবি-কল্পনার।

### স্বদেশী আন্দোলন

স্বদেশীয়ানা বাংলা সাহিত্যে এসেছিল ঈশ্বর গুপ্ত দিয়ে এবং মাইকেল, রঙ্গলাল, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকরা প্রধানত দেশপ্রেমকেই তাঁদের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান প্রেরণা-রূপে নিয়েছিলেন। বঙ্কিম লিখেছিলেন বন্দেমাতরম্ গান এবং এই গানে বাংলা ও বাঙালীর কামনাকে ভাষা দিয়েছিলেন। শান্তগামলা সূজলা সূফলা বাংলা দেশের ওপদ হিমালয়-রুহিতা অন্নদাত্রী জগন্মাতা দুর্গার রূপক আরোপ করে বঙ্কিম এই গান রচনা করেছেন। এ গান হিন্দু বাঙালীর গান, তাতে আর সন্দেহ নেই। রাজনৈতিক কারণে পরে বন্দেমাতরম্ সর্বভারতীয় জাতীয়-সঙ্গীত হয়েছে এবং জাতি, ব্যক্তি ও সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ভাবে সকলের কাছে এর প্রতি বশ্যতা দাবী করা হয়েছে। কিন্তু সে অনেক পরের কথা। বঙ্কিম-যুগের মধ্যপর্বে হিন্দুমেলার উদ্ভোগ হয় এবং তার উদ্দীপনা থেকে বাংলায় প্রথম স্বদেশী গানের প্রবল ঢেউ আসে।

এদিকেও ঠাকুর-ব্রাহ্মবৃন্দের নামই সর্বাগ্রে স্মরণীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের,

মিলে সব ভারত-সন্তান,  
এক তান মন প্রাণ,

গাওরে ভারতের বশেষগান...

অথবা জ্যোতিবিন্দুনাথ ঠাকুরের,

জল জল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ

পরাণ সঁপিয়ে বিধবা বালা...

এক সময়ের উল্লেখযোগ্য গান।

কবি মনোমোহন বসু 'দিনেব দিন হয়ে দীন', কবি গোবিন্দ বায়ের 'কত কাল পবে বস ভাবত বে', দ্বাবকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'না জাগিলে সব ভাবতললনা', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'চাহি না সভ্যতা, চায়া হয়ে থাকি' ইত্যাদি গানও এই সময়ের। স্বানন্দচন্দ্র মিত্র, দীনেশচন্দ্র বসু, সেদিনকার অনেক কবিই হিন্দুমেলায় অমৃতপ্রবণায় দেশাত্মবোধক গান লিখেছিলেন।

এই সমস্ত গানের দু-একটি ছাড়া (যেমন, 'কত কাল পবে' বা 'মিলে সব ভাবত সন্তান') অবিকাংশ বচনাই সাহিত্যের দিক থেকে অসাংস্কৃত। একটা সাধারণ ভাষা যে তখন এবং আত্মমর্সাদ-বোধের প্রকাশ ভিন্ন অল্প কিছু পাওয়া যায় না এদের ভেতর। অর্থাৎ এই সব গানের বচন্যতাবা কেউ সত্যিকার কবি ছিলেন না। তাছাড়া দেশের আবহাওয়ায় সেদিন সত্যিকার দেশাত্মবোধের উদ্দীপনাও ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রেরণা থেকে এসেছিল একটা স্বাধীনতার স্পৃহা, সেই প্রেরণার ফলে দেশের সত্য এবং কল্লিত ইতিহাসের ভেতর দিয়ে দেশবাসীর মন আত্ম-প্রকাশের পথ খুঁজছিল। তাবি কিছুটা অভিব্যক্তি হয়েছে এইসব অপটু বচনায়।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দেশে হঠাৎ যে বাস্তবিক আন্দোলন দেখা দিল, তার প্রেরণার সাহিত্যেও এল নূতন উদ্দীপনা। যে চেতনা ছিল অক্ষুট, ইতিহাসের পাতায় আবদ্ধ, বাস্তব জীবনের সংঘাতে তা উঠল সজীব হয়ে এবং বাংলার চতুর্দশীমা ছাড়িয়ে তা সর্বভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। সে আন্দোলন আমাদের নবনব মাটিকে বিশেষ ভাবে উত্তর করে দিয়ে গেছে। নাটকে-উপন্যাসে, কাব্য-গানে, বাংলা ভাষায় সেদিন এক নূতন সৃষ্টির জোয়ার এসেছিল।

ববীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং বঙ্কনীকান্তের প্রসিদ্ধ গানগুলির জন্ম এই সময়ে। এক বন্দেমাতম্ ছাড়া আমাদের দেশে স্বদেশী সঙ্গীত বলতে যে সমস্ত গান বুঝি, তার সবই এই তিন কবির লেখা। এঁদের পেছনে আবার অনেক কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন, তাঁরাও দেশপ্রেমান্বক গান লিখেছিলেন।

কিন্তু সাধারণ স্বদেশী প্রোপাগান্ডার স্তর ছাড়িয়ে তার বেশির ভাগই সাহিত্যের কোঠায় ওঠে নি। কাব্য-বিশারদের,

বন্দে মাতরম্ বলে,  
যায যাবে যাক প্রাণ চলে।  
বেত মেরে কি মা ভুলাবি,  
আমি কি মাঝে সেই ছেলে ?  
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,  
কে পালাবে মা ফেলে ?

কিংবা অশ্বিনী দত্তের,

তব দ্বাবদেশে এসেছে ভিখারী  
দেহ কৃপা করি কি দিবে তাহায়,  
স্বদেশসেবক এ সব যাচক,  
ভুট্ট হবে তব স্মৃষ্টি কথায়...

ইত্যাদি গান গানই, সাহিত্য নয়।

## রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান ভাষাব ঐশ্বর্যে, অলংকারের প্রাচুর্যে, স্রের বৈচিত্র্যে বাংলা ভাষাব চিবস্থায়ী সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের ‘অগ্নি ভুবন-মনোমোহিনী’, ‘দেশ দেশ নন্দিত করি’, ‘জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে’ বা দ্বিজেন্দ্রলালের ‘ধনধাত্তে পুষ্পে তরা’, ‘যেদিন সুনীল জলধি হইতে’, ‘বঙ্গ আমার জননী আমার’ প্রভৃতি গান শোনেননি বা গাননি, এমন বাঙালীই কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানে আছে পৌরুষের প্রদীপ্ত হংকার, রবীন্দ্রনাথে তার স্থানে আছে শান্তির প্রোজ্জ্বল মহিমা। কিন্তু এই দু-জন কবির কেউ দেশের প্রত্যক্ষ অবস্থার দিকে তাকাননি। দ্বিজেন্দ্রলালের,

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ,  
ওমা তোমার চরণ দুটি বন্ধে আমি ধরি,  
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন, এই দেশেতে মরি...

এবং ববীন্দ্রনাথের,

আঁখি মেলে তোমার আলো

প্রথম আমার চোখ জুড়াল,

সেই আলোতে নয়ন বেখে

মুদব নয়ন শেষে ..

প্রকৃতি মনোবশ রচনা সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বাস্থ্যহীন, অস্বহীন, দীন দরিদ্র বাঙালীর প্রত্যক্ষ অবস্থা থেকে এই অস্থিম প্রার্থনা উৎসারিত হয় কি ?

এদিক থেকে বঙ্গনীকান্ত দেশবাসীর অনেক কাছেই মাহুয। দেশের দীন-দুঃখীদের সঙ্গে এক হয়ে তিনি পবাদীনতাব দুঃথকে ভাঙা দিয়েছেন,

নেহাৎ গবীর আমবা, আমবা নেহাৎ ছোট,

তবু ত্রিশ কোটি ভাইবোন জেগে ওঠো...

কিংবা,

ও চাণী ভাই, ও তাঁতী ভাই, আজকে সুপ্রভাত...

দুঃখের বিষয়, বঙ্গনীকান্তের দৃষ্টি এবং দবদ যঃ গভীর, কবিত্ব ছিল তাব অল্পপাতে কম। তাই ঈব এই সব গান অনেক স্থানেই দিবুতিব আকাব ধবেছে, কাব্যেব সূক্ষমা লাভ কবতে পাবে নি।

বঙ্গ-সঙ্গীত ও স্বদেশী গানের আলোচনা-প্রেমসঙ্গে বলা বাখা দবকাব যে, এই শ্রেণীব গান অনেকটা উদ্দেশ্যমূলক। বড় প্রতিভাব হাতে বিশেষত্ব লাভ কবলেও, সত্যিকাব সাহিত্যবস তাই এই সব গানে খুব বেশী জামে উঠতে পাবে না। কিন্তু সৌভাগ্যেব বিষয়, আধুনিক গান এই উদ্দেশ্যেব স্তব অতিক্রম কবে প্রকৃত সাহিত্যই হয়েছে।

ববীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং বঙ্গনীকান্ত, এই তিন জন প্রসিদ্ধ গীতকাবেব মধ্যে প্রথম দু-জনেব গানে বিষয়, বস ও স্তবেব যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, বাংলা গানেব ইতিহাসে তাব তুলনা হয় না। ববীন্দ্রনাথের প্রেমের গান এবং দ্বিজেন্দ্রলালের হাসিব গান যদিও জনসমাজে সব চেয়ে বেশী আদৃত এবং এ দুই কবির প্রকৃত শক্তিব বিকাশও হয়েছে যদিও এই দুই বিভাগে, তবু উভয়েব অত্যন্ত পর্যায়ের গানগুলিবও উৎকর্ষ কম নয়।

ববীন্দ্রনাথের ধর্ম-সঙ্গীত নিয়ে আগেই আলোচনা কবেছি। প্রেম-সঙ্গীত সম্বন্ধেও দু-এক কথা বলা দবকার। এখানে মনে বাখতে হবে, কবির ধর্ম-সঙ্গীত আব প্রেম-সঙ্গীতের মাঝখানে কোন সীমাবেখা টানা যায় না। তগবৎ-প্রেম

ও মানব-প্রেম তাঁর গানে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে। প্রকৃতির নানা অবস্থান্তর নিয়ে তাঁর যে সমস্ত গান, এক হিসাবে তা-ও তাঁর ধর্ম এবং প্রেম-সঙ্গীতেরই শ্রেণীভুক্ত। প্রকৃতির বিচিত্র ভাঙা-গড়াব ভেতর তিনি অনির্বচনীয় সুন্দরবেব, লোকাভীত অরূপের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার সঙ্গে মানবান্বিত যোগসূত্রটি আবিষ্কার করেছেন, এ লক্ষ্য কবাব মতো।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেম-সঙ্গীতও চমৎকার এবং ববীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে তার পার্থক্য এই যে, তার আবেদন প্রত্যক্ষ। ‘এ-জীবনে পুঁবিল না সাধ ভালোবাসি’ প্রভৃতি গান দৃষ্টব্য। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসিগান অসামান্য। তার শব্দ-যোজনার কায়না, বিষয়-সমাবেশের নূতনত্ব, সর্বোপরি প্রকাশভঙ্গির অনায়াস স্বচ্ছতা যেমন, তার অন্তর্নিহিত অনাবিল ও অনাক্রমণাত্মক কৌতুকপ্রবণতা তেমনি উপভোগ্য। ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষের সম্ভ্রমচানি না করেও যে নির্মল হাস্যবস সৃষ্টি করা যায়, এই গানগুলি তার উজ্জ্বল নিদর্শন। ‘নন্দলাল’, ‘আমবা বিলাত-ফেবতা ক-ভাই’, ‘আমবা Reformed Hindus’, ‘তাবেই বলে প্রেম’, ‘আধুনিক বাধাক্ষণ’ ইত্যাদি গানের যে-কোনটা দৃষ্টান্তস্বরূপ নেওয়া যেতে পারে। দৃষ্টিভঙ্গি এই ঔদার্যই গানগুলিকে সবজনের পিয় করেছে। সেই,

নন্দলাল ত একদা একটা কবিল ভাষণ পণ,  
স্বদেশেব তবে যে কবেই হক, বাগিবে সে জীবন...

ময়ত,

দেখো হতে পার্তাম আমি একটা মস্ত বড় বাব,  
কিন্তু গোলাগুলির শব্দে কেমন মাথা বস না শ্রব...

কিংবা,

তাবেই বলে প্রেম,

যখন থাকে না ফিউচাবেব চিন্তা, থাকেনাক শেষ...

কে না পড়েছেন, কাব না ভালো লেগেছে? বাংলা সাহিত্যে এরা নূতন এবং আজ পর্যন্ত এর সমকক্ষ গান কেউ লিখতে পাবেননি।

## রজনীকান্ত

রজনীকান্ত কবি হিসাবে রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-সুরেব নন, কিন্তু তাঁর বচনাত্তেও নিবিড় আর্তি ও আকুলতার একটি মনোরম আবেদন শোনা যায়।



প্রাণের পথ বয়ে গিয়েছে সে গো,  
 চরণ চিরবেথা আঁকিয়া যে গো...  
 কিংবা,  
 ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে,  
 মরমে মরে গেল, মুকুলে ঝরে গেল,  
 বুকতবা আশা সমাধি-পাশে...

হৃদয়গ্রাহী রচনার আদর্শ হিসাবে আজো সমাদরে গৃহীত হবার যোগ্য।  
 ভক্তিমূলক গানে রজনীকান্ত অনেকটা যেন রামপ্রসাদের দ্বারা অনুসরণ  
 করেছিলেন। যেমন,

আমায় সকল রকমে কাঙাল কবেছ গর্ব করিতে চুব।

যশ, অর্থ, মান, স্বাস্থ্য, সকলি কবেছ দূব।

ভাবিতাম আমি লিখি বুঝি বেশ,

আমার সঙ্গীত ভালোবাসে দেশ,

তাই কি দয়াল ব্যাধি দিলে মোরে, বেদনা দিনে প্রচুব ?

খিষেটোবে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বাজরুদ্র রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিহারিনোদ  
 প্রমুখ নাট্যকাব্যের বহু গানও এককালে দেশে সমাদৃত ছিল। কিন্তু সে সমস্ত  
 বচন নিয়ে এখানে আলোচনার সুযোগ হবে না।

### অতুলপ্রসাদ

এঁদের পর সঙ্গীত-রচয়িতা হিসাবে নাম কবতে হয় কবি অতুলপ্রসাদের,  
 যিনি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্তের মতো একই সঙ্গে গীতস্রষ্টা এবং  
 গায়করূপে প্রসিদ্ধ।

অতুলপ্রসাদের ‘দোলে দোলে ফুল,’ ‘যদি হোর ছন্দ-যমুনা,’ ‘মিছে তুই  
 ভাবিস ওরে,’ ‘ওগো সাখা মম সাথী,’ ‘নিদ নাহি আঁখিপাতে’ ইত্যাদি গান  
 সুপরিচিত এবং কোতুকের বিষয়, অনেক ক্ষেত্রে এগুলি রবীন্দ্রনাথের রচনা  
 বলে চলে। বলা নিশ্চয়োক্ত যে, রবীন্দ্রোত্তর যুগের সমস্ত কবির মতো  
 অতুলপ্রসাদের গানেও পদ-বিতাস এবং শব্দ-যোজনার ওপর রবীন্দ্রনাথের  
 বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রাণ-ধর্ম ষাঁরা হৃদয়ঙ্গম  
 করেছেন, তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, এই সমস্ত গানে শুধু রবীন্দ্রনাথের  
 ভঙ্গিটাই অনুসরণ করা হয়েছে। অতুলপ্রসাদের অধিকাংশ গানই স্রব থেকে  
 বিচ্ছিন্ন হলে বিশেষ উপভোগ্য থাকে না।

অবশ্য বিশুদ্ধ সাক্ষীভিত্তিক দিক থেকে গানের ‘কথা’ হল সুরের বাহন। সুরটাই লক্ষ্য, কথা তার উপলক্ষ্য। কিন্তু বাংলা গানে বাণীকে লাউ-এর বৌটার মতো ধরে আনার উপায় মাত্র মনে করা হয়নি কোন দিন। প্রাচীন হক, আর আধুনিক হক, বাংলা গীত-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন যেগুলো, ‘কথা’র দিক থেকে তা বরাবর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এইজন্মেই বাংলা ভাষায় হয়ত খাঁটি রাগ-সঙ্গীত গড়ে ওঠেনি। কিন্তু এতেই বাংলা গান তার নিজস্বতা লাভ করেছে। সে সে-কালেও, এ-কালেও।

অতুলপ্রসাদের গানের ভাষা স্নিগ্ধ, ভঙ্গি পেলব, আবেদন করণ ও কমনীয়। যেমন,

গগনে বাদল, নয়নে বাদল  
বাদলে পরাণ ছাইয়া,  
এসো হে আমার বাদলের বঁধু,  
চাতকিনী আছে চাহিয়া।  
এ জীবনভার হয়েছে অবহ,  
সঁপিব তোমারি হাতে।  
নিদ নাহি ঔষিপাতে।

সমসাময়িক কবিদের মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং কাজি নজরুল ইসলাম গান লিখে প্রসিদ্ধ। উভয়ের, বিশেষত নজরুলের গান বাংলা দেশের তরুণ-মনে অল্পদিন আগেও কল্লোল তুলেছিল। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গানে চটুল শব্দ ও লঘু সুরের অনায়াস লীলা লক্ষ্য করার মতো।

### নজরুল ইসলাম

নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রোক্তর যুগের বিশিষ্টতম গীতকার। তাঁর গীত-সাহিত্যের বৈচিত্র্য এবং বিশিষ্টতা দুইই অসাধারণ। তাঁর,

উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,                      নিয়ে উতলা ধরণীতল  
অরুণ প্রাতের তরুণদল, চল রে চল রে চল...  
অথবা,

হুর্গম গিরি কান্ডার মরু ছত্তর পারাবার,  
লজ্জিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হাঁশিয়ার!...

শ্রেণীর ওজোগুণ-বিশিষ্ট গান তাঁর আগে আমরা কমই পেয়েছি। বাঙালী সামরিক জাত নয়, তার সাহিত্যে সত্যিকার শৌর্য কোন দিন তালো করে প্রকাশ পায় নি। নজরুল বাংলা গানের আসরে সামরিক পৌরুষের সুর প্রথম এনেছেন। আবার গজল গানের লীলায়িত কোমলতাও তাঁবি একক সৃষ্টি। যেমন,

আমারে চোখ-ইসারায় ডাক দিলে হায,  
কে গো দবদী,  
খুলে দাও রঙমহলার তিনিব-হুয়ার,  
ডাকিলে যদি।

কিংবা,

রুম ঝুম রুম ঝুম  
কে এলে নূপুর পায় ?  
ফুটিল শাখে মুকুল  
ও বাঙা চবণ-ঘায়।

ভাবী দিনে নজরুল হয়ত তাঁর সমস্ত কবিতা ও গান অপেক্ষা এই মনোবদন গজলেব জন্তেই বেশী অরণীয় হবেন।

## পঞ্চম অধ্যায়

### নাটক

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নাটক ছিল না। ইংরেজ আমলে ইংরেজী নাটকের আদর্শ প্রথম বাংলা ভাষায় নাটক লেখা শুরু হয়। আধুনিক পর্বের প্রথম নেতা ঈশ্বর গুপ্ত এদিকে অল্প একটু হাত চালিয়েছিলেন, কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারেননি। তাঁর পব নাটুকে রামনারায়ণ ওর্করর লেখেন ‘কুলীনকুল-সর্বস্ব’। এইটি হল বাংলা ভাষায় প্রথম অভিনীত নাটক। এব পব মাইকেল, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মনোমোহন বসু একাদিক্রমে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক লিখে বাংলা নাট্য-সাহিত্যেব ভিত্তি স্থাপন করেন। এঁদের মধ্যে দীনবন্ধুই হলেন সত্যি জ্ঞাতের নাট্যকার, যার অতিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত, অমুভূতি স্বপ্ন এবং রসজ্ঞান সজাগ।

তাঁর আগেব বা সমকালের লেখকেরা নাটক লিখতেন, হয় কোন মহৎ-চরিত্রের আদর্শ দেখাবার জন্তে, নয় কোন দেশাচারের ক্রটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবাব জন্তে। তাঁদের দৃষ্টি তাই সীমাবদ্ধ থাকত কতকগুলি নির্দিষ্ট টাইপ ও নীতির গণ্ডিতে। দোষে গুণে, ভালোয় মন্দায় যে জীবন নিত্য-প্রবাহিত, তাকেই নাটকের বিষয়রূপে গণ্য করেন দীনবন্ধু। দীনবন্ধুর পর দেশে প্রকাণ্ড রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয় এবং নাট্যাভিনয় চলতে থাকে ব্যবসা হিসাবে। এই সময় যারা নাট্যকার-রূপে দেখা দেন, তাঁদের নাম বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বিজ্ঞেন্দ্রলাল রায়, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি এই দলের অন্তর্গত। এঁদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ ও বিজ্ঞেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটকে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অমৃতলালের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে সামাজিক প্রহসনে।

গিরিশচন্দ্র, বিজ্ঞেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ কবির নাটক রঙ্গমঞ্চে বেশ জমে। রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্যে আভিনয়িক গুণের অভাব, কিন্তু সাহিত্য-রূপে সেগুলি মনোরম। একালে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ধারা ক্রমশ

ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আজকের দিনে সামাজিক নাটকের চাহিদা বেশী, কিন্তু নাট্যালয়গুলিতে আজো চলছে পুরাণেতিহাসের প্রতিপত্তি। সমসাময়িক লেখকরা কেউ কেউ সামাজিক নাটকে হাত দিয়েছেন, কিন্তু স্থায়ী সাহিত্য খুব বেশী সৃষ্টি হয়নি।

বাংলাদেশে নাটক এবং নাট্যালয় দুইয়েরই জন্ম ইংরেজ আমলে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নাটক নেই। এদেশে অভিনয়ের আসর জমত মঙ্গল গান, পাঁচালি, কীর্তন এবং কথকতা দিয়ে। একজন গায়ক বা কথক পৌরাণিক কোন কাহিনী গড়ে, পড়ে বা গানে বিবৃত করে যেতেন, দোহারেরা মৃদঙ্গ ও মন্দিরা-সহযোগে তাঁর সঙ্গে করতেন সঙ্গত। আর ছিল কবি ও তরঙ্গ গান। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ষাঁরা খবর রাখেন, তাঁরা অবশ্যই জানেন যে, বৈষ্ণব কবিতা, মঙ্গলকাব্য, কবির গান, এক কথায় যা আমাদের সাহিত্যের পুঁজি, তার কোনটাই প্রথমে সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে লেখা হয়নি, হয়েছে আসরে গাইবার জন্তে। তাই সাধারণের মধ্যে এ সমস্তই ছিল পালা নামে পরিচিত।

এই সব পালার ভেতর দিয়ে দেশকে ধর্ম-কর্ম, আচার-অনুষ্ঠান যেমন শেখানো হত, তেমনি আনন্দ, বেদনা, প্রীতি, তক্তি, হাসি-তামাসার খোরাকও জোগানো হত। অর্থাৎ এই ছিল তখনকার অভিনয়। সে-কালের নাট্যরুচি তৃপ্ত হত এতেই।

এরপর আসে যাত্রা। গোপাল উডের ‘বিজ্ঞানন্দর’ গানই বোধ হয় পুরানো যাত্রার প্রথম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ‘কমলে কামিনী’, ‘উষা-হরণ’ প্রভৃতি যে সমস্ত পুরানো পালা ছিল, তা অধিকারীদের খাতায় লেখা থাকত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খকম্পে সম্পত্তিরূপে হস্তান্তরিত হয়ে চলত। এই সব যাত্রাগানের অল্পসরণে ঊনবিংশ শতাব্দীতে একখানা নাটক লেখা হয়েছিল। সে হল তারারচাঁদ শিকদারের ‘ভদ্রার্জুন’ নাটক। বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম নাটক। শহরে বঙ্গমঞ্জরীর প্রথম অভিনীত নাটক হল রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কলীন্দ্র-সর্বস্ব’। আশ্চর্যের বিষয়, ভগবৎ-মহিমামূলক পৌরাণিক আখ্যান ছেড়ে, সামাজিক সমস্যা নিয়ে বইটি লেখা।

## রামনারায়ণ

টেকচাঁদের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ যেমন বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস, ‘কলীন্দ্র-সর্বস্ব’ তেমনি প্রথম নাটক এবং দুইয়েরই অবলম্বন সমসাময়িক

জীবন। টেকচাঁদ প্রথম ইংরেজী শেখার নেশায় উদ্ভ্রান্ত ‘ইয়ং বেঙ্গল’কে বিজুপ করেছিলেন, আর রামনারায়ণ করেছিলেন প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের গৌড়ামিকে বিজুপ। তদানীন্তন কুলীন সমাজে বহু-বিবাহের উৎপাতে কি ধরনের কদাচার প্রবেশ করেছিল, তা দেখানোর জন্ত এই বই লেখা এবং সে লেখায় বেশ মুগ্ধিমান আছে।

একটি বিবাহ-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ বহু বর্ষ পূর্বে এক কুমারীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। দারিদ্র্যের দায়ে অনেক কাল পরে প্রণামী নেবার প্রয়োজনে সেই পত্নীর সন্ধানে তিনি খুশুরবাড়ী আসছেন। পথে পুকুরঘাটে এক বয়সী মহিলাকে দেখলেন। তাঁকে মাতৃ-সম্বোধন করে খুশুর-তবনের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেন। পরে খুশুরবাড়ী এসে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, ঐ মহিলাই তাঁর একনা-বিবাহিতা পত্নী! মোটের ওপর কাহিনীটি এই। এর তেতর ফলার-মহিমা আছে, ধর্মার্থের বিবাদ আছে, তদানীন্তন সামাজিক রীতি-নীতির অনেক কোতুকপ্রদ চিত্র আছে। অবশ্য উচ্চাঙ্গের নাটকীয় বৈশিষ্ট্য বেশী কিছু নেই এতে। এ একটি হাস্য প্রহসন। ‘কল্পিণীহরণ’ এবং ‘নব নাটক’ ইত্যাদি আবার কয়েকখানি নাটক আছে তাঁর।

## মাইকেল

তর্করত্নের অল্প পরে মাইকেল। মাইকেল সর্বপ্রথম নাট্যকার-রূপেই বাংলা সাহিত্যে দেখা দিচ্ছেছিলেন এবং ঐতিহাসিক নাটক, বিয়োগান্ত নাটক, প্রহসন, সবই বাংলা ভাষায় প্রবর্তিত করেন তিনি। সুপণ্ডিত মাইকেল গ্রীক, রোমান, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান এবং সংস্কৃত নাট্য সাহিত্য মগ্ন করেছিলেন। বাংলা নাটকে তাই তিনি নূতন জিনিস অনেক এনেছেন। কিন্তু নাট্য-সাহিত্যে তিনি প্রাণ-সঞ্চার করতে পারেন নি। হয়ত স্পষ্ট সমাজ-চেতনা ও লোকচরিত্র-জ্ঞানের অভাবেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি সব হয়েছে পুতুলনাচের পুতুল। সাজানো-গোজানো, কিন্তু জীবন্ত নয়। শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, তিনেরই অবস্থা এক।

এর ওপর নাটকে মাইকেলের ভাষাও দুর্বল। বাংলা গল্প স্টাইল বা ভঙ্গি তিনি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারেন নি। তাই নাটকগুলিতে তিনি চালিয়ে-ছিলেন চলতি ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সঙ্গেই দীর্ঘ সমাস-সন্ধি-সম্বলিত বিভ্রাস্তসাগরী ভাষা, যা কথাবার্তার ক্ষেত্রে অচল!

কিন্তু মাইকেলের প্রহসন দুটি চমৎকার। একটিতে হিন্দুয়ানির নামাবলী-ঢাকা চরিত্রহীন গ্রাম্য জমিদারের এবং অপরটিতে সংস্কৃতির গিণ্টি-করা বয়স্ক ইয়ং বেঙ্গলের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। ঘটনার অভিনবত্বে, ভাষার কাকুকার্ণে, সর্বোপরি কৌতুকরসের অজস্র পরিবেষণে বই দুটি পদে পদে দীনবন্ধুকে মনে করিয়ে দেয়।

### দীনবন্ধু

দীনবন্ধুর অতিষ্ঠতার ক্ষেত্র ছিল অনেক বড়। সরকারী চাকরির খাতিরে তাঁকে নানা স্থানে বেড়াতে হয়েছে, ছোট-বড় নানা স্তরের লোকের সঙ্গে মিশতে হয়েছে। এই প্রত্যক্ষ সংস্রব তাঁকে দিয়েছিল সৃষ্টির প্রেরণা এবং এখান থেকেই তিনি আহরণ করেছিলেন রচনার উপকরণ। এক দিকে বঙ্কিম যখন রাজা-বাদশা, যোদ্ধা ও সাধু-সন্ন্যাসীদের মহিমান্বিত কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লিখছেন, আর মাইকেল লিখছেন দেব-দেবীদের এবং তাঁদের কৃপাপ্রাপ্ত নর-নারীদের জীবন নিয়ে কাব্য, দীনবন্ধু সেই দিনে নিরম চাষার দুঃখে বিগলিত হয়ে ‘নীলদর্পণ’ লিখেছিলেন, এ ঘটনা উপেক্ষা করার মতো নয়।

সাহিত্য হিসাবে নীলদর্পণে অসঙ্গতিব অভাব নেই। বহু জিনিস এতে আছে, যা নাটকীয় সংস্থান-জ্ঞানের প্রতিকূল। তা সত্ত্বেও ‘নীলদর্পণে’ সত্যিকার জীবন আছে, তার বেদনা আছে। তবে দীনবন্ধুর সর্বোত্তম রচনা ‘সধবার একাদশী’।

‘সধবার একাদশী’ সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলে রাখা দরকার যে, এই বইয়ের সূচনায় তদানীন্তন রুচি অমুযায়ী ইয়ং বেঙ্গলকে নিয়ে ঠাট্টা করার ক্ষেত্রেই দীনবন্ধু কলম ধরেছিলেন। কিন্তু তাঁর অজ্ঞাতসারেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে তাঁর মমতার ওপর দাবী করে বসেছে। যে নিম্নে দৃষ্টান্তে তিনি বয়স্ক রূপে আসরে নামিয়েছিলেন, সেই শিক্ষিত এবং আদর্শ-বিস্রাস্ত ইয়ং বেঙ্গলের ট্র্যাজেডিটাই শেষ পর্যন্ত এই বইয়ে মহান্ হয়ে উঠেছে। বাইরে হাঙ্গ-পরিহাস, মৃগপান এবং কবিতার আবৃত্তি দিয়ে এই ট্র্যাজেডিটা দীনবন্ধু আড়াল করে রেখেছেন। কিন্তু এখানেই এ বইয়ের অসাধারণতা।

মাইকেলের ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ প্রহসনটিই ‘সধবার একাদশী’র আদি প্রেরণা জুগিয়েছিল। সেখানেও দেখি, ইয়ং বেঙ্গল নবাবু এবং তার শিক্ষিত মোসাহেবরা ফ্যাশনের নামে বেয়াড়া পথে পা বাড়িয়েছে এবং ‘জ্ঞান-তরঙ্গিনী

সভা'র আড়ালে মত্তপান ও যথেষ্টাচার চালাচ্ছে। দীনবন্ধুর আখ্যানাংশও প্রায় তাই, কিন্তু উভয়ের বিচারের কত তফাৎ !

‘বিষে পাগলা বুড়ো’তে বগী-বন্দীর লড়াই, ‘জামাই বারিকে’ জামাইদের খোঁয়াড়ে মাণিক পীরের গান, ‘নবীন তপস্বিনী’তে হৌদল কুঁতকুঁতের অভিসার, বিচ্ছিন্ন দৃশ্য হিসাবে উপভোগ্য। কিন্তু সমগ্রভাবে বইগুলো ঠিক রসোত্তীর্ণ নয়। তাছাড়া রুচির বিচারেও স্থানে স্থানে আপত্তিকর। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তাঁর অবলম্বিত চরিত্র ও তাদের কার্য-কলাপ নিখুঁতভাবে আঁকতে হলে, অলীলতা বোল-আনা এড়ানোর উপায় ছিল না।

## অন্যান্য নাট্যকার

রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল এবং দীনবন্ধুর সমস্ত নাটকই অভিনীত হয়েছিল ঘরোয়া রঙ্গমঞ্চে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের উদ্যোগে বাংলা দেশে প্রথম পাব্লিক স্টেজ বা পেশাদার রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয় এবং নাট্যাভিনয় ব্যবসা হিসাবে সুরু হয়। রঙ্গমঞ্চের প্রসার হলেই, নাটকেরও চাহিদা বাড়ে। তাই প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ জন্মানোর পরই গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল বসু, বিজ্ঞেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, বাংলা দেশে যাবা নাট্যকার-রূপে প্রসিদ্ধ, তাঁদের সকলেরই আবির্ভাব হয়। কিন্তু এঁদের ঠিক আগে এবং মাইকেল-দীনবন্ধুর ঠিক পরে মনোমোহন বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কয়েকজন জনপ্রিয় নাট্যকার ছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘পুরুষবিক্রম,’ ‘সরোজিনী,’ ‘অশ্রুমতী’ প্রভৃতি প্রথম আমলের ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে কিছু মূল্য দাবী করে। সরোজিনী নাটকের ‘জল জল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ’ গানটির এক সময় বিশেষ খ্যাতি ছিল। যদিও শোনা যায় গানটি রবীন্দ্রনাথের লেখা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘অলীক প্রকাশ’ বাংলা কমিক-নাট্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বই। তাঁড়ামির পরিবর্তে শুভ সুরচিসম্মত হাসি এর বৈশিষ্ট্য।

মনোমোহন বসুর ‘সতী’ নাটক বা ‘হরিশ্চন্দ্র’ নাটক হিন্দু মেলায় যুগে লেখা। সতী নাটকের একটা গান ‘দিনের দিন হয়ে দীন’ একদা বাংলা দেশে বিশেষ প্রচার লাভ করেছিল। এই গানের জন্মে ঐ নাটকের অভিনয় সরকার থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পৌরাণিক কাহিনীর ভেতর আধুনিক রাজনীতির সমস্তা সংযোজনা করে, কবি সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন।



উপেন্দ্রনাথ দাসের ‘শরৎ-সরোজিনী’ এবং ‘সুরেন্দ্র-বিনোদিনী’ নামে আর দু-খানা নাটকেরও এই সময় প্রচার ছিল।

## গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল

এর পর বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আধুনিক অধ্যায় এবং এই অধ্যায়ের প্রথমে আসেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গিরিশচন্দ্র এদেশে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সেক্সপীয়ার এবং বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের গ্যারিক বলে সম্মানিত হয়ে থাকেন। এ উক্তি অতিশয়তা-দৃষ্ট সন্দেহ নেই। কিন্তু একাধারে নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, নট ও নাট্যকার-রূপে গিরিশচন্দ্র কৃতিত্ব কম দেখাননি। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক তিন শ্রেণীর অজস্র নাটক লিখেছেন তিনি। ‘জনা’, ‘পাণ্ডব-গোবব’, ‘বুদ্ধদেবচরিত’, ‘শংকরাচার্য’, ‘চৈতন্যলীলা’, ‘রাণাপ্রতাপ’, ‘সংনাম’, ‘সিরাজউদ্দৌল্লা’, ‘প্রকুল’, ‘বলিদান’, ‘অধিকাংশ বই-ই তাঁর মঞ্চাভিনয়ে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু সাহিত্য হিসাবে তাঁর বচনা সর্বত্র সুন্দর নয়, ভাষা দুর্বল এবং জীবন-বোধও অম্পষ্ট। পুর্বানো যাত্রার কাঠামোতে নাটক লিখেছেন তিনি, তাই তাতে ভক্তিমিশ্রিত অলৌকিকভার প্রাধান্য হয়েছে। সামাজিক নাটক ‘প্রকুল’ তাঁর উৎকৃষ্ট রচনা।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে অসম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করার মতো। বাক্যের গুরুত্ব-লঘুত্ব অনুযায়ী ছন্দ ব্যবহারের কৃতিত্ব অবশ্য প্রথম দেখান অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা মাইকেলই। তাঁর পদ্মাবতী নাটকে দেখি,

আমি কলি,

কে না কাঁপে প্রতাপে আমার ?

গিরিশচন্দ্রের অনূদিত নাটক ‘ম্যাকবেথ’, গীতিনাট্য ‘আবুহোসেন’ এবং ঐতিহাসিক নাটক ‘কালাপাহাড়’ও তাঁর বিশিষ্ট বচনা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রঙ্গমঞ্চের প্রিয় লেখক। চলতি ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম-সহযোগে ধ্বনিমুখর অলংকৃত গদ্য প্রবর্তন করে, বাংলা ভাষার প্রকাশ-শক্তিকে তিনি যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিচিত্র ধরনের বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ-প্রয়োগে, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও যমকের ব্যবহারে তাঁর রচনার ঐশ্বর্য অসীম। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সত্যিকার বৈশিষ্ট্য যদি কিছু থাকে ত সে এই জায়গায়।

তাঁর নাটকের প্রধান ত্রুটি, তাঁর স্রষ্ট প্রত্যেকটি চরিত্রের ভেতর দিয়ে

কবির ব্যক্তি-রূপটি স্কুটে ওঠে, কোন চরিত্রই নিজের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় না।

তার সর্বোৎকৃষ্ট তিনখানা বই ‘শাজাহান’, ‘চন্দ্রগুপ্ত,’ আর ‘পাষাণী’ নিয়ে আলোচনা করলেই এটা পরিষ্কার হবে। আলেকজেন্ডার যে ভাষায় ভারতের শোভা-সৌন্দর্য বর্ণনা করছেন, চাণক্য সেই ভাষাতেই করছেন মাতৃ-মাহাত্ম্য কীর্তন। দাবা যে ভাষায় অত্যাচারিত মানবতার অভিযোগ ঘোষণা করছেন, শাজাহান সেই ভাষাতেই করছেন আপনার বন্দী-দশা নিয়ে বিলাপ। ইন্দ্র যে ভাষায় করছেন অহল্যাকে প্রলুব্ধ, গৌতম সেই ভাষাতেই বলছেন তাঁর জন্তে ক্ষমামিশ্রিত বেদনার বাণী! অর্থাৎ সব ক-টি চরিত্রকে আশ্রয় করেই প্রকটিত হচ্ছে একটি ব্যক্তির রূপ এবং সে ব্যক্তিটি স্বয়ং কবি।

ভাষাবিশ্বাসে দ্বিজেন্দ্রলালের নূতনত্ব প্রশংসনীয় ঠিকই। কিন্তু এই নূতনত্বের মোহে কবি কতকগুলি মুদ্রাদোষের আবর্তে পড়েছিলেন, যা তাঁর সামাজিক নাটকের ক্ষতি করেছে। ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকে পাত্র-পাত্রীরা আমাদের কাছ থেকে দূরের মানুষ। তাদের কার্যকলাপ ও কথাবার্তায় অবাস্তবতা বা অতি-রোমান্টিকতা থাকলে, সব সময় সেটা অসহনীয় ঠেকে না। কিন্তু সামাজিক নাটকে এ টেকনিক একেবারেই চলে না। দ্বিজেন্দ্রলালের ‘পরপারে’ সামাজিক নাটকটি এই ভাষাগত কৃত্রিমতার জগ্রেই উপভোগ্য হয় নি।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানত গড়েই নাটক লিখেছেন। ‘সীতা’ এবং ‘পাষাণী’ কেবল অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। ‘পাষাণী’তে তিনি যে পূর্ণ পর্বের অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করেছেন, রাজকৃষ্ণ রায়ের ‘লোহ-কারাগার’ এবং রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা ও রাণী’ এবং ‘বিসর্জনে’ও তা-ই ব্যবহৃত হয়েছে। মাইকেল, কালীসিংহ বা গিরিশ ঘোষের অসম ছন্দ এঁরা নেননি।

রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এক সময়ে রঙ্গমঞ্চের প্রিয় লেখক ছিলেন। রাজকৃষ্ণ রায়ের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক অসংখ্য নাটক আছে। ‘লোহ কারাগার’ নাটকের আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া ‘অনলে-বিজলী’, ‘বনবীর’, ‘ঋগ্যজ্ঞ’ প্রভৃতি নাটকও বেশ সুলিখিত। কয়েকখানি প্রহসনও তাঁর আছে বেশ ঝরঝরে। ‘পাঁচ বাঁটা’, ‘বোল বছরের পেঙ্গুই’, ‘এ মেয়ে পুষ্করের বাবা’ প্রভৃতি। ছুঃখের বিষয়, দেশ এই সাহিত্য-কর্মীকে ভুলে গেছে!

## অমৃতলাল

অমৃতলালের ‘হরিশ্চন্দ্র’, ‘যাজ্ঞসেনী’ ইত্যাদি পৌরাণিক নাটক বা ‘হীরক-চূর্ণ’ ঐতিহাসিক নাটক গিরিশ-প্রভাবিত রচনা। সামাজিক নাটক ‘তরুণালা’ও তাই। অমৃতলাল বাংলা দেশে প্রহসন-রচয়িতারূপেই পরিচিত এবং এ বিভাগে তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। ‘কুপণের ধন’, ‘সাবাশ আটাশ’, ‘চাটুজ্যে-বাঁদুজ্যে’, ‘তাজ্জব ব্যাপার’, প্রত্যেকটি বই-ই অপূর্ব। ‘কুপণের ধন’ এবং ‘চাটুজ্যে-বাঁদুজ্যে’ অবশ্য মল্লয়ারের ছায়ায় লেখা, কিন্তু তাতে যায় আসে না। পূর্বের বিষয়বস্তু নিজের করে নিতে পারেন তিনিই, নেবার শক্তি আছে যার।

কিন্তু অমৃতলালের প্রহসনের বিষয়বস্তু বড় বেশী সাম্প্রতিক। সময়সীমাক্রান্ত হয়ে যাবার পর তাদের আবেদন শেষ হয়েছে। অবশ্য প্রহসন, প্যাবডি, স্কাটায়ার ইত্যাদির ধর্মই এই। কিন্তু সাম্প্রতিক উপকরণকে চিরস্থান রূপে অভিব্যক্ত করা যায় এবং সেই ভাবেই করতে হয় সাহিত্য। নইলে মল্লয়ারের ‘বুর্জোয়া’, ‘ডাক্তার’ বা ‘কুপণ’ আজও বেঁচে আছে কি জন্তে? ‘সধবার একাদশী’ই বা ভালো লাগে কেন?

‘তাছাড়া অমৃতলালের রসিকতা মোটা ধরনের। দীনবন্ধুতেও এ জিনিস আছে। কিন্তু দীনবন্ধুর রচনার যে শ্রোতৃবিনী গতি, তার মুখে এরা আবর্জনা স্রষ্ট করে দাঁড়াত পারে নি। অবশ্য তা সত্ত্বেও বাংলা নাটক ও নাট্যশালা অমৃতলালের কাছে ঋণী কম নয়। তিনিও একাধারে ছিলেন নট, নাট্যকার ও নাট্য-ব্যবস্থাপক।

ক্ষীরোদপ্রসাদের ‘আলমগীরে’ বা ‘প্রতাপাদিত্যে’ বিজ্ঞানলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মতো ভাষায় ওজ্জ্বল্য নেই। ক্ষীরোদপ্রসাদের ‘আলিবাবা’ গীতিনাট্য বোধ হয় বাংলা রঙ্গমঞ্চে সব চেয়ে বেশী অভিনীত বইয়ের অতীতম। এই বইয়ে কিছুটা গিরিশচন্দ্রের ‘আবুহোসেন’ নাটকের কাঠামো নকল করা হয়েছে।

## রবীন্দ্রনাথ

নাটকরচনা রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভার একটি গৌণ দিক মাত্র হলেও, তার বৈচিত্র্য এবং সম্পদ বড় কম নয়, বাংলা সাহিত্যের ক্রম-পরিণতির ওপর তার প্রভাবও অসামান্য। রবীন্দ্রনাথ যত নাটক লিখেছেন, তাকে মোটামুটি এই কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় : কাব্য-নাট্য, ‘রাজা ও রাণী’,

‘বিসর্জন’, ‘চিত্রাঙ্গদা’, রঙ্গনাট্য ‘চিরকুমার সত্য’, ‘গোড়ায় গলদ’ (‘শেষরক্ষা’), ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’, ‘সঙ্কেত-নাট্য’, ‘রক্তকরবী’, ‘অচলায়তন’, ‘ডাকঘর’, ‘মুক্তধারা’। ‘বিদায়-অভিশাপ’, ‘কর্ণকুন্তী-সংবাদ’, ‘গান্ধারীর আবেদন’ প্রভৃতি নাট্যকার কবিতা এবং ‘মায়া’র খেলা’ প্রভৃতি গীতি-নাট্য আসলে কাব্য সাহিত্যের অন্তর্গত, কাজেই ওগুলোকে নাটক-পর্যায়ভুক্ত করার প্রয়োজন নেই।

এতদিন পর্যন্ত আমাদের নাটক প্রধানত তিনটি বিশেষ ধারা অবলম্বন করে লেখা হত। পৌরাণিক কাহিনীর ভেতর দিয়ে কোন ভক্তি বা নীতিমূলক আদর্শ দেখানো, নয়াত ঐতিহাসিক কাহিনীর ভেতর দিয়ে দেশাত্মবোধ-প্রচার, নয়াত সামাজিক আখ্যায়িকার ভেতর দিয়ে কোন দেশাচারের বিরুদ্ধে জনমত-গঠন, কিংবা তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ। পৌরাণিকে গিরিশচন্দ্র, ঐতিহাসিকে দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং সামাজিকে দীনবন্ধু, অমৃতলালের লেখনী সব চেয়ে বেশী খুলেছে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই ত্রি-ধারা পরিহাব করে বিশুদ্ধ সাহিত্য-রসাপ্রিত নাট্যরীতি প্রবর্তন করেছেন। চিত্রাঙ্গদায় তিনি পৌরাণিক এবং বিসর্জনে ঐতিহাসিক কাহিনী নিলেও, উভয়ক্ষেত্রে দৃষ্টি রেখেছেন ভাব-ব্যঞ্জনা প্রতীতি। চিরন্তন সত্যের দেশ, কাল ও পাত্র-নিরপেক্ষ যে আবেদন রবীন্দ্র-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্রনাথের নাটকেও তারই প্রতিফলন হয়েছে। এমন কি, সামাজিক নাটকেও তাঁর পদ্ধতি এক। তা-ও সমাজ-প্রচলিত কোন সমস্যা বা দাবীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নি, মানুষের যে সমস্ত খেয়াল, হুঙ্কি-বৈকল্য বা বোকামি চিরকালের, তার ওপরই তাদেব প্রতিষ্ঠা।

রাজা ও রাণী, চিত্রাঙ্গদা, বিসর্জন, গোড়ায় গলদ, চিরকুমার সত্য, বৈকুণ্ঠের খাতা প্রভৃতি বই দ্বারা মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন, তাঁরাই লক্ষ্য করেছেন যে, এদের চরিত্রগুলো কোন বিশেষ দেশের বা সময়ের গণ্ডিতে বাঁধা নয়, তারা বিশ্ব-মানবের প্রতিনিধি। পরম্পর-বিরোধী ভাবের প্রতীকরূপে কতকগুলি চরিত্র সৃষ্টি করে, তাদের মধ্যে দিয়ে এক-একটা তত্ত্বকে রূপায়িত করাই হল কবির লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যের পরিপূরক হিসাবে তাঁর নাটকে আসে নানা শ্রেণীর নর-নারী, যারা আসলে এক-একটি মানবায়িত ভাব। এই নৈব্যক্তিকতার ফলে রূপক-নাট্যগুলোর ব্যঞ্জনা পর্যন্ত অনেক সময় পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে না। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথই বাংলা ভাষার একমাত্র লেখক, যার নাটক রঙ্গমঞ্চের বাইরে অধ্যয়নে উপভোগ্য। কেননা, তা মহৎ সাহিত্য।

## সাম্প্রতিক নাটক

মঞ্চ-সাক্ষ্যের দিক থেকে বাংলা ভাষায় অনেক উল্লেখযোগ্য নাটক আছে। যেমন ‘রিজিয়া’ (মনোমোহন রায়), ‘মিশরকুমারী’ (বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত), ‘বঙ্গ বগী’ (নিশিকান্ত বসু), ‘পৃথ্বীরাজ’ (মনোমোহন গোস্বামী), ‘মোগল-পাঠান’ (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), ‘ক্ষত্রবীর’ (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), ‘জয়দেব’ (হরিপদ চট্টোপাধ্যায়), ‘কর্ণার্জুন’ (অপরেণ মুখোপাধ্যায়), ‘রাতকানা’ (নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং অত্যন্ত অনেক বই। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীবাদপ্রসাদের অগ্রকরণে লেখা অসাহিত্যিক এবং অসার্থক এই সব রচনা নিছক অভিনয়ের জাঁক-জমকে বাজার মাত করে।

কিন্তু বাংলা নাট্য-সাহিত্যের এইখানেই সমাপ্তি। সমসাময়িক কালের সাহিত্যিকরা কেউ উল্লেখযোগ্য নাটক লেখেন নি। লেখার কাজ সাহিত্যিকদের হাত থেকে এখন থিয়েটার-কর্তাদের হাতে চলে গেছে। তাঁরা হয় পুরানো নাটকের ছকে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক লেখান, নয় জনপ্রিয় উপভাসকে নাটকে রূপান্তরিত করিয়ে মঞ্চস্থ করেন।

ইদানীন্তন লেখকদের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, জলধর চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি কোন মতে নাট্য-সাহিত্যের ক্ষীণ ধারাটি জীইয়ে বাখার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের ‘মানময়ী গার্লস স্কুল’ এবং প্রমথনাথ বিনোয়ীর ‘ঋণং কৃৎস্না’ কোতুকনাট্য হিসাবে উপভোগ্য। শচীন সেনগুপ্তের ‘গৈবিক পতাকা’, ‘সিরাজউদ্দৌল্লা’ এবং মন্মথ রায়ের ‘কারাগার’ পুরানো ধারার নাটক। কিন্তু দু-জনেই নূতন যুগের নাটকও লিখেছেন কিছু কিছু। শচীন সেনগুপ্তের ‘ঝড়ের রাতে’ ভালো লেখা।

মন্মথ রায়ের একাধিক নাটকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিবরাম চক্রবর্তী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতি লেখকরাও এই বিভাগে অল্পস্বল্প সম্পদ সংযোজন করেছেন। কিন্তু পৃথিবীর অত্যন্ত দেশে অধ্যয়নযোগ্য একাধিক নাটক যে রকম আদৃত, আমাদের দেশে তা নয়। বোধহয় এই জন্তেই একালীন সাহিত্যের এই প্রকাণ্ড দিকটি এখনো উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### উপন্যাস

নাটকের মতো উপন্যাসও বাংলা ভাষায় জন্মেছিল ইংরেজী সাহিত্যের অনুপ্রেরণা থেকে। এ দেশের ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে এক শ্রেণীর কাব্যধর্মী আখ্যায়িকা লেখার রীতি ছিল। ‘কাদম্ববী’ ও ‘বাসবদত্তা’ তার প্রমাণ। কিন্তু আজকের দিনে নভেল বলতে আমরা যা বুঝি, তা এসেছে ইউরোপ থেকে। বাংলা ভাষার সত্যিকার প্রথম নভেলিস্ট হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর আগে বিজ্ঞানাগর, তারানাথের তর্করত্ন প্রমুখ লেখক বাংলায় ক্লাসিক্যাল রোমান্সেব পুনর্লিখন করেছিলেন, আর টেকচাঁদ, তবানীচরণ প্রভৃতি কবেছিলেন সমসাময়িক সমাজ নিয়ে এক শ্রেণীর স্টাটার রচনা। এঁরা সম্ভবত মুসলীম কিস্সা-সাহিত্য থেকে আদর্শ আহরণ করেছিলেন।

বঙ্কিম যখন সাহিত্যিক-রূপে আবির্ভূত হন, তখন দেশেব সমাজ ইংরাজী শিক্ষার মোহে উদ্ভাস্ত। দেশের ধর্ম-কর্ম ও আচার-সংস্কৃতির ওপর শ্রদ্ধা হারিয়ে যুবকরা হয় ঝুঁকান, নয় ব্রাহ্ম হচ্ছিলেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র সেই উন্মার্গগামী সমাজকে জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যে উদ্দীপ্ত করা তাঁর জীবনের ব্রত করলেন। এই জন্মেই তাঁকে লিখতে হল প্রধানত ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং সামাজিক উপন্যাসেও তিনি নৈতিক আদর্শকে প্রাধান্য না দিয়ে পারলেন না। বঙ্কিমের এই সংস্কারক বুদ্ধি তাঁর শিল্পের গরিমা কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেছে হয়ত। কিন্তু দেশের সাহিত্যে তাঁর প্রভাব অসামান্য। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে গোড়ার দিকে বঙ্কিমের প্রভাব দেখা যায়। বঙ্কিমের ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ আর রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’ পাশাপাশি রেখে পড়লেই এ কথার যথার্থ্য বোঝা যাবে।

বঙ্কিম-সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের অনেকের লেখাই সেদিন বিশেষ সমাদৃত ছিল। এঁদের মধ্যে দামোদর মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সঞ্জীবচন্দ্রের ‘রামেশ্বরের অদৃষ্ট’ এবং দামোদরের ‘মা ও মেয়ে’ সুখপাঠ্য উপন্যাস। এঁদের সামান্য পরে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট লেখক। তাঁর ‘স্বর্ণলতা’তেই বাংলা গার্হস্থ্য

উপহাসের রূপ সর্বপ্রথম পূর্ণতা লাভ করল। যোগেন্দ্র বসু, ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁর সমসাময়িক লেখকরাও একদা খ্যাতিমান ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপহাসে যে মনস্তাত্ত্বিকতা প্রবর্তন কবলেন, তা তাঁর সমসাময়িকদের তেমন বেশী প্রভাবিত করে নি। বরং তাঁর তাত্ত্বিকতা পরিহার করাবই চেষ্টা হয়েছে বিশেষ করে। রবীন্দ্রনাথের পর এলেন শরৎচন্দ্র। তিনিই বাংলা উপহাসকে সম্পূর্ণতা দিলেন। মামুষের ছুংখ-ব্যথা, শ্বলন-পতনকে সুগভীর সহানুভূতিব রঙে চিত্রিত করে, তিনি বঙ্কিমের নীতি-নিষ্ঠা এবং রবীন্দ্রনাথের মননশীলতা দুটিকেই অতিক্রম করে গেলেন। তাঁর আদর্শই আজও দেশে বিশেষভাবে অনুসৃত হচ্ছে। শরৎচন্দ্রই প্রথম তথাকথিত ছোটলোককে সম্মানিত রূপে আঁকলেন, তাদের ছুংখ-হৃদয়কে সমবেদন দিয়ে ফোটালেন। শরৎচন্দ্রের পর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্নাল, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিব নাম উপহাসকার হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

## ভবানীচরণ ও টেকচাঁদ

বঙ্কিমচন্দ্রই যদিও বাংলার প্রথম সত্যিকার উপহাসিক এবং বাংলা উপহাসের আধুনিকতম অধ্যায়ের ঠিক আগে পর্যন্ত যদিও তাঁর প্রভাবই দেশে বিশেষ ভাবে কাজ করেছে, তবু তাঁর পূর্বেও বাংলা সাহিত্যে উপহাস লেখা হয়েছে এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে তাদের মূল্য কম নয়। তবে অবশ্য প্রাক-বঙ্কিম উপহাসগুলো খাঁটি জাতের উপহাস নয়, স্মৃতিযাব-জাতের রচনা। তখনকার সমাজের তরুণ ও প্রবীণদের দোষ-ত্রুটি, অত্যাচার-অনাচার নিয়ে ব্যঙ্গ-বিক্রপ করার এবং তাঁদের অপথের সন্ধান বাতলে দেওয়ার জন্তেই এদের সৃষ্টি। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নববাবু বিলাস’ এবং টেকচাঁদের ‘আলালেব ঘরের ছুলাল’ এই সময়ের উল্লেখযোগ্য বই।

সময়টা আমাদের মনে রাখতে হবে। আচকান, পাগডি ও ফবসির সঙ্গে ফারসী পড়া যেমন হিন্দুদের মধ্যে আভিজাত্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তেমনই হিন্দুয়ানির আঁটুনিও বেড়ে গিয়েছিল অত্যন্ত বেশী। বাইরে মুসলমানী ও ভেতরে হিন্দুয়ানির ধাক্কা সমাজ-জীবন প্রাণ-শক্তি হারিয়ে

জীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এই দুর্বল স্বাস্থ্যের ওপর মহামারীর মতো এসে পড়ল ইংরেজী শাসন এবং ইংরেজী সভ্যতা।

এই বিক্ষোভ জুড়িয়ে থিতিয়ে প্রথম নব সংস্কৃতির স্নগঠিত রূপ প্রকাশ পেল বঙ্কিম, মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতির সাধনায়। কিন্তু তার আগে এই ভাঙনের মধ্যে দিয়ে জাতিকে গঠনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যাবা, তাঁদের মধ্যে প্রথম হলেন রামমোহন, দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর।

এই ভাঙা-চোরা সমাজে ব্যঙ্গ-বিজ্রপের অবসর ছিল ঢেব, সে প্রাচীন-পন্থীদের নিয়েও, আধুনিকপন্থীদের নিয়েও। ভবানীচরণ ও টেকচাঁদ উভয়েই লক্ষ্য হিসাবে নিয়েছিলেন ‘এডুকটেড ইয়ং বেঙ্গল’কে। তাদের উচ্চ স্বল্পতা, উদামতা, আতিশয্য, সব কিছুই ভেতবই চাঁট্টা, এমন কি আক্রমণের জিনিস ছিল প্রচুর। নানা বইয়ে এই পুঁজি ভাঙানো হয়েছে। আর ‘ওল্ড ফুল’দেব কথা ত বলাই নয়। এই আমলের নক্সায়, নাটকে, উপন্যাসে, সর্বত্র সেই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের চিত্র পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই সব বইয়ের অধিকাংশই খেলো জাতের রচনা। সবই পরিবর্তনশীল সমাজ ও সংস্কৃতির সমসাময়িক আলোচ্য মাত্র। তবে এই বইগুলোর সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় তাদের সুখ-দুঃখ আঁকার প্রয়াস। সেদিন এ জিনিস অনেকের শ্রদ্ধার উদ্রেক করেনি। তাই এদের পাশাপাশি বিদ্যাসাগরী রচনাই দেশকে করেছে বেশী আকর্ষণ।

এই শ্রেণীর স্মার্টার ছোকরা-মহলে হয়ত আদর পেত। কিন্তু দেশের তদ্র সমাজে আদর পেত পৌরাণিক ধরনের আখ্যায়িকা, ‘সীতার বনবাস’, ‘শকুন্তলা’, ‘ভ্রান্তিবিলাস’, ‘কাদম্বরী’, ‘রাসেলাস’, ‘টেলিমেকস’, ‘রামের রাজ্যাভিষেক’ ইত্যাদি। এই সব বইয়েই বিষয়, রচনা-রীতি, প্রতিপাত্ত, সর্বত্র ছিল সংস্কৃত কোলীক এবং সেটাই বিবেচিত হত তদ্র সাহিত্যের আদর্শ বলে। বলে রাখা দরকার যে, শেষোক্ত বইগুলো মৌলিক সাহিত্য নয়, হয় অহুবাদ, নয় অহুসরণে লেখা।

## বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসকে আঁতুড় ঘর থেকে প্রাত্যহিক সংসারে নিয়ে এলেন। হিন্দু কলেজের প্রথম গ্র্যাজুয়েট বঙ্কিম ঝট্টের উপন্যাস পড়েছিলেন এবং ঝট্টকে অহুসরণ করেই তিনি প্রথম ঐতিহাসিক রোমান্স লেখা শুরু



করেন। ‘হুগেশনন্দিনী’, ‘কপালকুণ্ডলা’, ‘সীতারাম’, ‘মৃণালিনী’, ‘রাজসিংহ’, ‘চন্দ্রশেখর’, সব বইয়ের পেছনেই একটা করে সত্য বা কল্পিত ইতিহাসের কাঠামো আছে এবং আখ্যায়িকার ব্যবস্থাপনায় Ivanhoe, Kenilworth, Quintin Durward ইত্যাদির ছায়াও স্পষ্ট। অবশ্য পরে বঙ্কিম সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং ‘বিষবৃক্ষ’, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ বা ‘রাধারানী’তে রাজা-বাদশা-নাইট প্রভৃতির কাহিনী বর্জন করেন। কোং, মিল ও বেঙ্কামের প্রভাব তাঁকে দার্শনিক ভিত্তিতে সমগ্রামূলক উপস্থাপন লিখতে প্ররোচিত করে। আর এখানেই হয় আধুনিক বাংলা উপস্থাপনের সূচনা।

বঙ্কিম যে সময়ের মানুষ, জাতির জীবনে সে একটা বিপর্যয়ের আমল। দেশের যুব-শক্তি সেদিন নিজের দেশ এবং জাতিকে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ভাবতে শুরু করেছে। এমন দিনে জাতির মনে আত্মসম্মান-জ্ঞান জাগান, তাঁর বিশ্বাস ও কর্ম-শক্তি উদ্দীপ্ত করা, তাকে গরিমাময় জাতীয় ঐতিহ্যে অমুপ্রাণিত করা বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছিল। এই প্রয়োজনের তাগিদেই বঙ্কিমের লেখনীধারণ এবং এ দিক থেকে তাঁর লেখনীর সাফল্যও অসাধারণ।

এই প্রয়োজনের তাগিদেই বঙ্কিম দেশের ইতিহাস অমুসন্ধান করেছিলেন এবং যথেষ্ট পরিমাণ ইতিহাস না পাওয়ায়, প্রয়োজন-মতো ইতিহাস গড়ে নিষে উপস্থাপন লিখেছিলেন। সমসাময়িক জীবনকে বঙ্কিম প্রথমটা আমল দেন নি এই জন্তে যে, আদর্শসৃষ্টির বা রসসৃষ্টির পক্ষে দূরত্ব যতটা সহায়ক, নৈকট্য তা নয়। কিন্তু বঙ্কিমের অবাধ কল্পনার মুখে ছিল উদ্দেশ্যের শক্ত লাগাম। তাই দূরে গিয়েও তিনি রসের গভীরে উধাও হতে পারেন নি।

সামাজিক উপস্থাপনে এসেও বঙ্কিম গল্পকে যে সম্ভাবনীয়তা দিয়ে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করেছেন, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তা যে পরিণতিতে যেতে পারত তা হতে দেননি। রোহিণী বা শৈবলিনীর চরিত্রে যে বীজ বপন করা হয়েছে, তারা তার অনিবার্য ফসল রূপে গড়ে ওঠেনি। গল্পকে উজান হাঁটিয়ে আদর্শকে জয়যুক্ত করার দিকেই যেন তাদের গতি। এ ক্রটি ঘটেছে শুধু এই কারণে যে, সামাজিক উপস্থাপনেও তিনি বেশী নজর রেখেছিলেন সমাজ-গঠনের দিকে, রস-সৃষ্টির দিকে নয়।

জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক রূপে বঙ্কিম বাংলায় চিরস্মরণীয়। তাঁর ‘দেবী চৌধুরাণী’, ‘সীতারাম’, ‘আনন্দমঠ’ জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে প্রেরণা দিয়েছে। বন্ধে মাতরম্ গৃহীত হয়েছে সারা ভারতের মর্যবাহী রূপে। যদিও তাঁর সাহিত্যে

অহিন্দু এবং অমুমত হিন্দু সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি নেই, তবু তিনি যে দেশপ্রেমিক, তা নিঃসন্দেহ।

## বঙ্কিম-সমসাময়িক উপন্যাস

বঙ্কিম-সমসাময়িকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত এবং দামোদর মুখোপাধ্যায় একদা উপন্যাসকার রূপে সমাদৃত ছিলেন। রমেশ দত্তের ‘বঙ্গ-বিজেতা’, ‘মাধবী-কঙ্কণ’, ‘রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা’, ‘মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাত’ বঙ্কিমী আদর্শে লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস। ‘সংসার’ ও ‘সমাজ’ নামে দু’খানি সামাজিক উপন্যাসও আছে তাঁর। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি উদ্দীপনাপূর্ণ। সামাজিক উপন্যাসে তাঁর হাত গোলেনি।

কিন্তু বঙ্কিম-সমসাময়িকদের মধ্যে দামোদর মুখোপাধ্যায়ের বেশ একটু বিশিষ্টতা ছিল। দামোদরের ‘মা ও মেয়ে’ বই কোন কোন দিক থেকে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের অগ্রদূত-স্বরূপ। সমাজবহির্ভূত সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কে কেন্দ্র করে জটিল জীবন-স্বন্দ্ব তিনি যতটা সাহসেব সঙ্গে ফুটিয়েছেন, সে যুগের আর কারুব লেখাতেই তা পাওয়া যায় না। তাঁর দৃষ্টির ঔদার্যও লক্ষ্য করা যাবে। দীন দরিদ্র, চাষা, ইতরলোক, খুনী, অত্যাচারী, এমন কি ব্যাভিচারিণীকেও তিনি উপেক্ষা করেননি। এটাও আধুনিকতারই পূর্বাভাস-স্বরূপ। সঞ্জীবচন্দ্রের ‘জাল প্রতাপচাঁদ’, ‘মাধবীলতা’, ‘রামেশ্বরের অদৃষ্ট’ প্রভৃতি উপন্যাসও এই সময়ের রচনা হিসাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে শেষ বইটি।

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আসতে, মাঝখানে যে ছোট্ট যুগটি পড়ে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার দাম কম নয়। প্রত্যেক যুগেই সেই যুগের নেতৃস্থানীয় লেখকদের প্রবর্তিত ধারা ধরে অজস্র বই লেখা হয়, যা সমসাময়িক রুচির বিচারে সমাদরও পায়। কিন্তু পরবর্তী কালে সে সব রচনার কোনই কদর থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র-প্রবর্তিত উপন্যাস-ধারার অমুকরণেও বাংলা সাহিত্য ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল অসার উপন্যাসে। এই আওতা থেকে উপন্যাসকে নূতন দিকে মোড় ফিরিয়ে দেবার দরকার ছিল। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘স্বর্ণলতা’ সেই কাজ করল।

## তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

এক সময় ‘স্বর্ণলতা’ বই দেশে খুব সমাদৃত ছিল। কিন্তু এখনকার পাঠক অনেকে এই উপভাসটির খবরই রাখেন না। মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথে বাংলা কাব্যের বিবর্তনে যেমন বিহারীলালের মধ্যস্থতা সবচেয়ে বেশী কাজ করেছে, উপভাসের ক্ষেত্রেও তেমনি তারক গাঙ্গুলী বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মাঝখানে অববাহিকার মতো থেকে দুটি বিশিষ্ট ধারাকে গ্রন্থিত করেছেন। বিহারীলালের ঋণ কবি স্বীকার করেছেন, কিন্তু তারক গাঙ্গুলী সম্বন্ধে তাঁর মতামত আমাদের জানবার সুযোগ হয়নি।

তারক গাঙ্গুলী এবং বিহারীলাল একই সময়ের লেখক। ১৮৭১-৭২ সালে ‘আর্যদর্শনে’ বিহারীলালের সারদামঙ্গল এবং ‘জ্ঞানাংকুরে’ তারক গাঙ্গুলীর স্বর্ণলতা ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে এই পত্রিকা দুটি পড়তেন এবং তাঁর প্রথম বয়সের রচনার ওপর এই দুটি লেখকেরই প্রভাব কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়! তারক গাঙ্গুলীর রচনার বিশেষত্ব হল, বাংলার সুপরিচিত প্রাত্যহিক জীবনকে রূপ দিয়েছেন তিনি নিপুণ চিত্রকরের মতো। গৃহস্থ-জীবনের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, ছোট ছোট ঈর্ষা-দ্বেষ, ছোট ছোট বিধা-বন্দ, বাইরে থেকে যাদের রং অত্যন্ত ফিকে, তাকেই তিনি তাঁর স্বচ্ছন্দ ভাষা ও মূললিত লিপি-চাতুর্যে সুসমাধিত করে তুলেছেন। মোটা কথা তাঁর হয়ত একটা ছিল। ভ্রাতৃ-বিরোধ জিনিসটা ভালো নয়, তাতে একান্তবর্তী পরিবারের ধ্বংস অনিবার্য, এমনি একটা কিছু হয়ত বলতেও চেয়েছিলেন তিনি এই উপভাসে। কিন্তু সেটা এতে বড়ও নয়, বিশিষ্টও নয়।

এর মূল গল্পের টানে যে সমস্ত উপ-চরিত্র বা খণ্ড-ঘটনা এসে পড়েছে, তার সমবায় গল্পটি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বেহালাওয়ালা নীলকমল, ভোতলা গদাধরচন্দ্র বা ডাকসাইটে শ্যামা চরিত্র হিসাবে নিখুঁত এবং ডিকেন্সের চেয়ে তাদের অন্ধনে কম শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। কালীঘাটেব ভিখারীর মিছিল বা পল্লীগ্রামের যাত্রার আসর শরৎচন্দ্রের লেখনীতেও আর বেশী উজ্জ্বল হত না। অবশ্য প্রধান নারীচরিত্র প্রমদা অস্বাভাবিক। তাকে নির্জলা দ্রবুঁত করেই আঁকা হয়েছে, যা বাস্তবে হয় না। যথেষ্ট পরিমাণ বাস্তব-পর্যী হয়েও, তারক গাঙ্গুলী এই জায়গায় সাবেকী ধারার অহসরণ করেছেন।

তারক গাঙ্গুলীর পর আরো কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন,

ঐদের রচনা কালক্রমে অপ্রচলিত হয়ে এলেও, বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পরিণতির মূলে তার প্রভাব কম-বেশী কাজ করেছে। ‘বঙ্গবাসী’-গোষ্ঠীর ইন্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং যোগেন্দ্র বসুর লেখা বাংলা দেশের ঘরে ঘরে এক সময় সাগ্রহ কৌতূহলে পঠিত হত। তাঁদের গল্প বানাবার নৈপুণ্য এবং সেই গল্প বলার কলা-কৌশল অপূর্ব। তখনকার শহরে সমাজের আকামি-বোকামি নিখুঁত আলেখ্য পাওয়া যায় এই সব বইয়ে।

ইন্সনাথের ‘কল্পতরু’তে চীৎপুর অঞ্চলের বাসিন্দাদের যে ছবি পাওয়া যায়, তা হতোমের পাঠকদের অচেনা নয়। কিন্তু হতোমের চেয়ে ইন্সনাথের নজর ধারাল ছিল। তিনি যাদের ঐঁকেছেন, তারা নিছক ঠাট্টার প্রয়োজনে জন্মায় নি। তারা সত্যিকার রক্ত-মাংসের মানুষ। ত্রৈলোক্যনাথের ‘কঙ্কাবতী’ এই সময়ের আর একখনি মনোরম কাহিনী। অবশ্য কিশোরপাঠ্য কাহিনী এটি। কিন্তু বড়রাও পড়ে সুখী হবেন, যেহেতু ভাবার গতি অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং মজলিস জমিয়ে গল্প বলার ধরনটিও মনোজ্ঞ।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ঐঁদের চেয়ে বড় দরেব লিখিয়ে ছিলেন। তাঁর ‘মডেল ভগিনী’ বা ‘কালার্চাদ’ বা ‘রাজলক্ষ্মী’ প্রভৃতি সত্যিকার সুরচনা। মডেল ভগিনীর ঠাট্টা-বিদ্রুপের ভেতর বিবেচ্য বিষ আছে, তিলকে তাল করে দেখানর আতিশয্য যে নেই, তা-ও নয়। তবু তার চরিত্রগুলো যথার্থ। এই যথার্থ্য থেকে ভ্রষ্ট হয় নি বলেই, স্মৃতিয়ার হিসাবে মডেল ভগিনী আজো সুখপাঠ্য। একটা বিশেষ শ্রেণীর বাড়াবাড়ি এবং সত্যতা ও সংজ্ঞার নামে ভণ্ডামিকে লেখক আক্রমণ করেছিলেন। তাই তাঁর কৌতুকের তলায় আগা-গোড়া থেকে গেছে আক্রোশের একটা ধারাল চাবুক। তবু গল্পের গাঢ়তা ও সিঁচিচাতুর্ষ্যে জিনিসটা মানিয়ে নিতে পেরেছেন তিনি।

‘কালার্চাদে’ তাঁর হাসি অনেকটা প্রাণ-খোলা, পরবর্তী কালের প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মতো। কিন্তু কালার্চাদের হাসির পেছনে একটু অশ্রুর ছোঁয়া আছে, যাতে এই বাহির-গুণ্ডা ভিতর-কোমল মানুষটির জন্তে পাঠকের মমতা জাগে। আর ‘রাজলক্ষ্মী’ ও বাংলা ভাষার একখানা প্রথম শ্রেণীর বই। ঘটনার খনখনি, গল্পের পাঁখুনি, সর্বোপরি বহু বিচিত্র ছোট-বড় চরিত্রের অবতারণায় এই দ্বিরাটকায় উপজ্ঞাসটি সত্যিই খুব বিশিষ্টতার পরিচয় দেয়। সেই রথুদয়াল এবং শিয়াল মারা, সেই নায়িকা রাজলক্ষ্মী, কার না বাপে মনোহরণ করেছে ?

## রবীন্দ্রনাথ

এবার রবীন্দ্রনাথের উপভাস-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। নিছক গল্প বলা বা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা যে উপভাস সাহিত্যের এক মাত্র লক্ষ্য নয় এবং আদর্শ নর-নারী সৃষ্টি করে, তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে জাতিকে মতের সন্ধান ও পথের নির্দেশ দেওয়াও যে উপভাসিকের সব চেয়ে বড় কাজ নয়, এ রবীন্দ্রনাথই প্রথম হাতে-কলমে প্রমাণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের উপভাস সাহিত্যকে মোটামুটি তিন পর্বে ভাগ করতে পারি। প্রথম পর্বে ‘বোঁঠাকুরাণীর হাট’, ‘রাজর্ষি’, ‘নোঁকাডুবি’ প্রভৃতি উপভাসে কবি প্রধানত লক্ষ্য রেখেছেন গল্প বলার ওপর। মনোযোগ দিয়ে পড়লেই দেখা যাবে যে, এই উপভাসগুলিতে কবি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিটিকে ঘোল-আনা খুঁজে পান নি। কবি নিজেই এসব রচনার উপর বেশী মূল্য আরোপ করেন নি। ‘বোঁঠাকুরাণীর হাট’ এবং ‘রাজর্ষি’র আখ্যানাংশ নিয়ে তিনি পরে ‘প্রায়শ্চিত্ত’ ও ‘বিসর্জন’ নাটক রচনা করে, প্রকারান্তরে ওদের বরং বাতিলই করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পর্বের স্বরূপ ‘চোখের বালি’তে এবং ‘গোরা’তে তার সম্পূর্ণতা। এই পর্বে কবি এসেছেন সমস্তা-বিচারে। সমস্তা বক্ষিও নিয়েছিলেন এবং ‘চোখের বালি’তে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্তা নিয়েছেন, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ে তিনি ঠিক সেই সমস্তাতেই হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে, শিল্প-সৃষ্টি করতে বসেও বক্ষি তুলতে পারেন নি, সামাজিক শৃঙ্খলার দায়িত্ব তাঁর হাতে। তাই তিনি একবারও খোলা চোখে বাস্তব অবস্থার বিচার করেননি। রবীন্দ্রনাথই সেই দুর্লভ সাহস দেখিয়েছেন বিনোদিনীকে বিচিত্র করে। ‘গোরা’তে তিনি জাতীয়তাবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, যে বিবেচনাহীন অন্ধতায় দেশাস্ত্রবোধ ও জাতীয়তাকে আমরা সমস্ত শুভ বুদ্ধির ওপর স্থান দিই, অনেক সময়ই তার পেছনের বনিয়াদটা কাঁচা। ‘আনন্দমঠের’ হিংস্র জাতীয়তাবাদের বিকল্প রূপেই বোধ হয় এই দৃষ্টি ‘গোরা’র প্রকাশ পায়।

তৃতীয় পর্ব ‘ঘরে বাইরে’ থেকে আরম্ভ এবং ‘চার অধ্যায়’ পর্যন্ত এরই জের চলেছে। শুধু মাঝখানে ‘শেখের কবিতা’ একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ পর্বরূপে দেখা দিয়েছে, যা রবীন্দ্র-উপভাসের ক্রমিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক

নর-নারীর চটুল জীবন নিয়ে সহানুভূতি-মিশ্রিত কৌতুক করার জুড়েই এর সৃষ্টি এবং সেদিক থেকে এ রচনাটি বিশেষ উপভোগ্য। তৃতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথ তাত্ত্বিকতাকে উপন্যাসের বাহন করেছেন। গল্প ও রসসৃষ্টি তাতে গোণ হয়ে গেছে। আধুনিক কালের যে প্রাবন্ধিক উপন্যাস ইউরোপ-আমেরিকায় বিশেষ ভাবে চলিত, এরা তাদেরই সগোত্রীয় এবং উপন্যাস রূপে না হক, সাহিত্য হিসাবে এদের উৎকর্ষ অপ্রতিবাদ শ্রদ্ধাতেই স্বীকার করে নিতে হবে।

রবীন্দ্র-উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে দু-একটা কথা বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বাস্তব সংসারের রং খুব স্পষ্ট বা উজ্জ্বল নয়। তিনি ~~যে~~ নর-নারীদের উপস্থাপিত করেছেন, তারা ঠিক রক্ত-মাংসের মানুষও নয়, তারা যেন এক-একটি ভাব-বিগ্রহ।

### রবীন্দ্র-সমসাময়িক কাল

রবীন্দ্র-সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে কয়েকজন আছেন, যাদের দান উপেক্ষার নয়। হরিশাধন মুখোপাধ্যায়ের ‘রঙ-মহল’ বই যারা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, মোগল হারেমের বিচিত্র কাহিনীগুলি তিনি কি রকম মনোজ্ঞ ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই সেলিমা বেগমের বা সবিতা-সুদর্শনের কাহিনী কোনদিন ভোলবার নয়। কি গল্পের গাঁথুনিতে, কি ভাষার ঐশ্বর্যে, এ রকম ঐতিহাসিক রোমান্স বাংলায় আর লেখা হয়নি। এরই পাশে নিতে পারি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘বেনের মেয়ে’কে। এটি বৌদ্ধ বাংলার পটভূমিতে লেখা একটি কাহিনী। বেনের মেয়ের রচনাপদ্ধতি বঙ্কিমোত্তর লেখকদের পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর কাহিনী যেমন সরল, তেমনি ক্ষুদ্র। নদীতে তুফান উঠলে বেনেনির বমি বন্ধ করার জুড়ে নদীতে পিঁপে পিঁপে গর্জন তেল ঢালা, হাতী-ঘোড়া, লোক-লস্কর নিয়ে মহা সমারোহে গুরুর আবির্ভাব, এমনি অনেক কৌতুকপ্রদ চিত্র বেনের মেয়ের সর্বত্র পাওয়া যাবে। এর ভাবাও আশ্চর্যরকম অনলংকৃত ঘরোয়া বাংলার নিদর্শন।

ঐতিহাসিক উপন্যাস-প্রসঙ্গে আর একজনের নাম অরণ্যীয়। তিনি হচ্ছেন ‘ধর্মপাল’, ‘শশাঙ্ক’ প্রভৃতির লেখক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কারক এবং বাংলা দেশের ইতিহাস-লেখক রূপেই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু সাহিত্যিক রূপেও তাঁর মর্যাদা কম হবার কথা নয়। যে কর্ণসুবর্ণ, গোড়, সপ্তগ্রাম, তান্ত্রলিপ্ত ও চম্পা নিয়ে আমাদের গব,

তার আসল পরিচয় আমরা জানি না। এই পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছেন রাখালদাস তাঁর বিভিন্ন উপত্ভাসে। ঐতিহাসিক মাল-মসলার আধিক্যে উপত্ভাসের জীহ্ননী-শক্তি ক্ষুণ্ণ হয়নি, এতে বোঝা যায় আহরণী প্রতিভার সঙ্গেই স্বজনী প্রতিভাও ছিল রাখালদাসের প্রচুর পরিমাণে।

এই সময়ের প্রসিদ্ধ গোয়েন্দা-উপত্ভাসলেখক পাঁচকড়ি দেব নামোন্নেপ প্রয়োজন। তাঁর ‘মায়াবী’, ‘গোবিন্দরাম’ একদিন অনেকে রুদ্ধক্সাস কোতুহলে পড়েছেন। পাঁচকড়ি দেব সঙ্গে আরো অনেকে গোয়েন্দা-উপত্ভাস লিখেছিলেন, যেমন যতীন পাল, সুরেন ভট্টাচার্য প্রভৃতি। কিন্তু এঁদের সব রচনাই কোন-না-কোন বিদেশী গোয়েন্দা কাহিনীর অক্ষম বাংলা সংস্করণ ছাড়া কিছু নয়। আজ বাংলা সাহিত্যের এই দিকটা খুব পূর্ণতা লাভ করেনি। অবশু দীনেন্দ্রকুমার রায়ের বৈদেশিক গোয়েন্দা কাহিনীর তর্জমাগুলি চমৎকার।

রবীন্দ্র-সমসাময়িক আমলে গার্হস্থ্য উপত্ভাস যথেষ্ট লিখিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ঋাদের নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, নারায়ণ-চন্দ্র ভট্টাচার্য, শৈলবালা ঘোষজায়া, হারাণচন্দ্র বক্ষিত, জলধর সেন, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, কুসুমকুমারী দেবী, যতীন্দ্রনোহন সিংহ প্রভৃতির বচনাব এখনো কতকটা কদর আছে।

সুরেন্দ্র ভট্টাচার্যের ‘বিনিময়’ সুখপাঠ্য রচনা, অবশু ‘স্বর্ণলতা’র হুকে লেখা। তাঁর আধ্যাত্মিক উপত্ভাসগুলিতে যোগবলে অলৌকিক কাণ্ডকারখানা করার যে সব বিববণ আছে, তা আজওবি হলেও বেশ কোতুহলোদ্দীপক। নারায়ণ ভট্টাচার্যের ‘মণির বর’ সুন্দর রচনা। পল্লী-জীবনের খুঁটিনাটি নানা বিষয় বর্ণনায় যেমন, গল্প গভায় তেমনি লেখকের হাত বেশ জোরাল। হারাণ বক্ষিতের ‘কামিনী-কাঞ্চন’ নীতিমূলক উপত্ভাস। নাটকে রূপান্তরিত হয়ে একদা তা বাংলা দেশে খুব সমাদৃত হয়েছিল। শৈলবালা দেবী এবং জলধর সেন গার্হস্থ্য জীবনেব ছোটখাটো চিত্রগুলি অত্যন্ত নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথমে ‘মঙ্গলমঠ’, ‘সেখ আন্দু’ এবং দ্বিতীয়ের ‘করিম শেখ’, ‘অভাগী’, ‘বড়বাড়ী’ এক কালে খুব জনপ্রিয় বই ছিল। এঁরা দু-জনেই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রণের দিকে দেশেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সে হল হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রশ্ন।

কুসুমকুমারী দেবীর ‘শুভ বিবাহ’ এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘দীপনিবাণ’, ‘ছিন্ন মুকুল’ প্রথম আমলের মহিলাদের লেখা উপত্ভাস হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রভাতকুমারের প্রকৃত খ্যাতি ছোট গল্প লেখক রূপে। তবে ‘মনের মানুষ’, ‘রক্তদীপ’, ‘সিঁদুর কোঁটা’ প্রভৃতি উপন্যাসও লিখেছেন তিনি এবং বিচিত্র চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশে বইগুলির বৈশিষ্ট্য অল্প নয়।

যতীন্দ্রমোহন সিংহের ‘ঋবতারা’ উপন্যাস হিসাবে উচ্চতর সম্মান দাবী করে। প্রচলিত সামাজিক সংস্কারের বিরোধী অনেক মতামতকে এই বইয়ে সাহসের সঙ্গে ভাষা দেওয়া হয়েছে। ‘সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা’ নামক পুস্তিকায় আধুনিক কালের সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালেও, লেখকের ঋবতারা কিন্তু এক হিসাবে আধুনিক উপন্যাস সাহিত্যের অগ্রদূত-স্বরূপ।

### শরৎচন্দ্র

এর পর দেখা দিলেন শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে আমরা পেয়ে-ছিলাম মানুষের সংস্কৃতিগুরু মনের কামনা-কল্পনা ও আঘাত-সংঘাতের রূপ। শরৎচন্দ্রই প্রথম পাপ-তাপ ও স্বলন-পতনের ভেতর দিয়েও মানুষের আত্মিক মহিমাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুললেন। তিনিই প্রথম বোঝালেন দেশকে যে, সমাজ-পর্যায়েরা নীচু, যাঁরা উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত, মানুষ হিসাবে তাঁরা তথাপি সন্তানদের চেয়ে কোন অংশেই খাটো নয়। যাঁরা অবস্থা-বিপর্যয়ে কিংবা কোন বিশেষ দুর্বলতার আকর্ষণে, অত্যাচার বা পাপের পথে পা বাড়িয়েছে, তাঁরা অত্যাচার অনেক সদৃশের সম্ভাবনীয়তা নিয়েও শুধু ঐ অপরাধের জন্য মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে না।

শরৎচন্দ্রের আগে এত স্পষ্ট করে এই কথা আর কেউ বলেননি। এদেশে ব্রাহ্মণ বলে, জমিদার বলে, বড় চাকুরে বলেই মানুষ চিরদিন সম্মানিত হয়েছে। বাইরের এই ঝুটা জোলুস থেকে মুক্ত, নির্বিশেষ মানুষ বলে তাঁর কোন স্বীকৃতি সমাজেও ছিল না, সাহিত্যেও ছিল না। বঙ্কিম, মাইকেলে, এমন কি রবীন্দ্রনাথেও মানুষের সর্বাত্মক মানবিক অধিকার অস্বীকৃত হয়েছে। একমাত্র দীনবন্ধুতে, আর তাঁর পর শরৎচন্দ্রে সত্যিকার মানুষ এসেছে, এসেছে তাঁর পাপ-তাপ, স্বলন-পতন, এবং সাহিত্যে তাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

যে সমস্ত জিনিস একদা ঘৃণ্য বলে দৃশ্যগত বলে, আর্টের রাজ্যে অপাংক্তেয় বলে নিষিদ্ধ ছিল, তাঁর ভেতর দিয়েই শরৎচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে। লাঠিয়াল আকবর আলি, পতিতা চন্দ্রমুখী, চান্দা গোবুর জোলা, জাতিভ্রষ্টা অন্নদাদিদি যে শরৎ-সাহিত্যের আসরে ঠিক সেই



সম্মানের দাবী নিয়েই দেখা দিয়েছেন, যেমন দিয়েছেন রমেশ, জ্যাঠাই মা, গিরিশ বা মহিম, তা 'দেবদাস', 'চন্দ্রনাথ', 'বামুনের মেয়ে', 'শ্রীকান্ত', 'পথের দাবী' প্রভৃতি উপভাসের পাঠককে বোঝাতে হবে না।

### রবীন্দ্র-শরৎ-অনুগামী উপভাস

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এর পর আর এক ধাপ এগিয়ে এসেছেন। স্বলন, পতন ও অধঃপাতকে তিনি বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহতার সঙ্গে উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষাবাদী নরেশচন্দ্র বলেন, জীবনের সত্য আর সাহিত্যের সত্য পৃথক নয়। ছায়ের মতো অন্যায়ের প্রবণতাও মানুষের সহজাত এবং তাকে মেনে নিয়েই মানুষের ইতিহাস। দরদ দিয়ে তাকে মহনীয় করে তুলতে যাওয়া অর্থহীন। বলা বাহুল্য, নরেশচন্দ্রের এই বাস্তবতার মধ্যে আতিশয্য আছে। মানুষ মাত্রই জন্মগতভাবে 'ক্রিমিনাল' নয়, আবার অবস্থা-বিপর্যয়ে উদ্ভ্রান্ত ও বিপথচালিত 'স্বভাবস্বজন'ও নয়। তা সত্ত্বেও তাঁর নির্লিপ্ত কঠোরতা, দুঃসাহস, সর্বোপরি জীবন-পর্যায়ের নিম্নতর সোপানগুলির সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ('রক্তের ঋণ', 'শান্তি', 'শুভা') পরবর্তী সাহিত্যের পথ যথেষ্ট প্রশস্ত করে দিয়েছে।

শরৎচন্দ্র ও নরেশচন্দ্রের হাত দিয়ে যখন নূতন উপভাসের ইমারত তৈরী হচ্ছে, তখনো সাবেকী গাহস্থ্য উপভাসের ধারায় হেমেন্দ্রপ্রসাদ বোষ (শ্রিয়া), শচীশ চট্টোপাধ্যায় (কুন্ডের ঝঙ্কার), ফণীন্দ্রনাথ পাল (স্বামীর ভিটা, সই মা), অম্বরূপা দেবী (মা, পোণ্যপুত্র, মন্ত্রশক্তি), নিরুপমা দেবী (অমৃপূর্ণার মন্দির, দিদি) প্রভৃতি অনেক উপভাস লিখেছিলেন। এঁদের মধ্যে অম্বরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবীর লেখা এক সময় খুব জনপ্রিয় ছিল।

সাবেকী ধারাতেও না, আবার শরৎচন্দ্র-নরেশচন্দ্রের ধারাতেও নয়, অথচ নবযুগের দৃষ্টি, দরদ ও জিজ্ঞাসা নিয়েই লেখা হয়েছিল আরো অনেক উপন্যাস। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রূপের ফাঁদ', 'হেরফের', সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কাজরী', হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'জলের আলনা' প্রেমাকুর আতর্ষীর 'বাজীকর', 'অচল পথের যাত্রী', উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাজপথ', 'অমূল তরু', মনীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা' এই সময়কার অজস্র বইয়ের মধ্যে মাত্র কয়েক খানি। কিন্তু যুগের চিন্তা ও জীবন-বেদনা গভীর ভাবে রূপ পায়নি এই সব লেখায়। ফুরুরে যেজালে ও ঝরঝরে ভাষায় লেখা মনোরম মধ্যাহ্ন-পাঠের উপভাস এগুলি।

## আধুনিক কাল

এর পর আধুনিক যুগ। এযুগের সাহিত্য সুরু হল প্রবল একটা বিদ্রোহের উত্তাপ নিয়ে। ধর্ম, নীতি ও সংস্কারের, সমাজ, সম্পর্ক ও সদাচারের পুরাতন মূল্যমান নতশিরে যেনে নিলেন না এ যুগের লেখকরা। সব কিছু ভেঙেচুরে বিশ্লেষণ করে যাচাই করে নিতেই অগ্রণী হলেন তাঁরা। ফ্রেয়েডীয় বিজ্ঞান ও মার্কসীয় দর্শন থেকে এল এই নূতন যুগ-চেতনা এবং বাংলা উপন্যাস ও গল্প-সাহিত্যে সেই চেতনা প্রকাশ পেল।

নিঃস্ব বিড়ম্বিত সমাজভ্রষ্ট মানুষের কথা এর আগেও লেখা হয়েছে বাংলা ভাষায়। কিন্তু আগের যুগে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিচ্ছন্ন ছিল না অনেকের। তাছাড়া স্ননীতি-দুনীতির একটু দ্রব মান মানতেন তাঁরা। তাই সেদিনের সাহিত্যে সমবেদনাপূর্ণ মানবতার বাণী পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান সমাজ ভেঙে নূতন সমাজ গড়াব যে চেতনা এল এ যুগে, তা সম্পূর্ণ নূতন জিনিস।

নূতন বলেই এতে ভালোমন্দ দুটো দিকই ছিল এবং এ সাহিত্যের নিন্দা-প্রশংসাও হয়েছে অনেক। এই আমলের লেখকরা সাধারণ ভাবে ‘কল্লোল’ ও ‘কালি-কলমে’র দল নামে পরিচিত, যদিও সবাই এই দুই পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন না। এঁদের মধ্যে জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সাহা, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

জগদীশ গুপ্তের ‘তাতল সৈকতে’, ‘স্বতিনী’, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাচালী’, ‘দৃষ্টিপ্রদীপ’, ‘আরণ্যক’, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘স্বর্গাদপি গরীয়সী’, তারাশংকরের ‘পঞ্চগ্রাম’, ‘গণদেবতা’, ‘হাসুলি বাকের উপকথা’, শৈলজ্ঞানন্দের ‘মহাযুদ্ধের ইতিহাস’, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘উপন্যাসন’, প্রবোধকুমার সান্যালের ‘নদনদী’, ‘হাসুবাহু’, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘কাক-জ্যোৎস্না’, ‘বিবাহের চেয়ে বড়’, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দিবারাত্রির কাব্য’, ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ আধুনিক কালের সুপরিচিত উপন্যাস।

তারাশংকরের রচনায় কবিত্বাল, লাঠিয়াল, বাউল, বেদে ও বাপ্পী সমাজ সম্বন্ধে গভীর অভিজ্ঞতার পরিচয় মেলে। শৈলজ্ঞানন্দ এঁকেছেন সাঁওতাল

কুম্মী ও কয়লাখাদের মজুরদের জীবন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সাত্তাল ও অচিন্ত্য সেনগুপ্ত শহরের বস্তিবাসী নিম্নবিত্ত অলিভনীতি সাধারণ মানুষদের জীবনকে রূপায়িত করেছেন। মাণিক এঁকেছেন কুলি-মজুর ও নিরন্ন দেহপ্রেমী মানুষদের ছবি। জগদীশ গুপ্তের রচনায় পাই ছুনীতি, অশ্বায় ও অনাচারের পক্ষে আকর্ষণীয় মগ্ন মানুষের প্রতি অকপট দরদ। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবা দিয়েছেন মানুষের অন্তর্নিহিত স্বপ্ন রসামুভূতি ও প্রকৃতি-প্রেমকে।

সবাই এঁরা কৃত্তী লেখক। কেউ বাস্তবপন্থী, কেউ রোমান্টিক, কিন্তু প্রত্যেকেই শক্তিমান ও জীবন-দরদী শিল্পী। এঁদের সঙ্গেই আছেন সরোজকুমার বায়চৌধুরী, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বসী, রামপদ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ আরো অনেক লেখক-লেখিকা, যারা সমসাময়িক পাঠকদের প্রিয়।

দিলীপকুমার রায় (‘মনেব পরশ’, ‘দোলা’) অম্লদাশঙ্কর রায় (‘সত্যাসত্য’), ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (‘আবর্ত’), বুদ্ধদেব বসু (‘যেদিন কুটল কমল’), গোপাল হালদার (‘একদা’) প্রমুখ লেখক লিখেছেন বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক নর-নারীর কাহিনী, যাতে বাগ্‌বৈদম্ব্য ও বিচার-বিতর্ক গল্পের চেয়ে বেশী প্রাধান্য নিয়েছে। এঁদের উপত্যাসে পাওয়া যায় মানুষের মনোজগতের বিচিত্র ভাঙাগড়ার আলোচনা। বস্তু সংসার ও বাস্তব জীবন সব জায়গায় জীবন্ত হয়ে ওঠেনি।

একেবারে আজকের লেখকদের মধ্যে সুবোধ ঘোষ (‘শতভিষা’, ‘তিলোত্তমা’), সতীনাথ ভাট্টা (‘জাগরী’), নাবায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (‘উপনিবেশ’), অদ্যুত (‘মরুতীর্ষ হিংলাজ’), বিমল মিত্র (‘সাহেব-বিবি-গোলাম’), হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (‘ইরাবতী’), বরেন বসু (‘রংকট’), শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় (‘এ জন্মের ইতিহাস’), সমরেশ বসু (‘গঙ্গা’) প্রমুখের লেখাও বিষয়-বৈচিত্র্য এবং রচনা-নৈপুণ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

## সপ্তম অধ্যায়

### গল্প

বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্কিম-সমসাময়িক লেখকরাই বাংলায় উপন্যাস সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আগে ছোটগল্প-রচনার দিকে কারো দৃষ্টি পড়েনি। কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হতোম পাঁচাচা নক্সা’য় এবং বঙ্কিমের ‘লোক-রহস্তে’র কতকগুলি রচনায় ও ‘কমলাকান্তের দপ্তরে’ মাঝে মাঝে ছোটগল্পের খাঁচা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত ছোট গল্প বলা যায় না তার কোনটাকেই। সঞ্জীবচন্দ্রের ‘রামেশ্বরের অদৃষ্ট’, দীনবন্ধু ‘পোড়া মহেশ্বর’, বঙ্কিমের ‘যুগল-অমুরীয়’ ছোট আখ্যায়িকা। গল্প বলতে যে শ্রেণীর রচনা বোঝায়, তা থেকে এরা স্বতন্ত্র জাতের জিনিস।

সাপ্তাহিক ‘হিতবাদী’তে রবীন্দ্রনাথই প্রথম ছোট গল্প লেখা শুরু করেন। তাঁর সমসাময়িক ও অমুগামীরা এ পথে অমুসরণ করেছেন তাঁকেই। সুরেশ সমাজপতি, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, সূর্য্যনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে প্রভাতকুমার বিশিষ্ট গল্পলেখক রূপে যশস্বী। রবীন্দ্রনাথের গল্পে মানব-জীবনের বিচিত্র ভাবানুভূতিগুলি রূপ পেয়েছে। প্রভাতকুমার রূপ দিয়েছেন তাব রৌদ্রোজ্জ্বল কোতুলকের দিকগুলিকে। অবশিষ্টেরা সকলেই লিখেছেন গার্হস্থ্য জীবনের বিবিধ সুখ-দুঃখের কাহিনী।

এই সময় থেকে বাংলার বিদেশী গল্প-সাহিত্যেরও ব্যাপক অনুশীলন আরম্ভ হয় এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরী ফরাসী সাহিত্যের অনেক বিখ্যাত গল্প বাংলায় অনুবাদ করেন। প্রমথ চৌধুরীর অনুদিত ফরাসী গল্প ‘ফুলদানি’ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত ব্যালজাক, মোপাসাঁ, গতিয়ে, দোদে প্রমুখ ফরাসী লেখকের গল্পানুবাদ অনেকেই পড়ে থাকবেন। একদিকে রবীন্দ্রনাথের মূল গল্প, অল্পদিকে এই সব অনুবাদ-গল্পই বাংলা সাহিত্যে প্রথম নিয়ে আসে গল্প-রচনার একটি নূতন বেগ। ছোট-বড়-মাঝারি অসংখ্য গল্পলেখকের আবির্ভাব হয়। এই নূতন লেখকদলের মধ্যে সর্বপ্রধান

নাম শবৎচন্দ্রের। সমাজ-জীবনের নানা জটিল সমস্যাকে, নানা কু-অভ্যাস ও কদাচাবেব দৌরাত্ম্যকে তিনি গল্পে মাধ্যমে ফুটিয়েছেন। অথচ শিল্পগুণ-ভ্রষ্ট হয়ে তাঁর গল্প প্রচারধর্মী হয়নি কোথাও। শবৎ-সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্রব আতথী, হেমেন্দ্রকুমার বায় প্রভৃতিব গল্পও এক সময় বিশেষ লোকপ্রিয় ছিল।

আধুনিক কালের কথাসাহিত্যিকরা প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরব পৃথিবীর সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান থেকে নূতন জীবন-দর্শনের দীক্ষা পেয়েছেন। এঁদের গল্পে তাই যেমন মনোবিকলনের জটিলতা এসেছে, তেমনি এসেছে বাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিব প্রভাব। তাহাড়া গল্পেব গঠনশৈলী নিয়েও এঁরা প্রভূত পরীক্ষা কবেছেন। এঁদের মধ্যে জগদীশ গুপ্ত, তাবিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সাত্তাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। হাসিব গল্পে পরপ্তবাম নিজস্ব একটি সমাদবেব আসন লাভ কবেছেন।

আজ সাহিত্যেব আব সব বিভাগেব চেয়ে গল্পেব বিভাগটিই বেশী সমৃদ্ধ হয়েছে এবং অধিকাংশ লেখকই মন দিয়েছেন গল্প লেখায়। এঁদের মিলিত দানে গল্পেব কাঙ্কলা এমন জাষণায় উন্নীত হয়েছে যে, বাংলা গল্প আজ অনায়াসে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পেতে পাবে। অতি সাধারণ স্তবেব লেখকেব হাতেও আজ গল্প কোথা থেকে আবিস্কৃত কবতে হয়, কোথায় শেষ কবতে হয়, কতটুকু তাতে বলতে হয়, সেই মায়াক্ষান এসেছে।

## রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের গল্প সংখ্যায় যেমন প্রচুর, বৈচিত্র্যে যেমনি অসাধারণ। এক দিকে তিনি যেমন মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের সুখ-দুঃখের বিচিত্র চিত্র মেলে ধবেছেন তাঁর গল্পেব মধ্যে, অন্যদিকে তেমনি দূরবর্তী রোমান্সের পটভূমিতে প্রক্ষেপ কবে মানব-জীবনের নানা আশা-আশঙ্কা ও বেদনাকে রূপ দিয়েছেন। ‘দিদি’, ‘ঠাকুর্দা’, ‘আপদ’, ‘পোস্ট মাস্টার’, ‘মাল্যদান’, ‘কাবুলিওয়ালা’ প্রভৃতি গল্প হল প্রথম দিকের এবং ‘কুণ্ডিত পামান’, ‘নিগিধে’, ‘হুবাশা’, ‘মণিহাবা’, দ্বিতীয় দিকেব অল্পম নিদর্শন। নীতিগল্প হিসাবে ‘গুপ্তধন’, কৌতুক-গল্প

হিসাবে ‘ইচ্ছাপূরণ’, ‘অধ্যাপক’ এবং রোমাঞ্চ-গল্প হিসাবে ‘কঙ্কাল’ তাঁর অরণীয় রচনা। ‘মেঘ ও রৌদ্র’ও অদ্বিতীয় প্রেমের গল্প।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় ছোটগল্পের প্রবর্তক এবং তাঁর স্বকীয় ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকও তিনি। কিন্তু বাংলা গল্প সাহিত্য গত অর্ধশতাব্দীতে এত পথ এগিয়ে এসেছে যে, রবীন্দ্রনাথের গল্প অধুনিক পাঠকের কাছে একটু সাবেকী না লেগে পারে না। প্রথমত তা ঘটটা কাব্যধর্মী, ততটা বস্তুরমী নয়। তাই সর্বত্র সত্যকার জীবন চিত্রিত হয়েছে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত তাতে বাগ্‌বিচারের মাধ্যমরূপে সাধু ভাষার ব্যবহার সব সময় রুচিকর ঠেকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ‘গল্পগুচ্ছে’র গল্পগুলির অসামান্য শিল্পগুণ আজও তাদের বাসি হতে দেয়নি।

### প্রভাতকুমার

প্রভাতকুমার প্রধানত কোতুক-রসের গল্প লিখেই প্রসিদ্ধ। তাঁর ‘রসময়ীর রসিকতা,’ ‘বলবান জামাতা,’ ‘মাস্টার মশায়,’ ‘নিষিদ্ধ ফল’ প্রভৃতি গল্প বিস্তৃত কোতুক-গল্প হিসাবে ছোট-বড় সবাই উপভোগ করতে পারেন। কোতুকের আড়ালে গ্লেশ বা বক্র ইঙ্গিত নেই কোথাও। কোথাও নেই কোন দেশাচার বা অল্লেখ্য ও অনোচিত্যের ওপর কণাঘাতের চেষ্টা। অজস্র অক্ষুন্ন রঙ্গ ও রসিকতায় ঝলমল-করা তাঁর গল্প। হয়ত গভীরতা তাতে কম, কিন্তু বিচিত্রতার অভাব নেই। অবশ্য গভীর ব্যঙ্গনার গল্পও তিনি লিখেছেন, যেমন ‘ফুলের মূল্য,’ ‘কুমুদের বন্ধু’ যেমন ‘আদরিণী’। কিন্তু তাঁর লেখনীর বৈশিষ্ট্য হাল্কা লেখায় যত ফুটেছে, গভীরে তা নয়।

প্রভাতকুমারই একটা জিনিস বাংলা সাহিত্যে নূতন আমদানি করেন। সে হল বিলাত-প্রবাসী বাঙালীর এবং বাঙালীর মাধ্যমে আশ্রিত বিদেশীর জীবন নিয়ে গল্প। ‘ফুলের মূল্য’ ও ‘কুমুদের বন্ধু’ এই দিককারই সর্বোত্তম নিদর্শন। মোটের ওপর ‘বলবান জামাতা,’ ‘রসময়ীর রসিকতা’ এবং ‘দেশী-বিলেতী,’ এই তিনটি সংগ্রহ ধারা আজও পড়বেন, তাঁরা যে একই সঙ্গে প্রীত ও প্ররক্ত হবেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। প্রভাতকুমার ছিলেন সত্যকার গল্পী, তিনি গল্প বলতেন। গল্পকে আশ্রয় করে আর কিছু বলতেন না।

## অগাধ লেখক

প্রভাতকুমারের সমবয়সীদের মধ্যে অনেকেই ছোট গল্প লিখেছেন এবং এক সময় দেশে তাঁদের গল্পের বেশ আদরও ছিল। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ‘পল্লীচিত্র’, ‘পল্লীচরিত্র’ ও ‘পল্লীবৈচিত্র্যের’ খণ্ড-চিত্রগুলি ঠিক গল্প না হলেও, কতক-গুলিতে বেশ সুগঠিত গল্পের কাঠামো পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর ‘সেকলে-ডেপুটী’, জলধর সেনের ‘চোখের জল’, ‘এক পেয়ালা চা’, সুদীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘কাসিমের মুরগী’, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ‘ভাগ্যহীনা’ প্রভৃতি গল্পগুলিও যে-কোন আধুনিক সংগ্রহে সাদবে গৃহীত হতে পারে। ভাগলপুরের সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কয়েকটি গল্পও এক সময় উচ্চ প্রশংসায় সজ্জিত হয়েছিল। আজও কিছু গুজ্জল্য আছে তাদের।

## শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবে কথাসাহিত্যের রুচি ও অনুরাগ মানুষের এমন ভাবেই বদলে গেছে যে, আগের অধ্যায়ের ভালো লেখাগুলো সম্বন্ধেও তাঁদের আজ মনোযোগ শিথিল হয়েছে। নূতন প্রতিভার আবির্ভাবে এ জিনিস হয় সব দেশেই। নূতনকে গ্রহণের মস্ত ভাষা মানুষ পুবানোকে এক মুহূর্তে ভুলে যান।

শরৎচন্দ্র বিশুদ্ধ ছোট গল্প সংখ্যায় বেশী লেখেননি। ‘দেবদাস’, ‘চন্দ্রনাথ’, ‘ধামুনের মেয়ে’, ‘পল্লীসমাজ’, সবই তাঁর ছোট উপজ্ঞান। তবে ‘বিন্দুর ছেলে’, ‘রামের স্মৃতি’ গল্প, যেমন ‘মহেশ’, ‘ঈদারো আলো’, ‘ছবি’ এবং ‘সতী’ও গল্প। এর মধ্যে মহেশ গল্পই তাঁর সব চেয়ে জীবন্ত ও যুগচিন্তা-সম্মত। নিরম চান্দী-জীবনের বেদনা এবং সমৃদ্ধ উঁচু সমাজের জুলুম গল্পটির মধ্যে যেন মূর্তি ধরেছে। একটি মুক গুরুকে তিনি এই গল্পে গড়েছেন মানুষের দোসর করে। বিন্দুর ছেলের বিন্দু এবং রামের স্মৃতির নারায়ণী শরৎ-সাহিত্যের সুপরিচিত মাতৃভাবাপন্ন নারীর প্রতীক হলেও এবং আয়তনে একটু দীর্ঘ হলেও, এ গল্প দুটিও সুন্দর। বিশেষত রামের স্মৃতি। সতী গল্পটিও জোরাল এবং তার ভেতর একটি বলিষ্ঠ প্রশ্ন তুলে ধরেছেন শরৎচন্দ্র। তথাকথিত সত্যিক পূর্ণ নারীত্বের চেয়ে বড় কিনা?

কিন্তু আঙ্গিকের দিক থেকে নিখুঁত ছোট গল্প, যা ছোটও হবে এবং কোন উপন্যাসের খণ্ডবিশেষও হবে না, শরৎচন্দ্র কমই লিখেছেন। তিনি আসলে ঔপন্যাসিক।

### প্রমথ চৌধুরী

শরৎচন্দ্রের পাশাপাশি গল্পলেখক-রূপে উল্লেখযোগ্য প্রমথ চৌধুরীর নাম। বাংলা দেশের ও বাঙালী সমাজের অন্তরঙ্গ পরিচয় তাঁর বেশী জানা ছিল না। ঘটনা ও চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যে তাঁর রবীন্দ্রনাথের মতো কাব্যকলা বা শরৎচন্দ্রের মতো জীবনবোধও নেই। তবু তাঁর কোন কোন গল্পে যে অসাধারণত্বের চমক দেখা যায়, তা প্রথম দু-ছনের লেখায় মেলে না।

প্রমথ চৌধুরীই বাংলার একমাত্র লেখক, যার রচনায সঁা তসঁৈতে তাবালুতা নেই, আবার কাতুকুতু-দেওয়া খেলো ভাঁড়ামিও নেই। অথচ জীবনের ব্যথা-বেদনাকেও তিনি যেমন রূপ দিচ্ছেন, তেমনি তার ভাকামিকেও যা দিচ্ছেন। ‘চার ইয়ারী কথা’, ‘নীল-লোহিতের আদি প্রেম’, ‘ঘোষালের ত্রি-কথা’, যে-কোন গল্পসংগ্রহ হাতে নিলেই তাঁর এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে।

অবশ্য প্রমথ চৌধুরীর অনেক গল্প আছে, যা গল্পাকারে আলোচনা মাত্র। কতক আছে নিছক খোসগল্প বা বৈঠকী গল্প। এগুলো শুধু তাঁর লিপি-চাতুর্ঘ্যেই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। হয়ত নিষ্ঠা-সহকারে গল্প লিখলে, বাংলা সাহিত্যকে তিনি প্রচুর সম্পদ নিম্নে যেতে পারতেন। ‘আছতি’, ‘ট্র্যাজেডীর সূত্রপাত’, ‘সহযাত্রী’, ‘বীণাবাদি’ যার লেখনী-নিঃসৃত, তিনি যে নিঃসংশয়ে রবীন্দ্র-শরৎ-পর্যায়ের কথাসাহিত্যিক, এতে আর সন্দেহ নেই।

### রবীন্দ্র-শরৎ-পরিমণ্ডল

রবীন্দ্রনাথের কাব্যরস, শরৎচন্দ্রের জীবনবোধ ও প্রমথ চৌধুরীর বাগ্‌ভঙ্গি, এই তিন একযোগে পরবর্তী কালের গল্প সাহিত্যে নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত করে দিল। সব চেয়ে বেশীসংখ্যক লেখকই এর পর থেকে অবহিত হলেন গল্প-লেখায় এবং ভালো-মন্দ-মাঝারিতে এই সময় বাংলা গল্পের পুঁজি যা সৃষ্টি হল, তার মূল্য নিতান্ত অল্প নয়।

শরৎচন্দ্র যখন ‘গমনায়’ নূতন নূতন গল্প-উপন্যাস লিখছেন, ‘ভারতী’তে তখন চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাস্কর আতর্গী,



মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ লেখকও গল্প লেখায় অবদিত হন। এক মণিলাল ছাড়া এঁরা আর সকলেই অধিকতর মনোযোগ দিয়েছেন উপন্যাস লেখায়। কিছু ভালো গল্প কিছু কিছু আছে সকলেরই। আছে সরোজনাথ বোস, মাণিক ভট্টাচার্য প্রভৃতিরও। একটি সংকলন-গ্রন্থে এঁদের রচনা-নিদর্শন গ্রথিত করা হলে, তা অমূল্যভোগ্য হবে না।

### ‘কল্লোল’ ও ‘কালি-কলম’-দল

কিন্তু এর পরের ধাপেই এল প্রকৃত গল্প সাহিত্যের জোয়াব এবং ‘কল্লোল’ ও ‘কালি-কলম’ থেকে যারা নূতন গল্পলেখক রূপে দেখা দিলেন, আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের তাঁরাই শ্রেষ্ঠ গল্পকার। জগদীশ গুপ্ত, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্নাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ লেখক এলেন এই সময়। তখনকার দিনে এঁদের নাম ছিল ‘তরুণ’ এবং তরুণ কথাতার ব্যবহাব হত নিম্নার্ধে।

নিম্নার কারণ, এঁরা প্রচলিত ঐতিহ্য অমূল্যবোধ না করে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদ-অনুযায়ী সাহিত্য-রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এক দিকে সমাজের যারা দ্বিষিত, নিগৃহীত, উপেক্ষিত, সেই সমস্ত চোর, ডাকাত, ভিক্ষুক, পতিতা এবং কুলি, মজুর, বাগদী, ডোম, সাপুড়ে, তাদের জীবন নিয়ে গল্প লেখা শুরু করেন তাঁরা। অন্য দিকে জীবন ও সমাজের যেগুলো স্বীকৃত মূল্যমান, প্রেম, মনুষ্যত্ব, সত্যত্ব, তার দর যাচাই শুরু করেন তাঁরা বাস্তবের কষ্টপাথরে। এই দুই কারণেই রক্ষণশীল সমাজের চিত্ত বিচলিত হয়েছিল। যদিও তাঁদের শক্তি নজর এড়ায় নি কারুর।

অবশ্য নূতন আদর্শ-প্রবর্তনের তাগিদে এঁরা সেদিন আতিশয্য করেছিলেন অনেক ক্ষেত্রে। তাছাড়া যে মার্ক্সবাদ-প্রভাবে সমাজ-বিপ্লব ও ক্রিয়েডবাদ-প্রভাবে চিন্তা-বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন তাঁরা, তার সফল সম্যক অভিজ্ঞতাও ছিল না তাঁদের। তাই নূতনের নেশা যত বড় হয়েছিল, নূতন সৃষ্টি তত বড় হয়নি। তবে সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন অনেকেই এবং সার্বিক সৃষ্টি করে যশস্বীও হয়েছেন। জগদীশ গুপ্তের ‘বিনোদিনী’, ‘তৃষিত স্বকণী’, তারাশংকরের ‘জলসা ঘর’, ‘বেদেনী’, শৈলজানন্দের ‘কমলাকুঠি’, ‘বধুবরণ’, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘পুতুল ও প্রতিমা’, ‘মৃত্তিকা’, প্রবোধকুমারের ‘নিশিপদ্ম’,

অচিন্ত্যকুমারের ‘হাড়ি-মুচি-ডোম’, ‘কাঠ-খড়-কেরোসিন’, গল্প-সংগ্রহ হিসাবে বাংলা সাহিত্যের অরণীয় গ্রন্থ।

বিত্তভিষণ মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), সরোজ-কুমার রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ বসী, মনোজ বসু, রামপদ মুখোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রমুখ আরো বহু কৃতী গল্পলেখক উঠেছেন এই সময়ে। উঠেছেন বয়সে প্রবীণ হলেও পরশুরাম (রাজশেখর বসু), ঝাঁর ‘কজ্জলী’, ‘গড়্‌ডালিকা’, ‘হনুমানের স্বপ্ন’ বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন দিকের দরজা খুলে দিয়েছে। বঙ্গ-দর্শনের বিদ্যুৎ-ঝলকে উদ্ঘাটিত করেছেন তিনি সমাজ ও মানুষের নানা অচেনা দিক।

### বর্তমান অধ্যায়

‘কল্লোল’, ‘কালি-কলমে’র সান্নাধ্য পরে দেখা দেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাসে অধিকতর খ্যাতিমান হলেও, গল্পলেখক হিসাবেও তাঁর বৈশিষ্ট্য কম নয়। ‘তরুন’ সাহিত্যের ঐতিহ্যই তিনি বলিষ্ঠতর পৌরুষে অহুসরণ করেছেন এবং ঘৃণা, কুংসিত ও বর্জনের মূলক থেকেও সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। ‘প্রাগৈতিহাসিক’ তাঁর সর্বোত্তম গল্পগ্রন্থ। শেষের দিকে তাঁর লেখায় রাজনৈতিক মতবাদের প্রাধাত্য এসেছিল, এসেছিল কিছুটা ক্রোদাসক্তিও। তা সত্ত্বেও তাঁর প্রতিভার অনন্যসাধারণ নিজস্বতা অমান ছিল।

সুবোধ ঘোষ, জ্যোতির্ময় রায়, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিমল মিত্র, আশিস গুপ্ত, আশাপূর্ণা দেবী, জ্যোতির্মলা দেবী প্রভৃতিও গল্প সাহিত্যে যথেষ্ট নূতন সম্পদ দিয়েছেন। সুবোধ ঘোষের ‘ফসিল’, ‘পরশুবামের কুঠার’, জ্যোতির্ময় রায়ের ‘পদ্মনাভ’, আশিস গুপ্তের ‘বন্দিনী স্তব্ধা’ এবং আশাপূর্ণা দেবীর ‘জল আর আগুন’ ইদানীন্তন গল্পসংগ্রহগুলির মধ্যে শীর্ষ স্থান নিতে পারে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুধীরজ্ঞন মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ ঘোষ, সুশীল জানা, বাণী রায়, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু, সুলেখা সান্মাল, ননী ভৌমিক, প্রফুল্ল রায় প্রভৃতি আসেন এঁদের পরে এবং এঁরাই এখনো পর্যন্ত বাংলার আধুনিকতম গল্পলেখক। এঁদের মধ্যে নারায়ণের ‘বীতংস’ ও নরেন্দ্রের ‘চড়াই-উৎরাই’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই। উভয়েই, বিশেষত নারায়ণ প্রকৃত শক্তিশালী লেখক এবং তাঁর কাছে কারো প্রত্যাশা ফুরায়নি।

## অষ্টম অধ্যায়

### শিশু-সাহিত্য

শিশুদের জন্তে পৃথক করে সাহিত্য-রচনার প্রয়োজন বাঙালী লেখকরা বিগত শতাব্দীতে অনুভব করেন নি। তখন ছেলেমেয়েদের জন্তে শুধু পাঠ্য-পুস্তকই লেখা হত। বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালংকার, মনোমোহন বসু, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, সকলেই সে কাজ করেছেন। শিশুদের আনন্দ ও কৌতূকের ভেতর দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন প্রথম অনুভব করেন রবীন্দ্র-যুগের লেখকরা। এঁদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সবকার, কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি হলেন পথপ্রদর্শক।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও শিশুদের জন্তে বিভিন্ন সময়ে কলম ধরেছেন। শিশু-সাহিত্য-রচনা রবীন্দ্র-প্রতিভার ক্ষেত্রে একটা গোণ দিক সন্দেহ নেই, কিন্তু এই একটি দিকেও তাঁর অসাধারণতা সামান্য নয়।

আজকের বিশিষ্ট লেখক ধারা, তাঁরা সকলেই কিছু-না-কিছু লিখেছেন ছোটদের জন্তে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ‘প্রাগাধুনিক’ লেখকরাই হন, আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ আধুনিক লেখকরাই হন, বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরীদের জন্তে কিছু কিছু গল্প, কবিতা লিখেছেন সকলেই। আধুনিক লেখকদের মধ্যে গল্পে শিবরাম চক্রবর্তী এবং কবিতায় সুনীল বসুর বিশেষ একটু খ্যাতি আছে।

আজকের শিশু-সাহিত্যে একদিকে যেমন কবিতা, গল্প ও উপন্যাসের প্রাচুর্য হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই দেশ-বিদেশের ইতিহাস, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিত্তাকর্ষক তথ্য পরিবেষণ করা হচ্ছে এবং সে কাজও করছেন কৃতী লেখকরা। শিশু-সাহিত্য রচনা করেই বিশ্বসাহিত্যে বরণীয় হয়েছেন যে সব লেখক। তাঁদের সমকক্ষ প্রতিভাধরদের আজও অবশ্য আবির্ভাব হয়নি বাংলা সাহিত্যে। তবে ভবিষ্যতে হবে না, কে বলতে পারেন ?

রবীন্দ্র-যুগের আগে বাংলাদেশে ছোটদের জন্মে পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্য কোন রকম বই ছিল না। বিদ্যাসাগরের ‘কথামালা,’ ‘বোধোদয়,’ ‘আখ্যানমঞ্জরী,’ অক্ষয় দত্তের ‘চারুপাঠ,’ মদনমোহন তর্কালংকারের ‘শিশুশিক্ষা,’ রামসুন্দর বসাকের ‘বাল্যশিক্ষা,’ মনোমোহন বসুর ‘পঞ্চমালা’ ইত্যাদি বই এ দেশে সবাই পড়েছেন ছেলেবেলায়। একটু ওপরের দিকে উঠে তাঁরা পেয়েছেন বিদ্যাসাগরের ‘সীতার বনবাস,’ তারশংকরের ‘কাদম্বরী’ ও শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের ‘রামের রাজ্যাভিষেক!’ আরও ওপরে উঠে পড়েছেন মাইকেল, দীনবন্ধু ও বঙ্কিম-চন্দ্রের রচনাবলী। পাঠ্যপুস্তকের এলাকার বাইরে মাহুঘের ক্রমবর্ধনশীল বয়স ও বুদ্ধিকে সাহিত্যের মাধ্যমে চালিত করার কথা সেদিন ভাবাই হয়নি।

‘বীবরের বাসস্থান,’ ‘মিথ্যাকথা বলার পরিণাম,’ ‘উইলিয়ম রস্কোর ‘অধ্য-বসায়’ বা এই ধরনের গুরু-গভীর রচনার ভাৱে দেশের ছেলে-মেয়েরা যেদিন ইঁপিয়ে উঠেছিল, সেদিন রবীন্দ্রনাথের ‘শিশু,’ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রাজ-কাহিনী,’ দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের ‘ঠাকুরমার ঝুলি,’ যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ‘হাসিখুসি,’ ‘বনে জঙ্গলে,’ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ‘টুনটুনির বই,’ নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের ‘টুকটুকে রামায়ণ’ দেশের ছেলে-মেয়েদের সামনে সত্যিই একটা নূতন রাজ্যের দরজা খুলে দিয়েছিল। ছড়া, কাহিনী, রূপকথা, গল্প একদিকে করেছিল তাদের বয়সোচিত ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন, অন্যদিকে জাগিয়ে দিয়েছিল তাদের অহুভুতি ও কল্পনাকে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক অরগীয় ঘটনা।

## রবীন্দ্রনাথ

‘শিশু’ ও ‘শিশু ভোলানাথে’ রবীন্দ্রনাথের যে সব কবিতা স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে ‘তালগাহ,’ ‘কাগজের নৌকা,’ ‘খোকার বনবাস’ প্রভৃতি বিস্ময়কর শিশু কবিতা অনেকগুলি পাওয়া যাবে। কিন্তু অধিকাংশ কবিতার বিষয় শিশু হলেও, শিশু সব সময় তার পাঠক নয়। বিস্ময়কর শিশুসাহিত্য রবীন্দ্রনাথ লেখেন শেষ জীবনে। ‘খাপছাড়া,’ ‘ছড়ার ছবি,’ ‘সে,’ ‘গল্পসল্প,’ এই কটি হল তাঁর এই রাজ্যে অভুলনীয় দান। নিজের বাল্যকাহিনী নিয়ে লেখা ‘ছেলেবেলা’ও উল্লিখিত হতে পারে এই সঙ্গে। রঙে, রসে ও সুরে গম্ভ-পম্ভ এই বইগুলি রবীন্দ্রনাথের সর্বোত্তম রচনাবলীর সঙ্গে একাসন পেতে পারে। বানান ও বাক্যরচনা শেখানোর জন্তে লেখা ‘সহজ পাঠ’ও তাঁর অসাধারণ বই।

সেই,

কুমোরপাড়ার গোকুর গাড়ী  
বোঝাই করা কলসী-হাঁড়ি,  
গাড়ী চালায় বংশীবদন,  
সঙ্গে চলে ভাগনে মদন...

কিংবা,

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে,  
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে...

শুধু ছোটদের কেন, বড়দেরও মুগ্ধ করে রাখা উচিত।

### অবনীন্দ্রনাথ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পজনোচিত রঙিন ভাষা, কথা দিয়ে ছবিব পর ছবি এঁকে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, একদিকে প্রতিটি কথায় কাব্যের সুষমা বৃষ্টি কবে চলা, অল্পদিকে এক-একটি কলমের টোনে মাটির পৃথিবীকে অপরূপ কবে ফোটান বাস্তবিকই অতুলনীয় কারুকার্যেব নিদর্শন। ‘ক্ষীরের পুতুল’, ‘নালক’, সর্বোপরি ‘রাজকাহিনী’ না পড়লে বাংলা গল্পের এই কাব্যময় অল্পম রূপটির সঙ্গে পরিচয় হয় না। ‘রাজকাহিনী’ সত্যিই এক অসাধারণ বই।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের ভাষাও চমৎকার। রূপকথা বলার যে নিজস্ব ঢঙটি এদেশে ঠাকুরমা-দিদিমার মুখে মুখে চলিত ছিল, দক্ষিণারঞ্জন তাকেই সাহিত্যে স্থাপনা করেছেন। বিগুপ্ত বাংলা-রচনাশৈলীর জোর এবং জোলুস কতটা, তার স্বাক্ষর আছে ‘ঠাকুরমাব খুলিতে’। যোগীন সরকারের জীব-জন্তদের গল্প, তাদের অদ্ভুত বুদ্ধি ও অদ্ভুততর কার্য-কলাপের কাহিনী স্মরণ বটে, কিন্তু সবচেয়ে স্মরণ তাঁর ‘হাসিধুসি’র ছড়া। সেই ‘হারাধনের দশটি ছেলে’ এবং সেই ‘দাদখানি চাল মুহুরির ডাল’ প্রভৃতি ছড়া আজকের চল্লিশোর্ধ্ব সব বাঙালীর কণ্ঠস্থ আছে। এ দুটিই অবশ্য বিদেশী ছড়ার রূপান্তর। কিন্তু রূপ যেখান থেকেই আসুক হক, তা অপরূপ হয়েছে কবির নিজস্ব ভাব-কল্পনা ও শিল্পকর্মে।

## শিশু-পত্রিকা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও বাংলাদেশের শিশু-সাহিত্যে একজন অগ্র-নাযক। নিজে তিনি গল্প ও পড়ে অনেক কিছু লিখেছেন যা মূল্যবান। কিন্তু সব চেয়ে বড় দান তাঁর ‘সন্দেশ’ নামে শিশু-পত্রিকা। ‘সন্দেশ’র আগেও ছেলে-মেয়েদের জন্তে মাসিকপত্র হয়েছে বাংলা দেশে। প্রমদাচরণ সেনের ‘সখা’ এবং ভুবনমোহন রায়ের ‘সার্থী’, পরে দুইয়ে মিলে ‘সখা ও সার্থী’ তার মধ্যে অগ্রগণ্য কাগজ। ‘মুকুল’ নামে চলত আরও একখানা শিশু-পত্রিকা। কিন্তু ‘সখা ও সার্থী’ হক আর ‘মুকুল’ হক, ‘সন্দেশ’র পাশে কোনোটাই মুড়ির মোয়ার অধিক নয়। এমন ছবি, এমন ছাপা, এমন ঝলমল-কবা গল্প-কবিতা বাংলা দেশের শিশুরা আগে কোনদিন দেখেনি।

## সুকুমার রায়

‘সন্দেশ’ থেকেই বাংলাদেশে সুকুমার রায়ের আবির্ভাব। তাঁর ‘আবোল-তাবোল’ ও ‘হ-য-ব-র-ল’ বাংলা ভাষার দুটি অধিতীয় পুস্তক। এব মধ্যে ‘আবোল-তাবোলে’র তুল্য ছড়ার বই যে-কোন ভাষাতেই খুব কম লেখা হয়েছে। এব প্রত্যেকটি কবিতাতেই একদিকে যেমন অপূর্ব কথার কেরামতি, অন্যদিকে তেমনিই আর্পাত-পাগলামির ভিতর দিয়ে জীবনের গভীর দিককে থেকে থেকে নাড়া দেবার কৌশল, কোন অসাবধান পাঠকেরও নজর এড়ায না। ‘রামগন্ধের ছানা, হাসতে তাদের মানা’, ‘শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে, তোমার না কি মেয়ের বিয়ে’, ‘ও হরিদাস আয় ত দেখি’ প্রভৃতি ছড়া শুধু কৌতুক-কবিতা নয়, সমাজ ও পারিপার্শ্বিকের ওপর তির্যক রেখায় যে আলোকপাত করা হয়েছে কবিতাগুলির ভিতর দিয়ে, তার গভীরতর অর্থও বুঝতে দেয়ি হয় না। সুকুমার রায়ের প্রভাব যে বাংলা সাহিত্যে খুব ব্যাপক, তা বোঝা যায় আমাদের শিশু-সাহিত্যের ছড়া-বিভাগে তাঁর অধুকেরণের প্রাচুর্য দেখলে।

সুকুমার রায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র। এই পরিবারের কুলদারজুন রায়, সুবিনয় রায়, সুখলতা রাও এবং লীলা মজুমদারও শিশু-সাহিত্যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অকালে লোকান্তরিত হয়েছেন সুকুমার রায়।

### অন্যান্য লেখক

সুকুমার রায়চৌধুরীর পাশাপাশি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যচরণ চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রলাল রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ লেখকও অজস্র শিশু-কাহিনী লিখেছেন। মণিলালের ‘খোট্টাই সরবৎ’ এবং সৌরীন্দ্রমোহনের ‘চালিয়াং চন্দর’ বেশ উপভোগ্য রচনা। হেমেন্দ্রকুমার রায় এঁদের মধ্যে সব চেয়ে অধিক প্রসিদ্ধ এবং সাক্ষিত্যের এই বিভাগে তিনি লিখেছেনও সব চেয়ে বেশী।

হেমেন্দ্রকুমারের ‘যকের ধন’, ‘আবার যকের ধন’, ‘হিমালয়ের তরুণকর’ দুঃসাহসিক রোমাঞ্চ-কাহিনী হিসাবে অতুলনীয়। আখ্যানবস্ত্র উদ্ভাবন এবং গল্পের রহস্যজাল শেষ পর্যন্ত সূক্ষ্মশৈলীতে টেনে নিয়ে চলা, দুঃ-বিষয়েই তাঁর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। শরৎচন্দ্রের ‘ছেলেবেলার গল্প’ সংগ্রহটির এবং গুরুসদয় দত্তের ছড়া ও খোস-গল্পের বই ‘ভজার বাঁশী’র নামও এই সঙ্গে করা যেতে পারে।

### আধুনিক লেখকরা

আধুনিক কালের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ঠাারা, অনেকেই তাঁরা শিশু-সাহিত্যে কিছু কিছু সম্পদ দিয়েছেন। শৈলজানন্দের ‘ভূতুড়ে বই’, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘পিঁপড়ে প্রাণ’, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘ওভার-কোট’, শিবরাম চক্রবর্তীর ‘চাঁতীর সঙ্গে হাতাহাতি’, ‘বাজার করার হাজার ঠাালা’, ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’, বুদ্ধদেব বসুর ‘শনিবারের বিকেল’ সত্যিকার ভালো লেখা।

সুনির্মল বসু, ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণদয়াল বসু ছোটদের জন্যে অনেক মনোবম কবিতা লিখেছেন। সুনির্মল বসু ও অখিল নিয়োগী লিখেছেন অনেক নাটক ও নাটিকা এবং গল্পে রবীন্দ্রলাল রায়, সুকুমার দে সরকার, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রলাল ধর খ্যাতিমান হয়েছেন। সুকুমার দে সরকার জীব-জন্তুর গল্পে, নীহাররঞ্জন গোস্বামী-গল্পে এবং ধীরেন্দ্রলাল যুদ্ধের গল্পে কুশলী কলমের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রলাল, নারায়ণ, দুঃ-জনেই ছোটদের উপযোগী হাসির গল্প লিখেছেন প্রচুর।

### জ্ঞান-বিজ্ঞান

আজকের শিশু-সাহিত্যে গল্প-কবিতা ছাড়াও বহু প্রয়োজনীয় জিনিস এসেছে। তার মধ্যে প্রধান হল দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ও অগ্রগণ্য বইগুলি

ছোটদের মতো করে পুনর্লিখন এবং দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সরল সহজবোধ্য ভাষায় প্রচার। এই ছ-মিকেই আমাদের শিশু-সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধ হয়েছে। ‘ইলিয়াড’, ‘ওডেসসী’, ‘রামায়ণ’, ‘মহাভারত’, ‘কথা-সরিং-সাগর’, ‘রাজতরঙ্গিনী’, ‘শাহনামা’ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের, অথবা সেক্সপীয়ার, কারভাস্তিস, মল্লয়ার, গ্যেটে, ভিক্টর ছগো, ডিকেজ, গোগল, টলস্টয় প্রমুখ ইউরোপীয় সাহিত্যরথীদের রচনাবলীর শিশু ও কিশোর পাঠ্য সংস্করণগুলি সত্যকার প্রশংসনীয় জিনিস হয়েছে। এছাড়া ‘পৃথিবীর ইতিহাস’, ‘জ্ঞান-বিজ্ঞানের কি ও কেন’, ‘পৃথিবীর সেরা সাহিত্য’, ‘দেশ-বিদেশের শিল্প ও শিল্পী’, অজস্র বই বেরিয়েছে এবং ভালো বইয়েরও অভাব নেই তার মধ্যে।

একটু আগেকার হলেও, রজনীকান্ত গুপ্তের ‘আর্যকীর্তি’, ‘বীৰমহিমা’ প্রভৃতি ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি, অথবা রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী ও জগদানন্দ রাধেব বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলি, বিশেষ কবে দ্বিতীয়ের ‘গাছ-পালা’, ‘পোকা-মাকড়’, ‘গ্রহ-নক্ষত্র’ সত্যিকার মূল্যবান বই। পিঁপড়েদেব সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক কাহিনী গিরীন্দ্রশেখর বসুর ‘লাল-কালো’ এবং যামিনীকান্ত সোমের অমূল্য জীবনী ‘ছেলেদের রবীন্দ্রনাথের’ কথাও নিশ্চয় অনেকের মনে পড়বে।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত ছোটদের বিশ্বকোষ ‘শিশু-ভারতী’র এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত মাসিকপত্র ‘জ্ঞান-বিজ্ঞান’ কিংবা অধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত ‘মোচাক’ এবং ‘শিশু-সাধী’, ‘রামধনু’, ‘শুকভারা’, ‘পাঠশালা’ প্রভৃতি শিশু-পত্রিকার সঙ্গে ত পরিচয় আছে ছোট-বড় সকলেরই। বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত সাপ্তাহিক শিশু-বিভাগগুলিও নিয়মিত সাহিত্য পরিবেশন করছে।



१२ श्रीरामलक्ष्मण

Greeneville, Tenn.

শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্ত

Wm. H. Burleigh

पद्मनाभ शर्मा

श्री गुरुभिर्योग्यं नमः

বিশ্বনাথ চন্দ্র

၂၀၁၅ ခု: ပိဏ္ဍိ-

પ્રધાન મંત્રી

— in der Nähe des Sees

মুদ্রাঙ্কন

আমাদের প্রিয়জনদের জন্য  
 প্রস্তুত রাখিলাম এই পুস্তকটি  
 মুদ্রাঙ্কন করিলাম। পুস্তক প্রস্তুত হইত  
 দিনে মুদ্রাঙ্কন করিলাম। মঙ্গল ৩ নং  
 ৪৪৪ নিমিত্তে পুস্তক মুদ্রাঙ্কন করিলাম।  
 মুদ্রাঙ্কন করিলাম।  
 প্রথম প্রকাশিত। দ্বিতীয় প্রকাশিত।  
 প্রথম প্রকাশিত। দ্বিতীয় প্রকাশিত।  
 প্রথম প্রকাশিত। দ্বিতীয় প্রকাশিত।  
 প্রথম প্রকাশিত। দ্বিতীয় প্রকাশিত।  
 প্রথম প্রকাশিত। দ্বিতীয় প্রকাশিত।

প্রথম প্রকাশিত। দ্বিতীয় প্রকাশিত।  
 প্রথম প্রকাশিত। দ্বিতীয় প্রকাশিত।

মুদ্রাঙ্কন করিলাম।



আমার চিঠি

সেখানে। আমার দেহের বাইরে শুধু আমার মন  
আজ্ঞাহীন হয়ে দেহের ধারে আমার প্রাণ কলকল  
আমার হৃদয় ছিল। তুমি দু-চার মাসের মধ্যে,  
যে কাজ করি : ছিলনা যদি আমি করি হইয়া।  
দু-চার মাসের একই করিয়া লিখা কাগজ  
দিত্তে পারিয়া। কিন্তু যার জন্য আমি  
করার করে তোমার এ সুখের দুই দেহ। হা,  
একোয়ার এ লেখা, যার প্রাণ ছিল  
দেখা যা' দু-চার হইবে আমায় প্রাণ  
হা। লেখার প্রতিটি যদি দিই ও মাঝে  
কতক একটুকু এ প্রাণের ধারায়। তুমি মন  
মাঝে দুই হইবে যদি লেখার কমা হই লিখার  
দ্বিতীয় হইবে যদি। যদি আমি হইব  
কোনো। লেখার প্রাণের প্রাণের  
যদি এ কমা দেহের প্রাণের প্রাণের  
যদি এ কমা এ লিখার প্রাণ।

১৯৫৫ খ্রিঃ ১৩ ১২

আমার

আমার প্রাণের প্রাণের

## সমসাময়িক

- খৃঃ অঃ ১৭৫৭—পলাশীর যুদ্ধ। দিরাঙ্গউদৌল্লার পরাজয় এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জয়লাভ।
- ১৭৭৩—রেগুলেটিং এক্ট এবং কোম্পানি কর্তৃক বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ।
- ১৭৭৪—কলিকাতায় সূপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা।
- ১৭৮১—কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা।
- ১৭৮৪—কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা।
- ১৭৯৩—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও নূতন জমিদার শ্রেণীর পতন।
- ১৮০০—কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরী।  
প্রথম বাংলা গদ্য রচনা। রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয়।
- ১৮০০—শ্রীরামপুরে প্রথম বাংলা ছাপাখানা এবং পঞ্চানন কর্মকার কর্তৃক বাইবেল মুদ্রণ।
- ১৮১৭—হিন্দু কলেজ স্থাপন।
- ১৮১৮—প্রথম বাংলা সংবাদপত্র : সমাচার দর্পণ।
- ১৮২৩—লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত রামমোহন রায়ে শিক্সাংস্কার-সম্বন্ধীয় পত্র এবং আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন। নানা স্থানে কলেজ স্থাপন।
- ১৮৩০—ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা। সনাতনী ও ব্রাহ্মদের বিবাদ। সতীদাহ-নিরোধ আইন।
- ১৮৩৫—কলিকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা। উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম ও সরকারী ভাষারূপে ইংরাজী প্রবর্তন।
- ১৮৩৯—আদি ব্রাহ্মসমাজ। দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয় দত্ত। বিজ্ঞান ও ধর্মশাস্ত্র-বিচার। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।
- ১৮৪৯—বেথুন কলেজ ও বাংলাদেশে নারীশিক্ষা।
- ১৮৫০—ওহাবী বিদ্রোহ। তিতু মীর।
- ১৮৫৩—ভারতে রেলপথ প্রবর্তন।
- ১৮৫৬—বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্তন। বিজ্ঞানসাগর।

খৃঃ অঃ ১৮৫৭—সিপাহী বিদ্রোহ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

ডাকব্যবস্থা প্রবর্তন।

১৮৫৮—কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞীর হাতে ভারত-শাসন ভার গ্রহণ।

১৮৬০—নীল বিদ্রোহ। হরিশ মুখার্জী ও হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা।

১৮৬৮—হিন্দুমেলা। জাতীয়তাব প্রতিষ্ঠা।

১৮৭২—অসবর্ণ বিবাহ আইন প্রবর্তন।

১৮৭৬—ভাবতীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার।

১৮৮৩—ইলবার্ট বিল আন্দোলন।

১৮৮৫—জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা। আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথ।

১৮৯৪—বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ। বামকৃষ্ণ আন্দোলন। বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ।

১৯০২—ডন সোসাইটি ও সতীশ মুখোপাধ্যায়।

১৯০৫—বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন। বিদেশী পণ্য বর্জন।

১৯০৭—বাংলায় বিপ্লববাদ। অমূল্যলন ও যুগান্তব দল। অববিন্দ ও বিপিনচন্দ্র।

১৯১১—কলিকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর। বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের পৃথক পৃথক প্রদেশরূপে জন্ম। এই তিনের সঙ্গে বাংলার অনেকাংশ সংযোগ।

১৯১৩—রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ।

১৯১৪—প্রথম মহাযুদ্ধ এবং জাতীয় জাগরণের নূতন অধ্যায়।

১৯২২—অহিংস অসহযোগ এবং গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন।

১৯৩০—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। মেদিনীপুরে স্বত্বাধীনবাদ।

১৯৩৫—ভারত শাসন আইন। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা। বাংলায় লীগ মন্ত্রিসভা ও সাম্প্রদায়িকতা।

১৯৪২—আগস্ট বিদ্রোহ। পকাশের মন্বন্তর।

১৯৪৭—ভারত বিভাগ এবং ইংরেজ শাসনাবসান।

১৯৫০—দুই বাংলা ও পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু আগমন।

১৯৫৭—সীমানা কমিশনের রায়ে পুর্নলিয়ার পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যাবর্তন। সরকারী ভাষা কমিশন ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন।

## সামগ্রিক পত্র

- খৃঃ অঃ ১৮১৮ : মার্শম্যান : দিগ্‌দর্শন  
 ১৮২১ : রামমোহন রায় : সন্ধ্যা কৌমুদী  
 ১৮৩১ : ঐশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : সংবাদ প্রভাকর  
 ১৮৪৩ : অক্ষয়কুমার দত্ত : তত্ত্ববোধিনী  
 ১৮৫১ : রাজেন্দ্রলাল মিত্র : বিদ্যার্থ সংগ্রহ  
 ১৮৫৪ : প্যারীচাঁদ মিত্র : মাসিক পত্র  
 ১৮৭২ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বঙ্গদর্শন  
 ১৮৭৬ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারতী  
 ১৯০১ : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : প্রবাসী  
 ১৯১৪ : প্রমথ চৌধুরী : সবুজ পত্র  
 ১৯২৪ : দীনেশরঞ্জন দাশ : কল্লোল  
 ১৯২৬ : তারানাথ রায় : আত্মশক্তি

## সংবাদপত্র

- ১৮১৮ : মার্শম্যান : সমাচারদপণ  
 ১৮৫৮ : যোগেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ : সোমপ্রকাশ  
 ১৮৮১ : যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু : বঙ্গবাসী  
 ১৮৮২ : রুঞ্চকুমার মিত্র : সঞ্জীবনী  
 ১৮৯০ : কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ : হিতবাদী  
 ১৮৯৬ : রুঞ্চকমল ভট্টাচার্য : বসুমতী  
 ১৯০৪ : ব্রজবান্ধব উপাধ্যায় : সন্ধ্যা  
 ১৯০৬ : ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : যুগান্তর  
 ১৯২৪ : গোপাল সাহা : বঙ্গবাণী

## প্রথম প্রকাশ

- ১৮০১ : রামরায় বসু : প্রতাপাদিত্য-চরিত্র  
 ১৮০৮ : যতীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানলংকার : রাজাবলি  
 ১৮১৫ : রামমোহন রায় : বেদান্তসার  
 ১৮৪৮ : বিজ্ঞানসাগর : বাঙ্গালার ইতিহাস

- খঃ অঃ ১৮৫১ : অক্ষয়কুমার দত্ত : বাহুবল্লভ সহিত মানব-  
প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার
- ১৮৫৪ : রামনারায়ণ তর্করত্ন : কুলীন-কুলসর্বস্ব
- ১৮৫৮ : টেকচাঁদ : আলালের ঘরের ছুলাল
- ১৮৬০ : দীনবন্ধু মিত্র : নীলদর্পণ
- ১৮৬১ : মাইকেল মধুসূদন : মেঘনাদবধ কাব্য
- ১৮৬২ : কালীপ্রসন্ন সিংহ : ছতোম প্যাঁচার নক্সা
- ১৮৬৫ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : দুর্গেশনন্দিনী
- ১৮৭২ : তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : স্বর্ণলতা
- ১৮৭৫ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্বপ্নপ্রয়াণ
- ১৮৭৫-৭৭ : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : বৃত্তসংহার
- ১৮৭৬ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : কৃষ্ণকান্তের উইল
- ১৮৭৯ : বিহারীলাল চক্রবর্তী : সারদামঙ্গল
- ১৮৮২ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : আনন্দমঠ
- ১৮৮৭ : নবীনচন্দ্র সেন : রৈবতক
- ১৮৯১ : গিরিশচন্দ্র ঘোষ : প্রফুল্ল
- ১৮৯৩ : নবীনচন্দ্র সেন : কুরুক্ষেত্র
- ১৮৯৬ : নবীনচন্দ্র সেন : প্রভাস
- ১৯০৯ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গোরা
- ১৯১০ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি
- ১৯১১ : অমৃতলাল বসু : খাস দখল
- ১৯১২ : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : সাজাহান
- ১৯২৬ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বলাকা
- ১৯২৬ : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পথের দাবী
- ১৯২৬ : নজরুল ইসলাম : অগ্নিবীণা
- ১৯২৯ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা
- ১৯৩১ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাশিয়ার চিঠি
- ১৯৩৮ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রান্তিক



## প্রস্তাৱ

রাজনারায়ণ বসু	:	বাংলা সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা
রামগতি ঠায়রত্ন	:	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব
রমেশচন্দ্র দত্ত	:	Literature of Bengal
দীনেশচন্দ্র সেন	:	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
সুশীলকুমার দে	:	History of Bengali Vaisnavism
মণীন্দ্রমোহন বসু	:	Post-Chaitanya Sahajiya Cult
শশিভূষণ দাশগুপ্ত	:	Obscure Religious Cults
আশুতোষ ভট্টাচার্য	:	বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস
প্রমথনাথ তর্কভূষণ	:	বাংলার দৈবধর্ম
রাধাগোবিন্দ নাথ	:	গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম
ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	:	বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়	:	বঙ্গভাষার লেখক
অনাথকৃষ্ণ দেব	:	বঙ্গের কবিতা
হারাগচন্দ্র রক্ষিত	:	ভিক্টোরিয়া যুগের বাংলা সাহিত্য
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	:	রামমোহন রায়ের জীবনচরিত
বিহারীলাল সরকার	:	বিভাগসাগর
নগেন্দ্রনাথ সোম :	:	মধুসূতি
যোগীন্দ্রনাথ বসু	:	মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত
শশাঙ্কমোহন সেন	:	মধুসূদন
শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	:	বঙ্কিম-জীবনী
অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত	:	বঙ্কিম-প্রসঙ্গ
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত	:	বঙ্কিমচন্দ্র
সুশীলকুমার দে	:	দীনবন্ধু মিত্র
মদ্যনাথ ঘোষ	:	কবি হেমচন্দ্র
		রঙ্গলাল
		কালীপ্রসন্ন সিংহ

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	:	গিৰিশ-প্ৰতিভা
দেবকুমার বায়চৌধুরী	:	দ্বিজেন্দ্রলাল
নলিনীবজ্জন পণ্ডিত	:	কান্তকবি বঙ্গনীকান্ত
প্ৰিয়লাল দাশ	:	এষাব কবি
E J. Thompson	:	Rabindranath Tagore, The Poet & Dramatist
প্ৰভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	:	ববীন্দ্র-জীবনী
বিনয়কুমার সবকায়	:	ববীন্দ্র-সাহিত্যে ভাবত্বেৰ বানী
স্ববেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	:	ববি-দীপিতা
নীহারবজ্জন বায়	:	ববীন্দ্র-সাহিত্যেৰ ভূমিকা
স্ববোধচন্দ্র সেনগুপ্ত	:	শবৎচন্দ্র
মাখনলাল বায়চৌধুরী	:	শবৎসাহিত্যে পণ্ডিতা
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	:	বঙ্গের মহিলা কবি
প্ৰিয়বজ্জন সেন	:	Western Influence in Bengali Literature
অশীলকুমার দে	:	Bengali Literature in the Nineteenth Century.
শ্ৰীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	:	বাঙ্গালা সাহিত্যে উপন্যাসেৰ দাবী
হবপ্ৰসাদ মিত্ৰ	:	সংহতেন্দ্রনাথ দত্তেৰ কবিতা ও কাব্যৰূপ
শশিভূষণ দাশগুপ্ত	:	কবি যতীন্দ্রনাথ
বথীন্দ্রনাথ বায়	:	বাংলা সাহিত্যে প্ৰথম চৌধুরী
আব্দুল ওহুদ	:	নজকল-প্ৰতিভা
রমেশচন্দ্র যজ্ঞমদাব	:	বাংলাৰ ইতিহাস
নীহারবজ্জন বায়	:	বাঙালীৰ ইতিহাস
অনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	:	The Origin & Development of Bengali Language
অকুমার সেন	:	বাঙ্গালা সাহিত্যেৰ ইতিহাস
উপেন্দ্রনাথ তট্টাচার্য	:	বাংলাৰ বাউল ও বাউল গান
জিৎপ্ৰাশঙ্কর সেন	:	ষোড়শ শতকেৰ বাংলা সাহিত্য

## শব্দসূচী

[ পুস্তকমধ্যে উল্লিখিত ঘটনা, বিষয়, ব্যক্তি ও পুস্তকের নাম ইত্যাদি  
উল্লেখযোগ্য শব্দসমূহের পৃষ্ঠাসংখ্যাসহ বর্ণানুক্রমিক তালিকা ]

অ	অদ্বৈতপ্রকাশ	২৬
অক্ষয় দত্ত ৬৬, ৬৮, ৭০, ৭২, ৭৪, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ১৫৭, ১৫৮	অদ্যাপক—রবীন্দ্রনাথ	১৫২
অক্ষয়কুমার চৌধুরী ১১২, ১১৩	অনন্তবান, কবি	২১
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ৭৫, ৯০	অনলে বিজলী—বাজরুকা রাব	১৫২
অক্ষয় বড়াল, অক্ষয়কুমার বড়াল	অনুরূপা দেবী	১৪৭
৬৬, ৯২, ১০৯, ১১১	অন্ধ কবি—বরদা মিত্র	১১২
অক্ষয়চন্দ্র সবকাব ৬৯, ৭১, ৭২, ৮৫, ৮৭	অন্ধকাব—গিবিণ ঘোষ	১১২
অখিল নিয়োগী ১৬১	অন্নদা	৪০, ৪১
অগ্নিবীণা—নজরুল ১১৫	অন্নদামঙ্গল ৩৮, ৪০, ৪১, ৬০	
অঙ্গদ বায়বার ২২	অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা	৪০
অচল পথের যাত্রী—প্রেমাংকুব	অন্নদাশঙ্কর বায়	৭৯
আতর্থা ১৪৭	অন্নপূর্ণা	৪১
অচলায়তন—রবীন্দ্রনাথ ১৩৪	অন্নপূর্ণাব মন্দির—নিকুপমা দেবী	১৪৭
অচিন্ত্যকুমার, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	অপবাজিতা দেবী	১১৫
অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ১৩৫, ১৪৮, ১৪৯, ১৫১, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৬১	অপবেশ মুখোপাধ্যায়	১৩৫
অচিন্ত্য ভেদাভেদ ২৮	অপূর্ব নৈবেদ্য—দেবেন সেন	১১১
অজয়—কুমদরঞ্জন ১১৪	অবধূত	১৪৯
অজিতকুমার চক্রবর্তী ৭৮	অবনীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
অজিত দত্ত ১১৫	১৫৭, ১৫৮, ১৫৯	
অতুলচন্দ্র গুপ্ত ৭৮	অব্যক্ত—জগদীশচন্দ্র	৭৭
অতুলপ্রসাদ, অতুলপ্রসাদ সেন ১২৩, ১২৪	অবকাশরক্তিনী—নবীনচন্দ্র সেন	১০২
	অবসর—বরদা মিত্র	১১২
	অভাগী—জলধর সেন	১৪৫
	অমিয় চক্রবর্তী	১১৫

অমূলতরু—উপেন গঙ্গোপাধ্যায়	১৪৭	আড়ারা গ্রাম	৩৫
অমৃতবাজার পত্রিকা	৮৯	আত্মবিলাপ—মাইকেল	১০২
অমৃতলাল বসু ১২৬, ১৩০, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪		আত্মশক্তি ( সাপ্তাহিক )	৯০
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী	৮৫	আদরিণী—প্রভাত মুখোপাধ্যায়	১৫২
অরণ্যপথ—প্রবোধকুমার সান্তাল	৭৭	আদিপ্রাকৃত	৬
অরবিন্দ, অরবিন্দ ঘোষ	৮৯	আদিবৈষ্ণব	১৫
অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৭৯	আদিবৈষ্ণব কবিতা	৬০
অলংকার শাস্ত্র	১১৬	আদিবৈষ্ণব ধর্ম	২৭
অলীকপ্রকাশ—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ	১৩০	আঁধারে আলো—শরৎচন্দ্র	১৫৩
অশোকগুচ্ছ—দেবেন সেন	১১১	আধুনিক প্রেমসঙ্গীত	৭৫
অশোকবিজয় রাহা	১১৫	আধুনিক সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ	৭৫
অশ্রুকাণ্ড ( কাব্য )		আনন্দচন্দ্র মিত্র	১০০, ১১৯
—গিরীন্দ্রমোহিনী	১১২	আনন্দবাজার	৮১, ৯০
অশ্রুমতী ( নাটক )		আনন্দমঠ	৬৫, ৬৭, ১৩৯, ১৪৩
—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩০	আপজন	৬৬
অসম অমিত্রাক্ষর ছন্দ	১৩১	আপদ—রবীন্দ্রনাথ	১৫১
অসম ছন্দ	১৩২	আবর্ত—ধূর্জটিপ্রসাদ	১৪৯
অসমীয়া	৬	আবার যকের ধন—হেমেন্দ্রকুমার	১৬১
অসহযোগ আন্দোলন	৮৯	আবু হোসেন—গিরিজা	১৩১, ১৩৩
অস্ট্রিক	৪, ৬০	আবোল-তাবোল—সুকুমার রায়	১৬০
অস্ট্রেলেশিয়াটিক	৪	আমরা ও তাঁহারা—ধূর্জটি	৭৯
অহল্যা	১৩২	আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস —সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭৩
আ		আমেরিকা	১৪৪
আইভ্যানহো (Ivanhoe)	১৩৯	আরণ্যক—বিভূতি বন্দ্যো.	১৪৮
আউল	৫	আরবী	৭
আওরঙজেব	৪৪	আরাকান	৪৩
আখ্যানমঞ্জরী—বিষ্ণুসাপ্তর	১৫৮	আরাকানরাজ ( সুধর্ম )	৪৩
আগম	৪	আরাকান-রাজদরবার	৪৪
আগমনী গান	৫৩	আরাবিকা ( রাধা )	১৫

আরোগ্য—রবীন্দ্রনাথ	১০৮	ইংরেজী	৭
আর্থ-অনার্য মিশ্রণ	৪০	ইংরেজী-বাংলা অভিধান	৬৬
আর্থকীর্তি—রজনীকান্ত গুপ্ত	১৬২	ইছাই ঘোষ	৩৭
আর্থদর্শন ( সাময়িক পত্র )	৮১, ১৪১	ইচ্ছাপূরণ—রবীন্দ্রনাথ	১৫২
আর্থসংস্কৃতি	৫	ইটালিয়ান চণ্ডের সনেট	১১১
আর্থাবর্ত	২, ৬০	ইণ্ডিয়ান মীরার	৮৯
আর্থের জাতিসমূহ	৪	ইথেল ম্যানিন	৭৯
আলমগীর ( নাটক )		ইন্দিরা দেবী	১১৪
—ক্ষীরোদপ্রসাদ	১৩৩	ইল ( চরিত্র : পাষণী )	
আলাওল, সৈয়দ	৪৩, ৪৪, ৪৫, ৬০	—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	১৩২
আলালী বাংলা	৭১	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৮, ১৩৭, ১৪২
আলালের ঘরের দুলাল	৭০, ১২৭, ১৩৭	ইন্দ্রানী ( বর্ধমান )	২৬
আলিগড় কলেজ	৬৫	ইয়ং বেঙ্গল	১২৮, ১২৯, ১৩৮
আলিবাবা ( নাটক )		ইরাবতী—হরিনারায়ণ	১৪৯
—ক্ষীরোদপ্রসাদ	১৩৩	ইলিয়াড	৯৮, ১৬২
আলেকজাণ্ডার	১৩২	ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি	৬৩
আলেকজাণ্ডার-বাহিনী	১		
আলেখ্য—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	১১২	ঈ	
আলো ও ছায়া—কামিনী রায়	১১২	ঈশানচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
আলোক—বরদা মিত্র	১১২		১০০, ১০১
আলোয়ারী, আলোয়ারী ভাবসাধক	১৫	ঈশান নাগর	২৬
আশাপূর্ণা দেবী	১৪৯, ১৫৬	ঈশ্বরগুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	৪৯, ৬৬,
আশিস গুপ্ত	১৫৬		৬৯, ৭০, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৫,
আসরাফ খাঁ	৪৪		৮৬, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ১২৬
আসাম	৯, ১৫, ১৮, ৮৮	ঈশ্বরী পাটনী	৪১
আস্তিক মূনি	৩৪		
আহতি—প্রমথ চৌধুরী	১৫৪	উ	
ই		উইলিয়ম রস্কা	১৫৮
ইউরোপ-আমেরিকা	১৪৪	উজানী—কুমুদরঞ্জন মল্লিক	১১৪
ইউলিসিজ	৯৮	উজ্জল নীলমণি	২৬, ৩০

উড	৬৩	একেই কি বলে সভ্যতা ( প্রহসন )	
উড্ডিয়ার ইতিহাস	৯৫	—মাইকেল মধুসূদন	১২৯
উদ্ধব দাস	২৯	একেশ্বরবাদ, একেশ্বরবাদ-প্রচাব	৮৪
উদ্ভাস্ত প্রেম—চন্দ্রশেখর	৭৩	এ জন্মের ইতিহাস	
উপনায়ন—প্রেমেন্দ্র মিত্র	১৪৮	—শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪৯
উপনিবেশ—নারায়ণ বন্দ্যো.	১৪৯	এডুকেশন গেজেট	৮৫, ৮৭
উপনিষদ্	৬	এডুকেশন ডেসপ্যাচ (Education	
উপাসনা ( মাসিকপত্র )	৮৭	Despatch—Wood)	৬৩
উপেন্দ্রকিশোর বায়চৌধুরী ১৫৭,		এণ্টুনি	৬০
১৭৮, ১৮০		এনক আর্ডেন কাব্য	
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৪৭	(Enoch Arden)	১৯
উপেন্দ্রনাথ দাস	১৩১	এ মেঘে পুরুষের বাবা—রাজকৃষ্ণ	১৩২
উমাপতি ধব	১৬	এমা—অক্ষয় বড়াল	১০৯
উমা-সঙ্গীত	৪৯, ৫১, ৫৩, ৫৪	ঐ	
উমিচাঁদ	৯৮	ঐতিহাসিক উপন্যাস	১৩৬, ১৪৪
উর্	৭	ঐতিহাসিক নাটক	১৩১, ১৩২, ১৩৪
উর্বশী ও পুরুষবা—দবলেশ	১১২	ঐতিহাসিক বোম্বাঙ্গ	১৩৮, ১৪৪
উ		ঐতিহাসিক অববতা—কালীপ্রসন্ন	
উদাহরণ ( যাত্রা )	১২৭	যোষ	৭৩
ঋ		ও	
ঋগ্বেদ	৬	ওড়িয়া	৬, ৭
ঋগং কৃষ্ণা—প্রমথনাথ বিদ্যী	১৩৫	ওড়সী	১৬২
ঋতুমঙ্গল—কালিদাস রায়	১১৪	ওভারকোট—অচিন্ত্য]	১৬১
ঋষ্যশৃঙ্গ—রাজকৃষ্ণ রায়	১৩২	ওঁবাও ( ভাবা )	৭
এ		ওহাবী বিদ্রোহ	৬৫
একটি পাখী—চন্দ্রনাথ বসু	৭৩	ক	
একদা—গোপাল হালদার	১৪৯	কংগ্রেস, জাতীয়	৬৫, ১০২
এক পেয়লা চা—জলধর সেন	১৫৩	কংসনারায়ণ	২২, ৬৩

শব্দসূচী

১৭৭

কঙ্ক-লীলা	৪৬	কমলে কামিনী ( যাত্রা )	১২৭
কঙ্কাবতী—ত্রৈলোক্যনাথ	১৪২	কমিক নাট্য	১৩০
কঙ্কাবতী—বুদ্ধদেব বসু	১১৫	কমলাকুঠি—শৈলজ্ঞানন্দ	১৫৫
কঙ্কাল—রবীন্দ্রনাথ	১৫২	কবিম সেথ—জলধর সেন	১৪৫
কচ ও দেবযানী—ববীন্দ্রনাথ	৯৯	করণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৪
কঙ্কালী—পরশুরাম	১৫৬	কর্ণকুন্তী-সংবাদ—ববীন্দ্রনাথ ৯৯, ১১৪	
কড়াচা—গোবিন্দ কর্মকাব	৩১	কর্ণগড়	৩৮
কড়াচা—মুবাবি গুপ্ত	৩১	কর্ণপুত্র, কবি	৩১
কথকতা	৬৭, ১২৭	কর্ণাটক	১৫
কথামালা—বিজ্ঞানসাগর	৭১, ১৫৮	কর্ণসুবর্ণ	৬০, ১৪৪
কথা-সবিতা-সাগর	১৬২	কর্ণসেন	৩৭
কথোপকথন—কেবী	৭০	কর্ণার্জুন ( কাব্য )	
কদলীপত্ন	১৩	—বলদেব পালিত	১০০
কনকাক্ষি	১১১	কর্ণার্জুন ( নাটক )—অপবেণ	১৩৫
কনাড়ী	৭	কর্ণামৃত	১৫, ২৬
কণিক	৬	কলকাতা	৭, ৬৭
কপালকুণ্ডলা—বঙ্কিম	১৩৯	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩
কবিওয়াল	৫৭, ৬০	কলিঙ্গ	২
কবিকঙ্কণ মুকুন্দবাম	৩১, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪২	কল্লতরু—ইন্দ্রনাথ	১৪২
কবিকাহিনী—দীনেশচরণ বসু	১০৬	কল্লোল	৮১, ৯১, ১৪৮, ১৫৫, ১৭৩
কবিগান	১২৭	কল্লবী—গোবিন্দ দাস	১০৯, ১১১
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ	৪২	কাকজ্যোৎস্না—অচিন্ত্যকুমার	১৪৮
কবিবাজ কৃষ্ণদাস	২৬	কাগজেব নৌকা—ববীন্দ্রনাথ	১৫৮
কবিরাজ গোস্বামী	৩১, ৩২	কাজবী—সোবীন মুখোপাধ্যায়	১৪৭
কমলাকান্ত	২৪, ৭৩	কাঞ্চি-কাবেবী	৯৫
কমলাকান্ত ( কবি : উমাসঙ্কীভ-বচক )		কাঠ-খড়-কেবোসিন	
৪৯, ৫০, ৫১, ৫৪, ৬০		—অচিন্ত্যকুমার	১৫৬
কমলাকান্ত, কমলাকান্তের দপ্তর		কাঁথি	১
—বঙ্কিমচন্দ্র ৭৩, ৭৪, ১৫৩		কাদম্ববী—তাবাশংকর তর্কবন্ধ	
		৭৩, ১৩৮, ১৩৮, ১৫৮	

কাবুলিওয়ালী—রবীন্দ্রনাথ	১৫১	কাশী	২, ২৭
কাব্যকুসুমঞ্জলি—মানকুমারী বসু	১১৪	কাশীদাস, কাশীরাম, কাশীবাম দাস	
কাব্যজিজ্ঞাসা—অতুল গুপ্ত	৭২		২১, ২৪, ২৫, ৬০
কাব্যনাট্য	১৩৩	কাশীদাসী মহাভারত	২৪
কাব্যবিশারদ, কালী প্রসন্ন	১২০	কাসিমের মুরগী—সুধীন্দ্র ঠাকুর	১৫৩
কামরূপ	২	কাঙ্কপাদ	১০
কামিনী-কাঙ্কন—হাবান বস্কিত	১৪৫	কিরণচাঁদ দরবেশ	১১২
কামিনী রায়	১১৩	কিরণধন চট্টোপাধ্যায়	১১৫
কায়কোবাদ, কাঁব	১১৪	কিশলয়—মহেন্দ্র রায়	৭২
কায়সাধন মন্ত্র	১৩	কিসসা, কিসসা কাব্য	৫৬
করভাস্তিস	১৬২	কিসসা সাহিত্য	১৩৫
কারাকাহিনী—অরবিন্দ	৭৭	কীর্জন	১২৭
কারাগাব—মন্মথ রায়	১৩৫	কীর্জনেব স্রব	১১৭
কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত	১৫৭	কুইন্টিন ডারওয়ার্ড ( Quintin	
কালচক্রবান	৯	Durward )	১৩৯
কালচাঁদ—যোগেন্দ্র বসু	১৪২	কুসুম—গোবিন্দ দাস	১১১
কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ	৭৫	কুমাবিল ভট্ট	৫
কালাপাহাড়—গিরিশ	১৩১	কুমীবেব পূজা	৪
কাঙ্গি-কলম	৯১, ১৪৮, ১৫৫, ১৫৬	কুমুদরঞ্জন মল্লিক	১১৪
কালিকা, কালী	১১, ৪৯, ৫০	কুমুদের বন্ধু—প্রভাত মুখোপাধ্যায়	
কালিদাস	৬		১৫২
কালিদাস রায়	১১৪	কুরুক্ষেত্র ( কাব্য )	৯৮, ৯৯
কালীঘাট	১৪১	কুরু, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ	১, ৯৯
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ	৮৯	কুলদারঞ্জন রায়	১৬০
কালীপ্রসন্ন ঘোষ	৬৯, ৭২, ৭৩, ৮৫, ৮৭	কুলীনকুলসর্বস্ব—রামনারায়ণ	৭০, ১২৬, ১২৭
কালীপ্রসন্ন সিংহ, কালী সিংহ ৬৮,		কুলীনগ্রাম	২৩
৪৩, ১৩২, ১৫০		কুমুমকুমারী, কুমুমকুমারী দেবী	১৪৫
কালী মির্জা	৪৯, ৫৭, ৫৮, ৫৯	কুন্তিবাস	৩, ২১, ২২, ২৩, ৪৭
কালিদাসী ( ভাষা )	৭	কুন্তিবাসী রামায়ণ	২২, ২৪



কপণ—মল্লয়ার	১৩৩	কেশবচন্দ্র সেন ,	৬৪, ৮৩
কপণের ধন—অমৃতলাল	১৩৩	কোঁং	১৩৯
কঞ্চ	১, ১৮, ২০, ২৪, ২৭,	কোমস	৯৮
	২৮, ২৯, ৩০, ৫৮	কোমল ( ভাষা )	৭
কঞ্চকমল	৪৯	কৌতুক-গল্প	১৫১
কঞ্চকান্তের উইল—বঙ্কিমচন্দ্র		কৌলীভূ, কৌলীভূপ্রথা	
	১৩৬, ১৩৯, ১৪৩		২, ৫, ১৫, ৫৩, ৬০
কঞ্চকিঙ্কর	২৫	ক্রন্দনী—সুধীন দত্ত	১১৫
কঞ্চকীর্তন	৭, ১২, ২০	ক্র্যাসিকসের আদর্শ	১১৪
কঞ্চকুমার মিত্র	৮৯	ক্র্যাসিক্যাল সাহিত্য	৯৬, ৯৭, ১৩৬
কঞ্চকুমারী—মাইকেল	১২৮	ক্র্যাসিক্যাল সুর	১১৭
কঞ্চচন্দ্র, মহারাজ	৪০	কৃত্রবীর—ভূপেন্দ্রনাথ	১৩৫
কঞ্চচন্দ্র মজুমদার	১৫৭	কৃতিমোহন সেন	৭৯
কঞ্চদয়াল বসু	১৬১	কুধিত পাষণ—রবীন্দ্রনাথ	১৫১
কঞ্চদাস	২৬, ৩০	কীরের পুতুল—অবনীন্দ্রনাথ	১৫৯
কঞ্চদাস কবিরাজ	২৬, ৩১	কীবোদপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ	১২৩, ১২৬,
কঞ্চদাস পাল	৮৯		১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫
কঞ্চনগর	৪১	ক্লেমানন্দ	৩৪, ৩৫
কঞ্চনগর কলেজ	৬৩		
কঞ্চনগর-রাজকুমার ( সুন্দর )	৪১	ধ	
কঞ্চবিলাস কাব্য	২৫	ধসডা—অমিয় চক্রবর্তী	১১৫
কঞ্চলীলা	১৬, ৯৯	ধাপছাড়া—রবীন্দ্রনাথ	১৫৮
কঞ্চসঙ্গীত	৫৭	খিলজী সুলতান	৪৫
কেতকাদাস	৩৪, ৩৫	খুলনা	১
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫০	খুঁজিয়া	৬
কেঁহুলি ( উড়িয়া )	১৬	খুঁজিয়ার্থ	৬৮, ৮১
কেঁহুলি ( বীরভূম )	১৬	খুঁজান পাত্রী, খুঁজান	৮১, ৯৬
কেমিলওয়ার্থ ( Kenilworth )	১৩৮	খুঁজান মশনারী	৬৮
কেম্বুবিধ ( উড়িয়া )	১৬	খোকার বনবাস—রবীন্দ্রনাথ	১৫৮
কেয়ী	৬৫, ৬৬, ৬৯, ৭০	খোষ্টাই সরবত—মণিলাল	১৬১

গ		গীতাঞ্জলি—ববীন্দ্রনাথ	১১৮
গঙ্গা—সমবেশ বহু	১৪৯	গীতাব ভূমিকা—অববিন্দ	৭৭
গঙ্গানাথ পণ্ডিত	২৭	গীতালী—ববীন্দ্রনাথ	১১০
গঙ্গারীঢ়	১	গীতি-নাট্য	১৩৩, ১৩৪
গজল	১২৫	গীতিমাল্য—ববীন্দ্রনাথ	১১৮
গজেন্দ্রকুমার মিত্র	১৫৬	গুজরাট	৮৯
গডলিকা—পবনরাম	১৫৬	গুজবাটী	৭
গণদেবতা—তারানাথকর	১৪৮	গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য	৮৫
গণপতি ঠাকুর	১৭	গুণরাজ খাঁ ( মালাধব বহু )	২৩
গণেশ, রাজা	২২, ৬০	গুপ্তধন—ববীন্দ্রনাথ	১৫১
গতিয়ে	১৫০	গুপ্তযুগ, গুপ্ত-শাসন	৫, ৬০
গদাধর (কাশীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা)	২৫	গুপ্ত সম্রাটগণ, গুপ্তসাম্রাজ্য	২, ৯
গদাধর ( স্বর্ণলতা )	১৪১	গুরুসদয় দত্ত	১৬১
গয়া	২৭	গৈবিক পতাকা—শচীন সেনগুপ্ত	১৩৫
গল্পগুচ্ছ—ববীন্দ্রনাথ	১৫২	গাগল	১৬২
গল্পসল্প—ঐ	১৫৮	গোড়ায় গলদ—ববীন্দ্রনাথ	১৩৪
গাছপালা—জগদানন্দ	১৬২	গোপাল উড়ে	৫৯, ৬০, ১২৭
গান্ধারীব আবেদন	১৩৪	গোপাল ভট্ট	২৬
গান্ধী-আন্দোলন	৮১	গোপাল হালদাব	১৪৯
গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়	১১২	গোপী, গোপীতাব	২৪, ২৭, ২৮
গিরিশ ( চরিত্র )	১৪৭	গোপীচাঁদ	১২
গির্জাচন্দ্র, গির্জাচন্দ্র ঘোষ	৬৬, ১১২, ১২৩, ১২৬, ১৩০, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫	গোকুর জোলা	১৪৬
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	১১৩	গোবিন্দ কর্মকাব	৩১
গিরীন্দ্রশেখর বহু,	৭৭, ৭৮, ১৬২	গোবিন্দচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র দাস	৯২, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১
গিয়ারুদ্দীন ইলিয়াস	৩	গোবিন্দদাস	১৭, ১৮, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০, ৬০
গীতগোবিন্দ, শ্রীশ্রী	১৫, ১৬, ১৭, ২০, ২৪	গোবিন্দরায়—পাঁচকড়ি দে	১৪৫
গীতসাহিত্য	৪২, ৬০	গোবিন্দ রায়, গোবিন্দচন্দ্র রায়	১০৫, ১০৬, ১১২

গোয়েন্দা-উপভাস	১৪৫	চ	
গোয়েন্দা-কাহিনী	১৪৫	চড়াই-উৎরাই—নরেন্দ্র মিত্র	১৫৬
গোবন্ধনাথ, গোরক্ষপুর	১২, ১৩	চণ্ডিকা	৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৫৭
গোরক্ষবিজয়	১২, ১৩	চণ্ডী	১৩, ৩৫, ৪২, ৫০
গোরা—ববীন্দ্রনাথ	৬৭, ১৪৩	চণ্ডীদাস	৩, ১৫, ১৭, ১৯, ২০,
গোর্খা	১২		২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০
গোলাপগুচ্ছ—দবেন সেন	১১১	চণ্ডীমঙ্গল	৩৫, ৩৬, ৩৮, ৬০
গোষ্ঠলীলা	২৬	চন্দ্রকুমার দে	৪৩
গোহাবী-বাজকলা ( চন্দ্রানী )	৪৪	চন্দ্রগুপ্ত—বিজেন্দ্রলাল	১৩২
গোড়	১, ৬০, ১৪৪	চন্দ্রনাথ—শরৎচন্দ্র	১৪৭, ১৫৩
গোড়ভূজঙ্গ	২	চন্দ্রনাথ বসু	৬২, ৭২, ৭৩, ৮৭
গোড়বাজ	২, ৩৭	চন্দ্রশেখর—বঙ্কিমচন্দ্র	১৩৯
গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ	৩, ২৭	চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	৬২, ৭২, ৭৩,
গোড়ীয় ভাসাব ব্যাকবণ	৬৬		৮৭
গোড়ীয় মত	১৭	চন্দ্রাবতী ( ময়মনসিংহ-গীতিকার )	৪৬
গোড়েশ্বর	৩, ১৬, ২৩, ২৭	চন্দ্রা	১৪৪
গোতম	১৩২	চরিত-সাহিত্য	৬০
গোবচন্দ্রিকা	১৬	চরিতামৃত	২৬
গোবাব্দলীলা	২৬, ২৯	চবিত্তকথা—বিপিন পাল	৭৭
গোবী	৫৩	চর্যাকাব	১১
গোটে	১৬২	চর্য্যচর্য্যবিশিষ্ট	১০
গ্রহনক্ষত্র—জগদানন্দ	১৬২	চর্য্যাপদ	৩, ৬, ১১, ১২, ৫৬, ৬০
গ্রীক ( জাতি )	১	চা-কুলিব দুর্দশা-নিবাবণ	৮৮
গ্রোয়াসর্গ	১২	চাইল্ড হেরল্ড	৯৮
ঘ		চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে—অমৃতলাল বসু	
ঘনরাম	৩৭, ৬০		১৩৩
ঘরে-বাইরে—রবীন্দ্রনাথ	১৪৯	চাণক্য ( চন্দ্রগুপ্ত : গিরিশ বোষ )	১৩২
মুমন্ত শিশু—বিজেন্দ্রলাল	১১২	চার অধ্যায়—রবীন্দ্রনাথ	১৪৩
ঘোষালের ত্রি-কথা—প্রমথ চৌধুরী		চার ইয়ারী কথা—প্রমথ চৌধুরী	১৫৪
	১৫৪	চারপাঠ—অক্ষয় দত্ত	১৫৮

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৭, ১৫০, ১৫৪	ছুটি খান	৪৩
চালিয়াং চন্দ্র—সৌরীন্দ্রমোহন ১৬১	ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ	
চিত্তরঞ্জন দাশ ১১৩	—যামিনীকান্ত সোম	১৬২
চিত্রা—রবীন্দ্রনাথ ১০৮	ছেলেবেলা—রবীন্দ্রনাথ	১৫৮
চিত্রাঙ্গদা—রবীন্দ্রনাথ ২২, ১৩৪	ছেলেবেলার গল্প—শবৎচন্দ্র	১৬১
চিত্তমসি—ধূর্জটিপ্রসাদ ৭৯	ছেলে-ভুলান ছড়া	৪৮
চিরকুমারসভা—রবীন্দ্রনাথ ১৩৪		
চিরঞ্জীব শর্মা ১১৭	জ	
চীংপুর ১৪২	জগদানন্দ ( বৈষ্ণব কবি )	২২, ৩১
চৈতন্য, শ্রীচৈতন্য ১৫, ১৭, ১৮, ২১, ২৬, ২৭, ২৯, ৩১, ৬০	জগদানন্দ রায়	১৬২
চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৩১	জগদীন্দ্রনাথ রায়	১১৩
চৈতন্যচরিতামৃত ২৬, ৩১	জগদীশ চন্দ্র ১৪৮, ১৪৯, ১৫১, ১৫৫	
চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবসমাজ ২৭	জগদীশচন্দ্র বসু ৬৯, ৭৭, ৮০	
চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল ২৬, ৩১	জগদীশ মিশ্র	২৭
চৈতন্যলীলা—গিরিশ ঘোষ ১৩১	জনা—গিরিশ ঘোষ	১৩১
চৈতালী—রবীন্দ্রনাথ ১০৮	জন্মদিন—রবীন্দ্রনাথ	১০৮
চৌবের বালি—রবীন্দ্রনাথ ১৩৬, ১৪৩	জয়গোপাল তর্কালংকাব	২২
চৌরবালি—বিষ্ণু দে ১১৫	জয়দেব ১৫, ১৬, ১৭, ২০,	
চৌরঙ্গীনাথ ১২	২১, ২৭, ৩৩, ৬০	
	জয়দেব ( নাটক )	
ছ	—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়	১৩৫
ছন্দ—রবীন্দ্রনাথ ৭৫	জয়ানন্দ	২৬
ছন্ন গোস্থানী ২৬, ৬০	জরৎকার	৩৪
ছড়ার হবি—রবীন্দ্রনাথ ১৫৮	জরাসন্ধ ( ছদ্মনাম )	৮০
ছবি ( গল্প )—শবৎচন্দ্র ১৫৩	জল আর আশ্রয়—আশাপূর্ণা দেবী ১৫৬	
ছাড়পত্র—স্বকান্ত ১১৫	জলধর চট্টোপাধ্যায়	১৩৫
ছাতলা ১৯	জলধর সেন ৬৯, ৭৬, ১৪৫,	
ছিন্নপত্র—রবীন্দ্রনাথ ৭৫	১৫০, ১৫৩	
ছিন্ন মুকুল—স্বর্ণকুমারী ১৪৫	জলসিধর—ভাষাশংকর	১৫৫

শব্দসূচী

১৮৩

জসিম উদ্দীন	১১৫	টুনটুনির বট—উপেন্দ্রকিশোর	১৫৮
জাগরী—সতীনাথ	১৪৯	টেকচাঁদ ( প্যারীচাঁদ মিত্র )	৬৮, ৮৫,
জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য		১২৭, ১২৮, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৮	
—সুনীতিকুমার	৭৮	টেনিসন	১০১, ১০৭
জামাই বারিক—দীনবন্ধু	১৩০	টেলিমেকস	৭৩
জাল প্রতাপচাঁদ—সঞ্জীবচন্দ্র	১৪০	ট্যানো	৯৮
জীব, জীব গোশ্বামী ২৬, ২৭, ৩০, ৩১		ট্রাইলজি ( Trilogy )	৯৯
জীবনযুতি—ববীন্দ্রনাথ	৭৫	ট্র্যাজেডি	১২২
জীবনানন্দ দাশ	১১৫	ট্র্যাজেডি'র স্বরূপাত—প্রমথ চৌধুরী	
জেলের খাড়া—বিপিন পাল	৭৭		১৫৪
জ্ঞানতত্ত্ববিদী সভা	১২৯-৩০	ঠ	
জ্ঞান দাস ১৭, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০, ৬০		ঠাকুরমার ঝুলি—দক্ষিণারঞ্জন	
জ্ঞান-বিজ্ঞান ( মাসিক পত্র )	১৬২		১১৮, ১৫৯
জ্ঞান বিজ্ঞানের কি ও কেন	১৬২	ঠাকুরদাঁ—ববীন্দ্রনাথ	১৫১
জ্ঞানাংকুর ( পত্রিকা )	১৪১	ড	
জ্যোতির্ময় বায়	১৫৬	ডাকঘর—ববীন্দ্রনাথ	১৩৪
জ্যোতির্মাল্য দেবী	১৫৬	ডাক্তার—মল্লয়ার	১৩৩
জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর ১১৯, ১২৬,		ডাচ ( ভাষা )	৭
১৩০, ১৫০		ডাক কলেজ	৬৯
ঝ		ডিকেন্স	১৪১, ১৬২
ঝড়েব রাতে—শচীন্দ্র সেনগুপ্ত	১৩৫	ডোম প্রবোধিত	১৩
ঝরাফুল—কল্পানিধান	১১৪	ঢ	
		ঢেকুরগড়	৩৭
ট		ড	
টপ্পা, উর্ধ্ব	৪৯, ৫৭	তত্ত্ববোধিনী	৮১, ৮৪, ৮৬
টপ্পা—শোরি মিত্র	৫৭	তত্ত্ব-সঙ্গীত	১১৭
টলস্টয়	১৬২	তত্ত্ব	৪
টুকটুকে রামায়ণ—নবকৃষ্ণ তর্জীচাঁদ		তত্ত্বাচাৰ	১৩
	১১৩, ১৫৮	তমসুক	১

তরঙ্গা গান	১২৭	ত্রিয়ঙ্গ	২, ১১
তরুণা—অমৃতলাল	১৩৩	ক্রবাস্ব কাব্য ( ফরাসী )	৪৭
তর্কবত্ত ( বামিনাবায়ণ )	৬৮, ১২৬,	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	১৩৭, ১৪২
	১২৭, ১২৮, ১৩০		
তাজমহল—গোবিন্দ বায়	১০৬	দ	
তাজমহল—প্রমথ বায়চৌধুরী	১১৩	দক্ষিণ বায়	৫০
তাজমহল ব্যাপাব—অমৃতলাল	১৩৩	দক্ষিণাবজ্ঞন মিত্র মজুমদার	
তাতল সৈকতে—জগদীশ	১৪৮		১৫৭, ১৫৮, ১৫৯
তাত্ত্বিক মোক্ষদ	৯	দহুজমর্দনদেব	২২
তামিল	৭	দববেশ, কিবণচাঁদ	১১২
তাম্রলিপ্ত	১৪৪	দবিত্তেব ক্রন্দন—বাধাকমল	৭৮
তাবকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, তাবক		দশাননবধ ( কাব্য )	১০০
গাঙ্গুলী	১৩৬, ১৪০, ১৪১	দশাবতার স্তোত্র—জয়দেব	১৭
তাবাচাঁদ শিকদার	১২৭	দাক্ষিণাত্য	১৫, ২৭, ৩১
তাবাশংকর তর্কবত্ত	৬৮, ৭০, ১৩৫	দাক্ষে	৯৮
তাবাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪৮,	দামিত্তা গ্রাম	৩৫
	১৫১, ১৫৫	দামোদর মুখোপাধ্যায়	১৩৬, ১৪০
তাকণ্য—অন্নদাশংকর	৭৯	দাবা ( শাজাহানঃ গিবিশ ঘোষ )	১৩২
তালগাছ—ববীন্দ্রনাথ	১৫৮	দার্মনিকী—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৭৮
তাহিবপুর, তাহেবপুর	২২, ৬০	দাশবধি, দাশবধি বায়, দান্ত বায়	
তিব্বত	৯		৪৯, ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬০, ৯৩
তিমিবনাশক ( সংবাদপত্র )	৭০	দাস বহুনাথ	২৬
তিনোস্তমাসম্ভব	৮৬	দান্ত	২৭
তীর্থঙ্কর—দিলীপ রায়	৭৯	দিদি—নিরুপমা	১৪৭
তীর্থ-সলিল—সত্যেন দত্ত	১১৪	দিদি ( গল্প )—ববীন্দ্রনাথ	১৫১
তুর্কী অভিধান	২, ১৪, ৬০	দিনেশ দাস	১১৫
তুষিত স্বকণী—জগদীশ	১৫৫	দিবারাত্রির কাব্য—মাণিক	১৪৮
তেলেগু	৭	দিলীপকুমার রায়	৭৮, ৭৯, ১৪৯
ত্রিধারা—চন্দ্রনাথ বসু	৭৩	দিল্লী	২
ত্রিবেণী—দ্বিজেন্দ্রলাল	১১২	দিল্লীখর	২, ৩

শব্দসূচী

১৮৫

দীন চণ্ডীদাস	৩০	দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১১৯
দীনবন্ধু মিত্র	৬৫, ৮৬, ৯৩, ৯৪,	দ্বাবিকানাথ বিজ্ঞানভূষণ	৮৯
১১৮, ১২৬, ১২৯, ১৩০, ১৩৩,		দ্বিজ চণ্ডীদাস	৩০
১৩৪, ১৩৮, ১৪২, ১৫৩, ১৫৮		দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭৮, ৮৫, ৯২,
দীনেন্দ্রকুমার বায়	৬৯, ৭৬, ৯০,		১০১, ১১৬
১৪৫, ১৫০, ১৫৩		দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	৬৮, ৬৯, ৯০, ৯২.
দীনেশচন্দ্র সেন	৪৩, ৬৯, ৭৬		১১১, ১১২, ১১৬, ১১৭,
দীনেশচরণ বসু	১০৮, ১১৯		১১৯, ১২০, ১২১, ১২২.
দীপনির্বাণ—স্বর্ণকুমারী	১৪৫		১২৩, ১২৬, ১৩০, ১৩১,
দুবাশা—ববীন্দ্রনাথ	১৫১		১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫
দুর্গাদাস লাহিড়ী	৭৮	দ্রাবিড় গোষ্ঠী	৫
দুর্গেশনন্দিনী—বঙ্কিমচন্দ্র	১৩৯		
দৃষ্টিপ্রদীপ—বিকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়			
	১৪৮	ধর্ম	৯, ১১, ৩৩
দেবদাস—শব্দচন্দ্র	১৪৭, ১৫৩	ধর্মঠাকুর	১৩, ৩৭, ৩৮
দেবদেবী-সঙ্গীত	১১৬	ধর্মপাল	২, ৬০
দেবানন্দপুর ( চণ্ডী )	৪০	ধর্মমঙ্গল	৩৭, ৬০
দেবী চৌধুরাণী—বঙ্কিমচন্দ্র	১৩৯	দীবেন্দ্রলাল ধব	১৬১
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৪, ৭৪, ৮১,	দুতুবা কল—গির্বাণ ঘোষ	১১২
৮৩, ৮৪, ৮৬		দুর্জিৎ প্রসাদ মুখোপাধ্যায়	
দেবেন্দ্রনাথ সেন	৯২, ১১০, ১১১		৭৮, ৭৯, ১৪৯
দেশ-বিদেশের শিল্প ও শিল্পী	১৬২	ধুমক পাতুলিপি—জীবনানন্দ দাশ	১১৫
দেশী-বিলেতী—প্রভাত মুখো.	১৫৫	ধোঁয়া	১৬
দেশে-বিদেশে—মজতুবা	৭৯	দ্ব্যতীবা—দ্ব্যতীন সিংহ	১৬৬
দোদে	১৫০		
দোলনচাঁপা—নজরুল	১১৫	ন	
দোলা—অচিন্ত্যকুমার	১৪৯	নজরুল ইসলাম, কাজি	১১৪, ১১৫,
দৌলৎ কাজি	৪৩, ৪৪, ৪৫, ৬০		১১৬, ১১৭, ১২৪, ১২৫
দ্বারকা	১	নদ-নদী—প্রবোধ সাহা	১৪৮
দ্বারকানাথ অধিকারী	৮৬	নদীয়া	২২, ৪০, ৬০
		ননী ভৌমিক	১৫৬

নন্দরাম দাস	২৫	নিতাই বৈরাগী	৯৪
নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	১১২, ১৫৮	নিত্যকৃষ্ণ বসু	১১২, ১১৩
নবদ্বীপ	২৭	নিত্যানন্দ শ্রদ্ধ	১৬, ২৬, ২৭
নবনাটক ( নাটক : রামনারায়ণ )	১২৮	নিধু, নিধুবাবু	৪৯, ৫৭, ৫৮, ৫৯,
নববাবুলিলাস	৭০, ৭৩, ৭৪, ১৩৭		৬০, ৯৪, ১১৬
নবীনচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সেন, নবীন সেন		নিভৃত চিন্তা—কালীপ্রসন্ন ঘোষ	৭৩
৬৬, ৮৭, ৯২, ৯৩, ৯৭, ৯৮.		নিয়তিবাদ	৩৭
৯৯, ১০১, ১০২, ১১৪, ১১৮		নিরঞ্জন	৩৭
নবীন তপস্বিনী—দীনবন্ধু	১৩০	নিরঞ্জনের রুখা	১৪
নয়া বাংলার গোড়াপত্তন		নিরুপমা দেবী	১৪৭
—বিনয় সরকার	৭৮	নির্বাণ	১০
নরহরি	২৬, ২৯, ৩১	নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৫
নরেন্দ্রনাথ মিত্র	১৫৬	নিশিকান্ত বসু	১৩৫
নরেন্দ্রনাথ সেন	৮৯	নিশিপদ্ম—প্রবোধ সান্ত্বাল	১৫৫
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	১৩৭, ১৪৭	নিশীথ চিন্তা—কালীপ্রসন্ন ঘোষ	৭৩
নলিনীকান্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত	৭৮, ৭৯	নিশীথে—রবীন্দ্রনাথ	১৫১
নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য	১২	নিষিদ্ধ ফল—প্রভাত মুখো.	১৫২
নসরৎ শাহ	৪৩	নীতিগল্প	১৫১
নাগকেশর—যতীন বাগচী	১১৪	নীরেন্দ্র চক্রবর্তী	১১৫
নাগপুঞ্জ	৪	নীলকণ্ঠ ( গীত-রচয়িতা )	৪৯, ৫৭
নাট্যসাহিত্য	১২৬	নীলকণ্ঠ ( ছদ্মনাম )	৮০
নাথগাথা, নাথ-সাহিত্য	১১, ১৪, ৬০	নীলদর্পণ	৬৭, ১২৯
নাথ-যোগী	১১, ৩৭, ৪০	নীলবিশ্রোহ	৬৫
নাথ-সম্প্রদায়	১২	নীল-লোহিতের আদি-প্রেম	
নালক—অবনীন্দ্রনাথ	১০৯	—প্রথম চৌধুরী	১৫৪
নারায়ণ দেব	৩৫, ৩৬, ৬০	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	১৬১
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৪৯, ১৫৬, ১৬১	নেড়া, নেড়ানেড়ী	২৭
নারায়ণ ভট্টাচার্য	১৪৫	নেপাল	৯, ১০, ১২
নারায়ণী ( রামের স্মৃতি )	১৫৩	নৈবেদ্য—রবীন্দ্রনাথ	১০৮
নিগম	৪	নৈরঞ্জন	১৪



	শব্দসূচী	১৮৭
নৈরঞ্জনাভূ	১০ পরশুরাম ( প্রাচীন কবি )	২১
নৈরঞ্জনা-রূপিনী	৯ পরশুরাম ( রাজশেখর বসু )	১৫১,
নৌকাভূবি	১৪৩	১৫৬
	পরশুরামের কুঠার ( গল্প )	
প	—সুবোধ ঘোষ ১৫৬	
পঞ্চগোড়	১৭ পরিচয় ( মাসিকপত্র )	২১
পঞ্চগ্রাম—তাবাংশংকব	১৪৮ পরিমল—গিরিজা মুখোপাধ্যায়	১১২
পঞ্চভূত—রবীন্দ্রনাথ	৭৫ পরিমল গোস্বামী	১৫৬
পঞ্চানন্দ	৮৮ পত্নীগীত ( ভাষা )	৭
পণ্ডিতী বাংলা	৭২ পলাশীব যুদ্ধ—নবীন সেন	
পথে-প্রবাসে—অন্নদাশঙ্কর	৭৯	৬৩, ৯৮, ৯৯, ১০৬
পথের দাবী—শবৎচন্দ্র	১৪৭ পল্লীচবিত্র—দীনেন্দ্র বায়	
পথের পাঁচালী—বিভূতি বন্দ্যো.	১৪৮ পল্লীচিত্র ঐ	
পদকল্পতরু	২০ পল্লীবাসেব সুখ-দুঃখ—চন্দ্রনাথ বসু	৭৩
পদাতিক—সুভাষ মুখোপাধ্যায়	১১৫ পল্লীবৈচিত্র্য—দীনেন্দ্র বায়	১৫২
পদাবলী, পদাবলী সাহিত্য	২৬, ২৮, ৩০, ৬০	পল্লীসমাজ—শবৎচন্দ্র ১৫৩
	পাঁচকড়ি দে	১৪৫
পদ্মাবৎ	৪৪, ৪৫ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৯, ৭৬,
পদ্মনাভ—জ্যোতির্ষর রায়	১৫৬	৮৯, ৯০
পদ্মপুরাণ	১৬ পাঁচকাটা—গিবিশ ঘোষ	১৩২
পদ্মা	৩৯ পাঁচালি, পাঁচালী ৫৩, ৫৭, ৯৩, ১২৭	
পদ্মাতীর	১১০ পাঠশালা ( শিশু-মাসিক )	১৬২
পদ্মাপুরাণ	৩৪, ৩৮, ৯৩	পাঞ্জাব, পঞ্জাব ৫, ৮৯
পদ্মাবতী—আলাওল	৪৪	পাঞ্জাবী ( ভাষা ) ৭
পদ্মাবতী ( জয়দেব-পত্নী )	১৬	পাতালকঙ্কা—অজিত দত্ত ১১৫
পদ্মাবতী—মাইকেল	১২৮, ১৩১	পাথর-পূজা ৪
পদ্মিনী-উপাখ্যান—রঙ্গলাল	৯৫	পাত্রী, পাত্রী-পণ্ডিত ৮১, ৮২, ৮৩ ৮৪
পদ্যমালা—মনোমোহন	১৫৮	পার্বতী ৩৮, ৩৯, ৪১, ৫৩
পরকীর্ত্তাবাদ	৪৭	পাল-আমল, পাল-বুগ, পাল-রাজহু
পরশুরামে—বিজেন্দ্রলাল	১৩২	২, ৩, ৯, ১২

পালরাজগণ, পালরাজবংশ	২, ১০, ৬০	পোস্তাপুত্র—অহরুপা দেবী	১৪৭
পালাবদল—অমিয় চক্রবর্তী	১১৫	পোস্ত	১, ৩, ৬০
পালার্মো	৭৩	পৌরাণিক নাটক	১৩২, ১৩৪
পাষাণী—দ্বিজেন্দ্রলাল	১৩২	প্যাণ্ডিনিয়ম	৯৮
পিতাপুত্র—অক্ষয় সরকার	৭৩	প্যারডি	১৩৩
পিতৃদেবতা, পিতৃপূজা	৪, ৯	প্যাভাডাইস লস্ট	৯৮, ১০০
পিঁপড়ে-পুবাণ—প্রমেন্দ্র মিত্র	১৬১	প্যারীচাঁদ মিত্র ( টেকচাঁদ )	৬৬, ৮৫
পীষ্মলহরী	১৬	প্রতাপাদিত্য	৪০
পীর	৫	প্রতাপাদিত্য ( নাটক )	
পুতুল ও প্রতিমা—প্রমেন্দ্র মিত্র	১৫৫	—ক্ষীবোদপ্রসাদ	১৩৩
পুতুলনাচেব ইতিকথা—		প্রতাপাদিত্য-চরিত	
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪৮	—বামবাম বহু	৭০
পুরাণ	৫, ২৫, ৪১	প্রতাপাদিত্য-মানসিংহের যুদ্ধ	৪০
পুবাণ-প্রচাবকেবা	২১	প্রতিধ্বনি—গিবিশ ঘোষ	১২২
পূবী	২৭	প্রথমা—প্রমেন্দ্র মিত্র	১১৫
পুরু-বিক্রম—জ্যোতিবিল্লাস	১৩০	প্রদীপ—অক্ষয় বড়াল	১১১
পুরুষ	৪	প্রকুল—গিবিশ ঘোষ	১৩১
পূর্ববী—ববীলুনাথ	১০৮	প্রকুল বায়	১৫৬
পূর্ববঙ্গ	১, ৬০	প্রবাসী ( মাসিকপত্র )	৮৯, ৯০
পৃথিবীর ইতিহাস	১৬২	প্রবোধকুমার সান্তাল	৭৯, ১১৭, ১৪৮,
পৃথিবীর সেবা সাহিত্য	১৬২		১৪৯, ১৫১, ১৫৫
পৃথ্বীবাজ ( নাটক )—মনোমোহন		প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়	৮৯
গোন্ধামী	১৩৫	প্রবোধচন্দ্রিকা	৭০
পৃথ্বীরাজ ( মহাকাব্য )		প্রভাকর, সংবাদ প্রভাকর	৮১, ৮৪,
—যোগীন্দ্রনাথ বসু	১০০		৮৫, ৮৬, ৯৪
পেঁড়ো-বসন্তপুর ( বর্ধমান )	৪০	প্রভাত—স্বর্ণকুমারী দেবী	১১৩
পেশাদার রঙ্গমঞ্চ, পাবলিক স্টেজ	১১০	প্রভাত মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার	
পোকা-মাকড়—জগদানন্দ রায়	১৬২	মুখোপাধ্যায়	৬৬, ৬৯, ১৪২, ১৪৫,
পোড়া মহেশ্বর—দীমবহু	১৪০		১৪৬, ১৫০, ১৫২, ১৫৩
		প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬১

প্রভাস—নবীনচন্দ্র সেন	৯৮, ৯৯	প্রেমেন্দ্র মিত্র	১১৫, ১৩৭, ১৪৮, ১৪৯,
প্রমথ চৌধুরী	৬৬, ৬৭, ৬৯, ৭৫,		১৫১, ১৫৫, ১৫৭, ১৬১
	৭৮, ৭৯, ৯০, ১৫০, ১৫৪		
প্রমথনাথ বিদ্যী	৮০, ১৩৫,	ক	
	১৪৯, ১৫৬	ফকির	৫
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী	১১৩	ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬১
প্রমদাচরণ সেন	১৬০	ফণীন্দ্রনাথ পাল	১৪৭
প্রমীলা	৭০	ফণীমনসা—নজরুল	১১৫
প্রমীলা নাগ	১১৪	ফরাসী ( ভাষা )	৭
প্রয়াগ	২৭	ফরাসী সাহিত্য	১৫০
প্রমত্ত	১৪	ফসিল—সুবোধ ঘোষ	১৫৬
প্রসন্নময়ী দেবী	১১৪	ফাসী	৭
প্রহসন	১২৯, ১৩৩	ফুলরেণু—গোবিন্দ দাস	১১১
প্রাক-বঙ্কিম উপন্যাস	১৩৭	ফুলিয়া	২২
প্রাক-রবীন্দ্র কবিগণ	৯৮	ফুলের মূল্য-প্রভাত মুখোপাধ্যায়	১৪২
প্রাক-রবীন্দ্র পব	৯৯	ফুলবা	৩৬
প্রাকৃত, প্রাকৃত পৈঙ্গল	৫, ৬, ৭	ফেবাবী ফোজ—প্রেমেন্দ্র মিত্র	১১৫
প্রাগৈতিহাসিক—মাণক		ফেরুসা গ্রাম	১২
	বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৬	ফৈজুল্লা	২৩
প্রাচীন সাহিত্য—ববীন্দ্রনাথ	৭৫	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ	৬৩
প্রাচ্য ও পশ্চাত্য—বিবেকানন্দ	৭৭	ফ্রেয়েডবাদ	১৫৫
প্রায়শ্চিত্ত—ববীন্দ্রনাথ	১৪৩	ফ্রেয়েডীয় বিজ্ঞান	১৪৮
প্রিয়ঙ্কর দাস	২৬		
প্রিয়নাথ সেন	৭৬, ৯০, ১১৩	ব	
প্রিয়দা দেবী	১১৪	বঙাল, বঙালী	৩
প্রতপুজা	৪	বক্তিমার খিলজী	১৭
প্রেমবিলাস	২৬	বগী-বিন্দীর লড়াই	১৩৫
প্রেমলীলার পদ	২৬	বঙ্কিম, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র	
প্রেম-সঙ্গীত	১২১	চট্টোপাধ্যায় ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭০,	
প্রমাংকুর আতর্ষী	১৪৭, ১৪১, ১৫৪	৭১, ৭৩, ৭৪, ৮১, ৮২, ৮৬, ৮৭,	

২৩, ২৪, ২৫, ১০১, ১১৬, ১১৮,	বন্দেমাতরম্ ( গান ) ১১৮, ১১৯, ১৩৯
১২২, ১৩৬, ১৩৮, ১৪০, ১৪১,	বন্দেমাতরম্ আন্দোলন ১০৭
১৪৩, ১৪৬, ১৫০, ১৫৮	বন্দেমাতরম্ ( সংবাদপত্র ) ৮৯
বঙ্কিম-যুগ ৬৯, ৭৩, ২০, ১১৮	বঙ্কুবিয়েগে—বিহারীলাল ১০৫
বঙ্কিমী আদর্শ, বঙ্কিমী স্টাইল ৭৩, ১৪০	বরদাচরণ মিত্র ১১২
বঙ্কিমোত্তর লেখকগণ ১৪৪	বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ১৩৫
বঙ্গদর্শন ( মাসিকপত্র ) ৭৫, ৮১,	বরদাবাটী গ্রাম ৩৮
৮৫, ৮৭, ৯০	বরিশাল ৩৪, ৬০
বঙ্গবাণী ( সংবাদপত্র ) ৮১, ৯০	বরেন বসু ১৪৯
বঙ্গবাসী ( ঐ ) ৮১, ৮৮, ১৪২	বর্ধমান ২৩, ২৪, ৩৪, ৩৫, ৪১
বঙ্গবিজেতা—রমেশ দত্ত ১৪০	বর্ধমান-রাজকুমারী ' ( বিদ্যা ) ৪১
বঙ্গবিভাগ, বঙ্গভঙ্গ, বঙ্গভঙ্গ	বর্ধমান-রাজমহিষী ৪২
আন্দোলন ৬৫	বলদেব পালিত ১০০
বঙ্গভাবান্ধধান ৬৬	বলবান জামাতা—প্রভাত মুখো. ১৫২
বঙ্গরাজ ( পৌরাণিক যুগ ) ১	বলরাম দাস ২৯
বঙ্গসুন্দরী—বিহারীলাল ১০৫	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ১৪৯, ১৫৬
বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদ ১৬২	বলাকা—রবীন্দ্রনাথ ১০৮, ১১২
বঙ্গ বর্গা—নিশিকান্ত ১৩৫	বলিদান—গিরিশ ঘোষ ১৩১
বঙ্গযান ৯	বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৬, ৯০, ১০০
বটতলা ২১	বল্লাল, বল্লাল সেন ২, ৫, ১৫
বড়বাড়ী—জলধর সেন ১৪৫	বসুমতী ৮১, ৮৮
বড়ু চণ্ডীদাস ১৫, ১৯, ২০, ৬০	বসু রামানন্দ ২৪
বদন অধিকারী ৪৯, ৫৭	বহরমপুর কলেজ ৬৩
বধুবরণ—শৈলজানন্দ ১৫৫	বহুবিবাহ-নিবারণ ৮৩
বনভুলসী—কুমুদরঞ্জন ১১৪	বাইরন ৯৮
বনভুল ( বলাইচাঁদ মুখো. ) ১৪৯, ১৫৬	বাইরনের প্রতি—বিজেন্দ্রলাল ১১২
বনবীর—রাজকৃষ্ণ রায় ১৩২	বাউল ১৫, ৪৯, ৫৪, ৫৫
বনে-জঙ্গলে—যোগীন গরকার ১৫৮	বাউল গান, বাউল-সঙ্গীত ৪৯, ৫৫, ৫৬, ৬০, ১০৭, ১২৬
বন্দিনী স্তব্ধা—আশিস কুণ্ড ১৫৬	বাউল-মুর ১১৭
বন্দীর বন্দনা—বুদ্ধদেব ১১৫	

বাংলা ( ভাষা )	৬, ১৭, ২১	বাঙালী, বাঙ্গালী	১৯
বাংলা গল্পভাষা	৭, ৬২, ৭৩	বাসবদত্তা	২৫, ১৩৬
বাংলা বৈষ্ণব কাব্য	২০	বান্ধুকি	৩৪
বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা—		বান্ধুদেব	১
মুনীতিকুমার	৭৮	বান্ধুদেব ঘোষ	২২
বাংলা শিক্ষক—রাধাকান্ত দেব	৬৬	বাহু বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির	
বাংলা সাহিত্য ৫, ৫৬, ৬৭, ৬৯, ১১৭		সম্বন্ধ-বিচার	৭২
বাঁকুড়া	১২, ৩৫	বিচিত্র প্রবন্ধ—রবীন্দ্রনাথ	৭৫
বাঘপুজা	৪	বিজয় গুপ্ত	৩৪, ৩৫, ৩৮, ৩৯,
বাঙালী ও বাংলা—রাধাকমল			৬০, ৯৩
মুখোপাধ্যায়	৭৮	বিজয়চন্দ্র মজুমদার	২০, ১১২
বাঙালীর রূপান্তর	৬০	বিজয় সিংহ	২
বাজার করা ব হাজার ঠালা—		বিজয়া-সঙ্গীত	৫৩
শিবরাম ১৬১		বিদায়-অতিশাণ—রবীন্দ্রনাথ	১৩৪
বাজীকর—প্রেমাকুর	১৪৭	বিহা	৪০
বাড়তির পথে বাঙালী—		বিহাপতি	১৫, ১৭, ২০, ৩০, ৬০
বিলয় সরকার ৭৮		বিহাসাগর	৬৩, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭০,
বাড়ী থেকে পালিয়ে—			৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৮৪,
শিববাম চক্রবর্তী ১৬১			৮৬, ৯০, ১৩৬, ১৩৮,
বাণভট্ট	২		১৫৭, ১৫৮
বাণী ও কল্যাণী—		বিদ্যাসাগরী বাংলা ভাষা বা স্টাইল	
রজনীকান্ত সেন	১১২		৬৮, ৭১, ৭৩, ৭৬
বাণী রায়	১৫৬	বিদ্যানুন্দব	৪১, ৪২, ৪৭, ৪৯, ৫০,
বান্ধব ( মাসিকপত্র )	৮১, ৮৭		৫২, ১২৭
বামাচার	৮৩	বিধবাবিবাহ আইন	৬৩
বামুনের মেয়ে—শরৎচন্দ্র	১৪৭, ১৫৩	বিধবাবিবাহ-প্রচার	৭২
বারভ্রতের ছড়া	৪৮	বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন	৮৩
বারমাস্তা	৩৩	বিধবাবিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাব—	
বাহ্মীকি	২২	বিদ্যাসাগর	৭১
বালাশিলা—রাধাকমল বলাক	১৫৮	বিদ্যুশেখর শাস্ত্রী	৭৩

বিনয় সরকার, বিনয়কুমার সরকার	বীণাবাদী—প্রমথ চৌধুরী	১৫৪			
৭৭, ৭৮	বীতংস—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৫৬			
বিনিময়—সুরেন্দ্রমোহন	বীবরের বাগদ্বান	১৫৮			
১৪৫	বীরবল ( প্রমথ চৌধুরী )	৬৯, ৭৬			
বিনোদিনী—জগদীশ গুপ্ত	বীরভদ্র	১৬, ২৭			
১৫৫	বীরভূম জেলা	১৬			
বিন্দুর ছেলে—শরৎচন্দ্র	বীরমহিমা—রজনীকান্ত গুপ্ত	১৬২			
১৫৩	বীরঙ্গনা ( কাব্য )	৯৭			
বিনিনচন্দ্র পাল ৬৯, ৭৬, ৭৭, ৮২, ৯০	বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ				
বিবাহের চেয়ে বড়—অচিন্ত্যকুমার	—মাইকেল	৭০			
১৪৮	বুদ্ধ, বুদ্ধদেব	৯, ১১			
বিবেকানন্দ	১৩৭, ১৪৮, ১৪৯	বুদ্ধদেব-চরিত—গিরিশ	১৩১		
৭৬, ৭৭	১১৫	১৪৯, ১৫৫, ১৫৭, ১৬১			
বিভীষণ	১১৫	১৪৯	বুর্জোয়া—মল্লয়ার	১৩৩	
২২	১৮৮, ১৫৬	১৮০	বুদ্ধপূজা	৪	
বিকৃতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৭, ১৪৮, ১৪৯	২৮	বুদ	২৭	
১৩৭, ১৪৮, ১৪৯	১১৫	৬৭, ১৩৯	বুদ্ধসংহার ( কাব্য )	২৭, ২৮	
বিকৃতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	১৪৮, ১৫৬	১১৫	বুদ্ধের বচন	৮৮	
১৪৮, ১৫৬	১১৫	১৬	বুদ্ধাবন	২৭, ২৯, ৩১	
বিমলচন্দ্র ঘোষ	১১৫	২৭, ৩১	বুদ্ধাবন দাস	২৬, ৩০, ৩১	
১১৫	১১৫	১১৭	বেধুন কলেজ	৬৪	
বিমল মিত্র	১৪৯	১৭	বেদ	৬, ৬০	
১৪৯	১৮০	১১৫	বেদেনা—তারাক্ষর	১৫৫	
বিষে পাগলা বুড়ো	১৮০	১১৫	১৪৩	বেনের মেয়ে—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১৪৪
১৮০	১৮০	১১৫	১৪৩	বেদান্ত ধর্মব্যাখ্যান	৮৪
বিষকর্মার কর্মশালা বর্ণনা	২৮	১১৫	১৪৩	বেদান্ত	১৩৯
২৮	৬৭, ১৩৯	১১৫	১৪৩	বেলা—গিরিজা মুখোপাধ্যায়	১১২
বিষবুদ্ধ—বুদ্ধচন্দ্র	৬৭, ১৩৯	১১৫	১৪৩	বৈকুণ্ঠের খাতা—রবীন্দ্রনাথ	১৩৪
৬৭, ১৩৯	১১৫	১১৫	১৪৩	বৈজয়ন্তী—গোবিন্দচন্দ্র দাস	১১১
বিষু দে	১১৫	১১৫	১৪৩		
১১৫	১১৫	১১৫	১৪৩		
বিষুপূরণ	১৬	১১৫	১৪৩		
১৬	২৭, ৩১	১১৫	১৪৩		
বিষুপ্রিয়া	২৭, ৩১	১১৫	১৪৩		
২৭, ৩১	১১৭	১১৫	১৪৩		
বিষুরাম চট্টোপাধ্যায়	১১৭	১১৫	১৪৩		
১১৭	১৭	১১৫	১৪৩		
বিসকী	১৭	১১৫	১৪৩		
১৭	১১৫	১১৫	১৪৩		
বিসর্জন—রবীন্দ্রনাথ	৯২, ১০১, ১৩৪, ১৪৩	১১৫	১৪৩		
৯২, ১০১, ১৩৪, ১৪৩	১১৫	১১৫	১৪৩		
১০৪, ১০৫, ১০৭, ১০৯, ১৪১	১১৫	১১৫	১৪৩		

বৈদিক আর্থ	১, ৪, ৫, ৬	ব্রজ রায়	৪২, ৫৪, ৫৭
বৈদিক আর্থসভ্যতা	৬০	ব্রহ্ম	২৮
বৈদিক সংস্কৃতি	৫, ৯	ব্রহ্মজিজ্ঞাসা	১১৮
বৈষ্ণব কবি	১৬, ১৭, ১৮	ব্রহ্মবাদব উপাধ্যায়	৮৯
বৈষ্ণব কবিতা	৫২, ৫৪, ৫৭,	ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ	১৬
	১১৪, ১২৭	ব্রহ্ম-সঙ্গীত	১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২১
বৈষ্ণব ধর্ম	১৫, ২৪, ২৭	ব্রহ্ম-সঙ্গীত	১১৭
বৈষ্ণব গান, বৈষ্ণব পদাবলী	৪২, ১০৭	ব্রাউনিঙ	১০৮
বৈষ্ণব বাৎসল্য-সঙ্গীত	৫১	ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মধর্ম	১১৭, ১১৮
বৈষ্ণব ভাবসাধনা	১৬	ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি	৫, ৬০
বৈষ্ণব মতাবলম্বী	১৫	ব্রাহ্মসমাজ	৫৪, ৮৩
বৈষ্ণব মহাজন	৫০		
বৈষ্ণব সহজিয়া	১৫, ২৭	ভ	
বৈষ্ণব সাহিত্য	৭, ২৬, ২৮	ভক্তিবাদী	১৫
বোধি	১০	ভক্তিবহ্নাকব	২৬
বোধোদয়—বিদ্যাসাগর	১৫৮	ভক্তিরসামৃতসিঙ্ধু	২৬, ৩০
বোঁঠাকুবাণীব হাট—বরীন্দ্রনাথ	১৪৩	ভগবৎ-সঙ্গীত	১১৭
বুদ্ধ	২, ৫, ৯, ১০,	ভগীবথ	২৫
	১১, ৩৭, ৫৫, ৬০	ভজাব বাঁশী—গুরুসদয়	১৬১
বুদ্ধ গান ও দোঁহা	৬৯	ভট্ট বসুনাথ	২৬
বুদ্ধধর্ম	৫, ৯, ১০, ১১, ১৩	ভদ্রার্জুন (নাটক)	
বুদ্ধ তিনু	১৫	—তারার্টান শিকদাব	১২৭
বুদ্ধ শূন্যবাদ	১৩-১৪	ভবভূতি	৬
বুদ্ধ সহজিয়া	২	ভবানন্দ	৪০
বুদ্ধ সহজিয়াবাদ	৬০	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৮, ৭১,
বোধায়ন সূত্র	৪		১৩৬, ১৩৭, ১৩৮
ব্যালজাক	১৫০	ভবানী দাস	১৩
ব্রহ্মবুলি	১৮, ২৯	ভদ্রা	৫
ব্রজবেণু—কালিদাস রায়	১১৪	ভাগবত	১, ১৬, ২১, ২৩,
ব্রজরাধাল	২৭		২৪, ২৫, ২৮

তাগলপুর	১৫৩	ম	
তাগাহীনা—সুরেশ সমাজপতি	১৫৩	মগধ	২, ৭, ৬০
তাটিয়ালী গান	১১৬	মঙ্গল-কবি	৪০, ৪৩
তাঁড়ু দত্ত	৩৬	মঙ্গল কাব্য, মঙ্গল	৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬,
তাহুসিংহের পদাবলী			৩৭, ৪০, ৪১, ৪৬, ৪৯,
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮		৫০, ৫৩, ৯৫, ১০০, ১২৭
ভাব-সাধক	১৫	মঙ্গল গান	৬৭, ১২৭
ভাবী সমাজের ভিত্তি		মঙ্গলচণ্ডী	৩৫
—বিনয়কুমার সরকার	৭৮	মঙ্গলমঠ—শৈলবালা	১৪৫
ভাবতচন্দ্র	২, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪২,	মঙ্গল সাহিত্য	৭
	৪৯, ৬০, ৯২, ৯৩, ৯৫	মডেল ভগিনী—যোগেন্দ্র বসু	১৪২
ভারত-ভিক্ষা—হেমচন্দ্র	১০৬	মণিমঞ্জুবা—সত্যেন দত্ত	১১৪
ভাবতী ( মাসিকপত্র )	৭৫, ৮৫,	মণিব বর—নাবায়ণ ভট্টাচার্য	১৪৫
	৮৭, ৯০, ১৫৪	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১৫৫, ১৫৭, ১৬১
ভাবতীষ উপাসক-সম্প্রদায়		মণিহারা—রবীন্দ্রনাথ	১৪১
—অক্ষয় দত্ত	৭২	মণীন্দ্র রায়	১১৫
ভার্জিল	৯৮	মণীন্দ্রলাল বসু	১৪৭
ভাস, কবি	৬	মণীশ ঘটক	১১৫
ভিক্টর হুগো	১৬২	মতিলাল ঘোষ	৮৯
ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী	১১৩	মথুরা	২০, ২৭, ২৯
ভুবনমোহন রায়	১৬০	মদনমোহন তর্কালংকাব	৬৮, ৭০,
ভুবনেশ্বরী স্তোত্র	১১		৯৫, ১৫৭, ১৫৮
ভূমুকপাদ	১০	মধ্যাহ্ন—গিরিজা মুখোপাধ্যায়	১১২
ভূঁইঞা-রাজগণ	৩	মধ্যাহ্ন—অর্ণকুমারী দেবী	১১২
ভুতুড়ে বই—শৈলজামন্দ	১৬১	মনসা	৩৪, ৩৫, ৩৮, ৪৯
ভূদেব মুখোপাধ্যায়	৮৭, ৮৭, ১৫৭	মনসামঙ্গল	৩৪, ৩৭, ৬০
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৫	মনের পরশ—দিলীপ রায়	১৪৯
ভোলা ময়রা	৬০	মনের মাহুঘ—প্রভাতকুমার	১৪৬
ভ্রান্তিবিলাস	৭২, ১৩৮	মনোজ বসু	১৪৯, ১৫৬
ভ্রাম্মাণ্য—দিলীপ রায়	৭৯	মনোমোহন গোস্বামী	১৩৫



মনোমোহন বসু	১১৬, ১১৯, ১২৬, ১৩০, ১৫৭, ১৫৮	মহাশক্তি-জীবনপ্রভাত—রমেশ দত্ত	১৪০
মনোমোহন বাবু	১৩৫	মহাশ্মশান—কায়কোবাদ	১১৪
মন্ত্রশক্তি—অমরুপা	১৪৭	মহিলা কাব্য—মহেন্দ্রনাথ	১০৪, ১০৫
মন্দির—কিবগর্চাদ দববেশ	১১২	মহয়া—রবীন্দ্রনাথ	১০৮
মন্ড—বিজেন্দ্রলাল	১১২	মহেঞ্জোদাড়ো	৫, ১৪৪
মন্মথ বায়	১৩৫, ১৬১	মহেন্দ্র গুপ্ত	১৩৫
ময়মনসিংহ	১, ৩৪, ৫০	মহেন্দ্রনাথ সরকার	৭৭, ৭৮
ময়মনসিংহ-গীতিক।	৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫৬, ৬০	মহেন্দ্র রায়	৭৯
মবমিয়াগণ	১০৭	মহেশ ( গল্প )—শরৎচন্দ্র	১৫৩
মবীচিকা—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	১১৫	মা—অমরুপা দেবী	১৪৭
মকতীর্থ হিংলাজ—অবধূত	১৪৯	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	২১, ৬৬, ৬৭, ৮৬, ৯২, ৯৩, ৯৫,
মকমাসা—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	১১৫		৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯,
মক্কাশা— ঐ	১১৫		১০০, ১০১, ১০৭,
মলেশাব	১০৩, ১৬২		১১১, ১১৬, ১২৬,
মহম্মদ জাযসী	৪৫		১২৯, ১৩০, ১৩৮,
মহাদেব	৪০		১৪১, ১৪৬, ১৪৮
মহাপৃথিবী—জীবনানন্দ	১১৫	মাইকেল এঞ্জেলো	৯৬
মহাপ্রভু	১৫, ১৬, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০, ৩১	মাইকেল-মুগ	১০০
মহাপ্রস্থানেব পথে—প্রবোধকুমার	৭৯	মাইকেলোস্তর পর্ব	৯৯
মহাভাবত	৬, ১৬, ২১, ২৫, ৪৯, ৬৫, ৭৩, ১৬২	মাইকেলোস্তর বাংলা সাহিত্য	১০১
মহাত্মারত—অমরুদ	৮৪	মা ও মেয়ে—দামোদর	১৩৬, ১৪০
মহামদ ( মাহত্মা )	৩৭	মাগধী	৬
মহামান, মহামানী	৯	মাগন ঠাকুর, মহম্মদ	৪৪
মহামুন্সের ইতিহাস—শৈলজানন্দ	১৪৮	মাগিক গাঙ্গুলী	৩৭
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র	৪০	মাগিকগর্চাদ, বাজা	১২
মহারাজ	৮৯	মাগিক পীরের গান	১৩০
		মাগিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৭, ১৪৮, ১৫১
		মাগিক ভট্টাচার্য	১৫৫

মাতৃদেবতা	২, ৪২, ৫০	মিল	১৩৯
মাতৃদেবতার পূজা	৪	মিশনারী	২২
মাধুর পদাবলী	২২	মিশরকুমারী—বরদা দাশগুপ্ত	১৩৫
মাদ্রাজ	৮২	মীনচেতন	১২, ১৩
মাধবাচার্য	১১, ৬০	মীননাথ	১২, ১৩
মাধবী-কঙ্কণ—রমেশ দত্ত	১৪০	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবি কঙ্কণ	৩, ৩৫,
মাধবীলতা—সঞ্জীব	১৪০		৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪২, ৬০
মানকুমারী বহু	১১৩-১৪	মুকুল ( শিশু-মাসিক )	১৬০
মানমণি গার্লস স্কুল—রবীন্দ্র নৈত্র		মুক্তধারা—রবীন্দ্রনাথ	১৩৪
	১৩৫	মুঙ্গল গোষ্ঠী	৪
মান সিংহ	৪০	মুচিরাম গুড়	৭৪
মানসী—রবীন্দ্রনাথ	১০৮	মুক্ততবা আলী	৭২
মারা	৩৫	মুণ্ডা ( ভাষা )	৭
মারাবী—পাঁচকড়ি	১৪৫	মুরারি গুপ্ত	৩১
মারার খেলা—রবীন্দ্রনাথ	১৩৪	মুরারি শীল	৩৬
মারাসি ( ভাষা )	৭	মুর্শিদা গান	১১৬
মাস্ক বাদ	১৫৫	মুর্শিদাবাদ	৬০
মাস্কো দর্শন	১৪৮	মুসলীম কিসসা-সাহিত্য	১৩৬
মার্ম্যান	৬৬, ৭০	মুসলীম যুগ	২
মালক—চিত্তরঞ্জন	১১৩	মুসলীম সুলতানগণ	২
মালদহ	১	মৃগলুক	৩৮
মালয়ালী	৭	মৃণালিনী—বঙ্কিম	১৩২
মালাধর বহু	২১, ২৩, ২৪, ২৭, ৬০	মৃত পূর্বপুরুষদের পূজা	৪
মালাদান—রবীন্দ্রনাথ	১৫১	মৃত্তিকা—শ্রেমেন্দ্র মিত্র	১৫৫
মাসিকপত্র ( পত্রিকা )	৮৫	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার	৬৬, ৬২,
মাস্টার মশায়—প্রভাত স্মৃতি.	১৫২		৭০, ৭১, ৭৪
মাহাদ্যা ( মহামদ )	৩৭	মেঘ ও রৌদ্র—রবীন্দ্রনাথ	১৫২
মিত্রাকর	১০১	মেঘনাদবধ ( কাব্য )—হাইকেল	৬৭,
মিথিলা	২, ১৫, ১৭, ১৮, ৬০		২৭, ২৮, ২৯
মিরজাকর	১৮	মেঘনাদ সাহা	৭৭, ৭৮

শব্দসূচী

১২৭

মেটোরলিক	৭৯	যাক্সেসেনী—অমৃতলাল	১১৩
মেজদাব ডায়েরী—প্রবোধ চট্টো.	৭৯	যাত্রা	৬৭
মেদিনীপুর	১, ১৩, ৩৫, ৩৮	যাদবেন্দ্র	২৯
মেনকা	৫৩, ৫৪, ৫৭	যামিনীকান্ত সোম	১৬২
মেবাব	৯৫	যাযাবর	৭৯
মোগল-পাঠান—সুবেজ বন্দ্যো	১৩৫	যুগধর্ম	১১৬
মোপার্সা	১৫০	যুগল অম্বুবীর	১৫০
মোহিতলাল মজুমদার	৭৮, ১১১, ১১৪	যুগল-আবোধনা	৪
মৌচাক ( শিশু-মাসিক )	১৬২	যুগান্তর ( সংবাদপত্র )	৮১, ৮৯
মোর্গ	৯, ৬০	যেদিন কুটিল কমল—বুদ্ধদেব বসু	১৪৯
ম্যাকবেথ—গিবিথ	১৩১	যোগী, যোগী ধর্ম	২, ৯, ১৩, ১৫
		যোগীন্দ্রনাথ বসু	১০০, ১৩৭
		যোগীন্দ্রনাথ সবকাব	১৫৭, ১৫৮, ১৫৯
য		যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১৬২
যকেব বন—হমেন্স বায়	১৬১	যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৮৮
যজ্ঞভঙ্গ—বিজয়চন্দ্র মজুমদার	১১২	যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু	১৪২
যতীন পাল	১৪৫	যোগেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ	৮৫, ৮৯
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	১১৪, ১১৫	যোগেশ ( কাব্য )	১০০, ১০১
যতীন্দ্রমোহন শংকর	১১৪	যোগেশচন্দ্র বাহ, বিজ্ঞানবি	৭৯
যতীন্দ্রমোহন সিংহ	৭৬, ১৪৫, ১৪৬		১
যজ্ঞনন্দন	২৬		
যজ্ঞনাথ সবকাব	৭৭	র	
যজ্ঞপুর	৩৮	বংকট—ববেন বসু	১৪৯
যমজ ভগিনী—সৈয়দ হোসেন	১১৪	বক্তৃকববী—ববীন্দ্রনাথ	১৩৪
যমুনা ( মাসিকপত্র )	১৫৪	বক্তব্য ঞ্ণ—নবেশ সেন	১৪৭
যমুনালতাবী ( কবিতা )		বহু ( বহুবংশ )	৮৩
—গোবিন্দচন্দ্র রায়	১০৫	বঙমহল—হরিশাধন মুখো.	১৪৪
যশোদা	২৭, ২৯, ৫২, ৫৩, ৫৭	বঙ্গনাট্য	১৩৪
যশোমন্ত সিংহ	৩৮	বঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়	৬৬, ৮৬,
যশোহর	১		৯৪, ৯৫
যজ্ঞপুর	১৩	রজনীকান্ত গুপ্ত	১৬২

রজনীকান্ত সেন	১১২, ১১৬, ১১৯,	রমাপ্রসাদ চন্দ	৭৬
	১২১, ১২২, ১২৩.	রমেশচন্দ্র দত্ত	৬৬, ৭২, ১৩৬, ১৪০
রজন (ছদ্মনাম)	৮০	রমেশচন্দ্র মজুমদার	৭৭
রঞ্জাবতী	৩৭	রসময়ীর রসিকতা—প্রভাত মুখো.	
রতিদেব	৩৮		১৫২
রত্নদীপ—প্রভাত মুখোপাধ্যায়	১৪৬	রসরাজ (পত্রিকা)	৮৫
রবিদীপিতা—অরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৭৮	রসিক রায়	৫৪, ৫৭
রবীন্দ্র-উপভাস	১৪৩, ১৪৪	রাই	২৪
রবীন্দ্র-কাব্য	১০৭, ১০৮	রাই উদ্দাদিনী—কৃষ্ণকমল	৫৭
রবীন্দ্র-গোষ্ঠী	৯০	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৫, ৭৬,
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮, ৬৬, ৬৭,		১৪৪, ১৪৫
	৬৯, ৭৪-৭৭, ৯০-৯৩, ৯৯,	রাগস্বিকা-ভাব	২৭
	১০২, ১০৩, ১০৫, ১০৭-১১৪,	রাগমুগ ভাব	২৮
	১১৬-১২৩, ১২৬, ১৩৩-১৩৬,	রাঘব	৪৫
	১৩৭, ১৪০, ১৪১, ১৪৩-১৪৬,	রাজকাহিনী—অবনীন্দ্রনাথ	১৫৮, ১৫৯
	১৫০-১৫২, ১৫৪, ১৫৭, ১৫৮	রাজকৃষ্ণ রায়	১২৩, ১৩০
রবীন্দ্রনাথ মৈত্র	১৩৫	রাজতরঙ্গিণী	১৬২
রবীন্দ্র-সুগ	৫৬, ৮৭, ৮৮, ৯০,	রাজনারায়ণ বসু	৬৯, ৭৩
	৯১, ৯৯, ১৫৭, ১৫৮	রাজপথ—উপেন্দ্র গঙ্গো.	১৪৭
রবীন্দ্র-রীতি	৬৯	রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা—রমেশ দত্ত	১৪০
রবীন্দ্রলাল রায়	১৬১	রাজর্ষি—রবীন্দ্রনাথ	১৪৩
রবীন্দ্র-সঙ্গীত	১২৩	রাজলক্ষ্মী—যোগেন্দ্র বসু	১৪২
রবীন্দ্র-সাহিত্য	৭৭, ১১৫, ১৩৪	রাজশেখর বসু	১৫৬
রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী		রাজা ও রাণী—রবীন্দ্রনাথ	১৩৩, ১৩৪
—বিনয়কুমার সরকার	৭৮	রাজা গণেশ	২৭, ৬০
রবীন্দ্রোত্তর কবিগণ	৯৩	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	৭০, ৭৪
রবীন্দ্রোত্তর সুগ	১২৩, ১২৪	রাজেন্দ্রলাল মিত্র	৬৯, ৭৫, ৮৫, ৮৬
রমণীমোহন ঘোষ	১১৩	রাঢ়	১, ৩, ৬০
রমলা—মণীন্দ্রলাল	১৪৭	রাণা প্রতাপ—গিরিশ	১৩১
রম্যপদ চৌধুরী	১৫৬	রাতকানা—শিবলিখ	১৩৫

রাধা, শ্রীরাধা ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ২০,	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	২১
২৪, ২৭, ২৮, ৫৭	রামাইজ	২৮
রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ৭৭, ৭৮	রামায়ণ	৬, ২১, ২২, ২৩,
রাধাকান্ত দেব ৬৬		২৫, ৪২, ১৬২
রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ৭৭	রামায়ণের পুঁথি	২২
রাধাকৃষ্ণ ১৫, ২০, ২১, ২৬,	রামী রজকিনী	১৯
২৭, ২৮, ৫৭	রামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী	৬২, ৭৬, ৭৮,
রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী ৫		৯০, ১৬৩
রাধাকৃষ্ণ-লীলা ১৬, ১৭, ২৮	রামেব বাজ্যাত্তিক—শশিনাথ চট্টো.	
রাধাকৃষ্ণেব যুগলমূর্তি-পূজা ২৭		৭৩, ১৩৮, ১৫৮
রাধাতত্ত্ব ২৪	রামেব স্মৃতি—এবংচন্দ্র	১৫৩
রাধাতাব ২৭	রামেশ্বর চক্রবর্তী ৩৮, ৩৯, ৫০, ৯৩	
রাধাবাগী—বক্ষিমচন্দ্র ১৩৯	রামেশ্ববেব অদৃষ্ট—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টো.	
রামকমল সেন ৬৬		১৩৬, ১৪০, ১৫০
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ৬৬	রাসেলাস	১৩৮
রামধনু ( শিশু-মাসিক ) ১৬২	বিজিয়া ( নাটক )—মনোমোহন	১৩৫
রামনাবায়ণ (নাটুকে), রামনাবায়ণ	রুক্মিণীচরণ—বামনাবায়ণ	১৩৮
তর্কবত্ত ৬৮, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩০	রুদ্র দেবতা	৪১
রামপদ মুখোপাধ্যায় ১৪৯, ১৫৬	রুদ্রাপীড়	৯৭
রামপ্রসাদ সেন, কবিরঞ্জন ৪২, ৪৯,	রূপকথা	৪৮
৫০, ৫১, ৫৩, ৫৬,	রূপ গোস্বামী	২৬, ২৭, ৩০
৬০, ৬৯, ৯০, ১২৩	রূপদশী ( ছদ্মনাম )	৮০
রাম বনু ৪৯, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৯৪	রূপেব চাঁদ—চাক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪৭
রামমোহন বায়, বাজা ১৬৩, ৬৪,	রোথ—যতীন্দ্র বাগচী	১১৪
৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১,	বেণ্ডলেটিং এন্ট	৬৩
৭২, ৭৪, ৮১, ৮৩, ৮৪,	বেসপল অব দি লিভিং	
৮৫, ১১৬, ১১৭, ১৩৮	অ্যাণ্ড দি নন-লিভিং	৯৯
রামরাম বনু ৬৬, ৭০, ৭৪, ১১৬	রৈবতক ( কাব্য ও পর্বত )	৯৮, ৯৯
রামেন্দ্রসুন্দর বসাক ১৫৮	রোগশয্যা—রবীন্দ্রনাথ	১০৮
রামোই পণ্ডিত ১৩, ১৪, ৬০	রোম্যান্টিক কাব্য	৯৭

বোমান লিপি	৮৪	লোব-চন্দ্রানী	৪৪
বোমাবতী	৭৩	লৌকিক গ্রাম-সঙ্গীত	৪৯, ৫৬
		লৌকিক ছড়া-সাহিত্য	৬০
ল		লৌহ-কারাগার—বাজকৃষ্ণ রায়	১৬২
লক্ষণ	২২, ২৬		
লক্ষণ সেন	১, ১৬, ১৭, ৬০	লা	
লক্ষ্মী-জনার্দন	৩১	শকুন্তলা	৭১, ৭২, ১৩৮
লক্ষ্মী-নাবায়ণ	২৮	শঙ্কবাচার্য	২৮
লক্ষ্মীপ্রিয়া	২৭	শঙ্কবাচার্য—গিবিশ	১৩১
লক্ষ্যপথে—বিজয়চন্দ্র মজুমদার	১১২	শঙ্খ—অক্ষয় বড়াল	১১১
লক্ষ্যভেদ	২৫	শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪৯
লহিমা	১৭	শচীন সেনগুপ্ত	১৩৫
লর্ড আর্মহাস্ট	৬৩	শচীশ চট্টোপাধ্যায়	১৪৭
লয়লা-মজুম	৪৩	শক্তিবিশ্ব—সুবোধ ঘোষ	১৪৯
ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৬	শনিবাবের বিকেল—বুদ্ধদেব বসু	১৬১
লস্কর-উজিব ( হাসবফ খাঁ )	৪৪	শবরী	৯, ১১
লহমা	৩৬	শকুন্তল—বরীন্দ্রনাথ	৭৫
লাইফ অব অ্যান ইণ্ডিয়ান কেমিস্ট	৭৭	শঙ্করচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮৯
লাউ সেন	৩৭	শবণ, কবি	১৬
লাল-কালো—গিবীন্দ্রশেখর বসু	৬২	শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬৬, ৬৭, ৬৯,
লিটন স্ট্র্যাচি	৭৯		৯১, ১৩৭, ১৪১, ১৪৬, ১৪৭,
লীগ মন্ত্রিসভা	৬৫		১৫১, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৭, ১৬১
লীলা মজুমদার	১৬০	শবৎ-সরোজিনী—উপেন্দ্রনাথ	১৩১
লুইপাদ	১০	শবৎ-সাহিত্য	১৪৬, ১৫৩
লেখা—যতীন্দ্র বাগচী	১১৪	শর্মিষ্ঠা—মাইকেল	১২৮
লোকভাষা	৭	শশাঙ্কমোহন সেন	৭৮
লোকরহস্য—বঙ্কিমচন্দ্র	৭, ১৫০	শশাঙ্ক—রাখালদাস	১৪৪
লোকসাহিত্য	৪৩	শশাঙ্ক, রাজা	২
লোচন, লোচনদাস	২৬, ৩৫	শশীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১৫৮
লোথাল ( আমেনাবাদ )	৫	শশীকৃষ্ণ দাশগুপ্ত	৮৫

শাক্ত	৫, ৯, ১১	শুদ্ধসত্ত্ব বস্তু	১১৫
শাক্তাহান—হিতৈশ্বরলাল	১৩২	শুদ্ধবিবাহ—কুসুমকুমারী	১৪৫
শাক্তাহান, সম্রাট	৪৪	শুভা—নরেশচন্দ্র	১৪৭
শান্তিভল—করুণানিধান	১১৪	শূন্ত, শূন্তবাদ	৯, ১০, ১৪
শান্তিপূর	২২	শূন্তপুরাণ	১৩, ৩৭, ৬০
শান্তি—নবশচন্দ্র	১৪৭	শেখর ( রায়শেখর )	১৮, ২৫, ২৯
শাতনামা	১৬২	শেফালীশুদ্ধ—দেবেন সেন	১১১
শিক্ষা—ববীন্দ্রনাথ	৭৫	শেলী	১০৩, ১০৮
শিব ৯, ৩৩, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৫৩		শেষবক্ষা—ববীন্দ্রনাথ	১৩৪
শিব-দুর্গা	১৭, ৩৯, ৫৪	শেষব কবিতা—ববীন্দ্রনাথ	১৪৩
শিবনাথ শাস্ত্রী	৬৪, ১০৬, ১১৬, ১১৭, ১১৯	শৈব	৫, ১৭
শিবমন্দির—সৈয়দ হোসেন	১১৪	শৈবধর্ম	১৩
শিবরাম চক্রবর্তী ৭৯, ১৩৫, ১৫৭, ১৬১		শৈব-শাক্ত	২
শিব-শক্তি	৯, ১১, ১৫	শৈব-শাক্ত সহজিয়াগণ	২
শিব-শক্তি-স্বাধাধনা	৬০	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	১৩৭, ১৪৮,
শিব-শক্তি-উপাসক	৫	১৫১, ১৫৫, ১৫৭, ১৬১	
শিবাজী ( মহাকাব্য )—যোগীন্দ্র চন্দ্র	১০০	শৈলবাল্য (ঘোড়াভাষ্য)	১৪৫
শিবায়ণ—রামেশ্বর	৩৮, ৬০, ৯৩	শোবি নিগা	৫৭
শিরীন-ফরহাদ	৪৩	শোবসেনা	৬
শিল্প ও শিল্পী	১৬১	শামসুন্নাহ চক্রবর্তী	৮৯
শিশিরকুমার ঘোষ	৮৯	শ্যামা-সঙ্গীত ৪৯, ৫০, ৫১, ৭৪, ৫৭, ৬০	
শিশু—ববীন্দ্রনাথ	১৫৮	শ্রীকর নন্দী	২১
শিশুভারতী—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১৬২	শ্রীকান্ত—নবশচন্দ্র	১৪৭
শিশু ভোলানাথ—ববীন্দ্রনাথ	১৫৮	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৯
শিশুশিক্ষা—মদনমোহন	১৫৮	শ্রীকৃষ্ণ	২৯, ৯৯
শিশুসার্থী ( শিশু-মাসিক )	১৬২	শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন	৭, ১৯, ২০
শীতলা	৮৯	শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	২৩, ২৪
শুকতার ( শিশু-মাসিক )	১৬২	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	১৫
		শ্রীকৃষ্ণের ধর্মরাজ্য-পরিকল্পনা	৯৯
		শ্রীধর কথক ৪৯, ৫১, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৯৪	

ঐক্যবগণ	২৮	সতীদাহ-নিবারণ	৭০, ৭১, ৭২, ৮৩
ঐনামপুর	২২, ৬৮, ৭০, ৮২, ৮৩	সতীদাহ-নিবারণ আইন	৬৩
ঐনুল্লাহ	১৫	সতীনাথ ভাট্টা	১৪৯
ঐহট্ট	১	সতী ময়না, সতী ময়নামতী	৪৪
য		সত্যচরণ চক্রবর্তী	১৬১
যটুসন্দর্ভ	২৬, ৩০	সত্যপীথ	৫
ঘোল বছবেব পেঙ্গী—রাজকুমার	১৩২	সত্য-মিথ্যা—বিপিনচন্দ্র	৭৭
স		সত্যাসত্য—ধূর্জটিপ্রসাদ	১৪৯
সংগ্রাম—গিরিশ ঘোষ	১৩১	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭৩, ১০৬, ১১৬, ১১৮
সংবর্ড—সুধীন দত্ত	১১৫	সত্যেন্দ্রনাথ বসু	৭৭, ৭৮
সংবাদপত্রে সেকালের কথা	৮৫	সখাবাব একাদশী	৭০, ১২৯, ১৩৩
সংবাদ-প্রভাকর	৬৬, ৭০, ৮১, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৯৪	সনাতন, সনাতন গোস্বামী	২৬, ২৭
সংসার—বমেশ দত্ত	১৪০	সনাতনী	৭৩
সংস্কৃত	৬, ৭, ১৬, ২৫	সন্তোষ ঘোষ	১৫৬
সংস্কৃত ছন্দ	৪১	সন্দেশ ( শিশু-মাসিক )	১৬০
সংস্কৃত মহাভারত	৬	সন্ধ্যা ( সংবাদপত্র )	৮৯
সই-মা—ফকী পাল	১৪৭	সন্ধ্যার প্রদীপ—সুবল্লনাথ	১০৫
সখা ( পত্রিকা )	১৬০	সন্ন্যাসী বিদ্রোহ	৬৫, ৬৭
সখা ও সাধী ( পত্রিকা )	১৬০	সবিতা—সুবল্লনাথ	১০৫, ১৪৪
সঙ্কীভাবে সাধনা	১৫	সবুজপত্র ( মাসিকপত্র )	৭৫, ৮১, ৯১
সঙ্কেত-নাট্য	১৩৪	সবুজপত্র-গোষ্ঠী	৯১
সঙ্ক	৯, ১১	সপ্তগ্রাম	১৪৪
সঙ্কর তত্ত্বাচার্য	১১৫	সমতট	১
সঙ্কীর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭৩, ১৩৬, ১৪০, ১৪০	সমরেশ বসু	১৪৯, ১৫৬
সঙ্কীর্ণনী ( সাপ্তাহিক )	৮১, ৮৮	সমাচারদর্পণ	৬৬, ৭০, ৮১, ৮২, ৮৪
সঙ্কী—নরেশচন্দ্র	১৫৩	সমাজ—রবীন্দ্রনাথ	৭৫
সঙ্কী—মনোমোহন	১৩০	সমুদ্র—বিজ্ঞানলাল	১১২
		সহাবকৌমুদী	৬৬, ৭০, ৮১, ৮৪
		সরমা	৯৭



সরস্বতী	১০৩	সাহেব-বিবি-গোলাম-বিমল মিত্র	১৪৯
সরোজকুমার রায়চৌধুরী	১৪৯, ১৫৬	সাহেব-সুবার চিত্র—রাজনারায়ণ	৭৩
সরোজনাথ ঘোষ	১৪৫	সিদ্ধাই	২, ৯, ১২
সরোজিনী—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ	১৩০	সিদ্ধাচার্য	৯, ১০
সরোরহবজ্জ	১০	সিদ্ধু-উপত্যকা	৫
সহজযান, সহজযানী	৯	সিপাহী বিদ্রোহ	৬৫, ৬৭
সহজিয়াগণ	১, ৯, ১১, ১৩, ১৫, ২৭, ৩৭, ৭০	সিরাজউদ্দৌলা	৬৩
সহজিয়া ধর্ম, সহজিয়াবাদ	৫	সিরাজউদ্দৌলা—গরিব	১৩১
সহজিয়া-বৈষ্ণবধর্ম	৬০	সিরাজউদ্দৌলা—শচীন সেনগুপ্ত	১৩৫
সহজিয়া-মত	১৫	সীতার বনবাস—বিদ্যাসাগর	৭১, ৭২, ১৫৮
সহযানী—শ্রমণ চৌধুরী	১৪৪	সীতারাম	১৩৯
সাংখ্য দর্শন	৪	সীতারবণ	২২
সাঁই	৫৫	সুকাশ চট্টোপাধ্যায়	১১৫
সাঁওতাল বিদ্রোহ	৬৫	সুকুমার দে সরকার	১৬০, ১৬১
সাগর-সঙ্গী ১—চিত্তবজ্জন	১১৩	সুকুমার রায় (রায়চৌধুরী)	১৬০, ১৬১
সাধনা ( মাসিক পত্র )	৭৫, ৯০	সুকুমার সেন	৮২
সাধারণী—অক্ষয় সরকার	৮৫, ৮৭	সুখলতা রাও	১৬০
সাধের আসন—বিহারীলাল	১০৫	সুতিনী—জগদীশ গুপ্ত	১৪৮
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	১১৫	সুধর্ম ( আরাকান-বাজ )	৪৪
সামাজিক নাটক	১৩২, ১৩৪	সুধাকর দাস	২৬
সায়ম্—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	১১৭	সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫০, ১৫৩
সারদা	১০৩	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	১১৫
সারদামঙ্গল	১০২, ১৪১	সুধীরচন্দ্র সরকার	১৬২
সাহিত্য ( মাসিক পত্র )	৮১, ৯০	সুধীবজ্জন মুখোপাধ্যায়	১৫৬
সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী		সুনির্মল বসু	১৫৭, ১৬১
—নিত্যকৃষ্ণ বসু	১১৩	সুন্দর ( বিদ্যাসুন্দর )	৪১
সাহিত্যিকা—মলিনী গুপ্ত	৭৯	সুপ্তোপিতা—বরদা মিত্র	১১২
সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা		সুফী-ধর্মতত্ত্ব	২৮
—যতীন্দ্রমোহন সিংহ	১৪৬	সুফী-ভোগবাদ	৫৫

সুফী-মতবাদ	১৬	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১৪৭,
সুবিনয় রায়	১৬০		১৫০, ১৫৫, ১৫১
সুবোধ ঘোষ	৪২, ১৫৬	সুচ ব্যালাড	৪৭
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত	৭৯	সুট	১৩৮
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	১১৫	সুশিক্ষা-প্রচার	৮৩
সুভূ (সুক্ষ)	১, ৬০	সুরগবল—মোহিতলাল	১১৫
সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৭৭, ৭৮	সুটায়ার	১৩৩, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৪২
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৯	সুত্রিনা	৯৮
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	১৫৩	স্বদেশী আন্দোলন	৬৫, ৮১
সুবেশ চক্রবর্তী	৭৮, ৭৯	স্বদেশী গান, স্বদেশী সঙ্গীত	১০৬,
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী	১১৫		১১৬, ১১৮, ১১৯, ১২০
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৭৮, ৭৯, ১৫০	স্বপ্ন—গিরীন্দ্রশেখর	৭৮
সুলেখা সাম্রায়	১৫৬	স্বপ্নপ্রয়াণ (কাব্য)	
সুলোচনাব সেবারত	৯৯	—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০১
সুশীলকুমার দে	৭৯	স্বরূপ দামোদর	১৫
সুশীল জানা	১৫৬	স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য	১৫৬
সুশোভন সরকার	৭৯	স্বর্ণকুমারী দেবী	১১৩, ১৪৫
সৃষ্টিতত্ত্ব	১৪	স্বর্ণলতা—তারকনাথ	১৫৬, ১৪০,
সেই মুখখানি—চন্দ্রশেখর	৭৩		১৪১, ১৪৫
সে—রবীন্দ্রনাথ	১৫৮	স্বামীব ভিটা—ফণী পাল	১৪৭

সেকাল ও একাল

—রাজনারায়ণ বসু ৭৩, ৭৪

হ

সেকালের গুরুমহাশয়—ঐ	৭৩	হটম	৬৬
সেকেলে ডেপুটী—দীনেন্দ্র বায়	১৫২	হঠাৎ আলোর ঝলকানি	
সেক্সপীয়ার	১৩১, ১৬২	—বুদ্ধদেব বসু	৭৯
সেখ আনু—শৈলদালা	১৪৫	হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী	১০০
সেনরাজগণ	২, ১৫, ৬০	হরগোরী-লীলা	১৭
সৈন্যদ আলাওল	* ৪৩, ৪৪	হরপ্রা	৫
সোনার তরী—রবীন্দ্রনাথ	১০৮, ১১০	হরপ্রসাদ মিত্র	১১৫
সোমপ্রকাশ	৮১, ৮৫, ৮৮	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১০, ১৪৪

হরিকেল	১	হিন্দুযুগ	২
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়	১৩৫	হিমালয়—বিহারীলাল	১০
হরিবংশ	১৬	হিমালয়ের ভয়ংকর	
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬৫, ৮৯	—হেমেন্দ্রকুমার	১৬১
হরিশচন্দ্র (নাটক)—অমৃতলাল	১৩৩	হিস্টি অব হিন্দু কেমিস্টি	৭৭
হরিশচন্দ্র (নাটক)—মনোমোহন	১৩০	হীনযান, হীনযানী	৯
হরিসাধন মুখোপাধ্যায়	১৪৪	হীরকচূর্ণ—অমৃতলাল	১৩৩
হর্ষবর্ধন	২, ৬০	হীরলাল হালদার	৭৭
হরু ঠাকুর	৪৯, ৫৭, ৯৪	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৭৮
হসন্তের পত্র—সুরেশ চক্রবর্তী	৭৯	হগলী	৪০
হরি হোড়, ঐ জর্গোৎসব	৪০	হগলী কলেজ	৬৩
হাড়িঝি চণ্ডী	১৩	হতোম, হতোম পোঁচার নক্সা	৬৮, ৭০,
হাড়িপা, হাড়িপা সিদ্ধাই	১২, ১৩		৭১, ৭৩, ৭৪, ১৪২
হাতীর সঙ্গে হাতাহাতি-শিবরাম	১৬১	হতোমী বাংলা, ধাবা বা স্টাইল	৬৮,
হাফেজ	৮৩		৭১, ৭৬
হারান রক্ত, হারানচন্দ্র বক্ষিত	১৪৫	হসেন শা, হসেন শাহ	৩, ২৩, ৪৩
হালহেড	৬৬, ৭০	হেমচন্দ্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
হালিসহর	৬০		৬৬, ৮৭, ৯৩, ৯৭, ৯৮,
হাসি ও অশ্রু—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	১১২		১০০, ১০১, ১০২, ১১৮
হাসির গান— ঐ	১১৬, ১২২	হে মরণ—গিরিজা মুখো.	১১২
হিতবাদী ( সাপ্তাহিক )	৮১, ৮৮	হেমেন্দ্রকুমার রায়	১২৪, ১৪৭
হিন্দা	৭	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	১৪৭
হিন্দু কলেজ	৬৩, ৮৩	হেমেন্দ্রলাল রায়	১৬১
হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব	৮৩	হেরফের—চারু বন্দ্যো.	১৪৭
হিন্দু পেট্রিয়ার্ট ( সংবাদপত্র )	৬৫, ৮৯	হেলেনা কাব্য	
হিন্দুমেলা	৬৫, ১১৮, ১১৯, ১৩০	—আনন্দ বিজ্ঞ	১০০
হিন্দুমেলার গান	১০৬	হ্লাদিনী শক্তি	২৪

## ॥ ওল্ডফ্রেণ্ডের প্রবন্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্য ॥

বাংলার বাউল ও বাউল গান—অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	২৫'০০
রবীন্দ্র-কাব্য-পরিচয়—অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	১২'০০
বৈজ্ঞানিক দর্শন—অনন্তকুমার জায়তর্কতীর্থ	২০'০০
মহানতি বিদ্বান—মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ	৩'০০
কাছেরমানুষ রবীন্দ্রনাথ—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	৩'২৫
বাংলাসাহিত্যের ভূমিকা—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	৪'০০
বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়—কবিশেখর কালিদাস রায়	৮'০০
বঙ্গ-সাহিত্যের ভূমিকা—ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি	৫'০০
কি লিখি ?—যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি	৩'৫০
ভক্ত কবীর—অধ্যাপক উপেন্দ্রকুমার দাস	৫'০০
বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস—অধ্যাপক নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য	৫'০০
রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ১ম খণ্ড—অধ্যাপক প্রমথনাথ বিদ্য	৫'০০
রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ২য় খণ্ড—অধ্যাপক প্রমথনাথ বিদ্য	৫'০০
রবীন্দ্র-বিচিত্রা—অধ্যাপক প্রমথনাথ বিদ্য	৫'০০
নানা রকম—অধ্যাপক প্রমথনাথ বিদ্য	৬'০০
রবীন্দ্র-জগৎ—রেণু মিত্র : ভূমিকা ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত	৫'০০
বাংলা রজালয় ও শিশিরকুমার—হেমেন্দ্রকুমার রায়	৩'০০
নেহেরু ও পররাষ্ট্রনীতি—অনাদিনাথ পাল	৫'০০
বাজালা সংস্কৃতি-প্রসঙ্গ—গোপাল হালদার	৪'০০
সংস্কৃত রূপান্তর—গোপাল হালদার	৬'০০
শেক্সপীয়ার—ঋষি দাস	৬'০০
বার্নার্ড শ'—ঋষি দাস	৪'৫০
ত্রিপুরার ইতিকথা—কৃষ্ণদত্ত	২'০০

### ॥ ভ্রমণ-কাহিনী ॥

কেদার-বদরী—জ্যোতিষচন্দ্র রায়	৪'৫০
হিমালয়পারে কৈলাস ও মানসসরোবর—প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়	৬'০০
ছানিয়া দেখছি—কল্যাণী গ্রামাণিক	৫'০০
ভারত-ভ্রমণ—রামনাথ বিশ্বাস	৫'০০
দেশেদেশে মোর ঘরআছে—স্বপনবুড়ো	২'৫০
সাতসমুদ্রের তেরনদীর পারে—স্বপনবুড়ো	২'৫০
মন্ডিরে মন্ডিরে—বীরেন্দ্রলাল ধর	২'০০
মহাচীমে শ্রীমৈত্র—বার্তাবহ	৩'৫০
নতুন জাপান—কালীদাস বিশ্বাস	৮'০০

## ॥ ওরিয়েন্টেল শিক্ষা-নীতির বই ॥

STUDENT UNREST	Prof Humayun Kabir	5'00
NEVER TOO LATE	N. Roy	3'00
শিক্ষা	মহাত্মা গান্ধী	২'৫০
শাস্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধন।	স্বধীরচন্দ্র কব	৪'০০
স্বাধীন শিক্ষা	স্বধীরচন্দ্র কর	৫'০০
প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ	অনাথনাথ বসু	১'০০
নবভারতের শিক্ষা	হুমায়ুন কবির	৮'০০
জনশিক্ষার কথা	নিখিলরঞ্জন বায়	৩'০০
সমাজশিক্ষার ভূমিকা	নিখিলবরুণ বায়	২'৫০
নূতন শিক্ষা	প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক	২'০০
সমাজ ও শিশুশিক্ষা	প্রতিভা গুপ্ত	৫'০০
সমাজ ও শিশু-সমীক্ষা	প্রতিভা গুপ্ত	৮'০০
শিশু-পরিবেশ	সমীরণ চট্টোপাধ্যায়	৫'০০
বুনিয়াদী শিক্ষা	বিজয়কুমার ভট্টাচার্য	২'০০
বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি	বিজয়কুমার ও সাধন	২'০০
বুনিয়াদী শিক্ষার কথা, ১ম খণ্ড	অনিলমোহন গুপ্ত	২'০০
বুনিয়াদী শিক্ষার কথা, ২য় খণ্ড	অনিলমোহন গুপ্ত	৩'০০
বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠন	অনিলমোহন গুপ্ত	৩'০০
বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি	অনিলমোহন গুপ্ত	২'৫০
নয়া-শিক্ষা	ফণিভূষণ বিশ্বাস	৩'৭৫
শিক্ষার নূতন পথে	ঋতিনাথ চক্রবর্তী	২'০০
শিক্ষক-শিক্ষণ প্রবেশিক	বিমলচন্দ্র দাশগুপ্ত	২'০০
প্রাথমিক শিক্ষা	রেণু মিত্র	৪'০০
নঙ্গ-তালিম	ধীরেন্দ্র মজুমদার	২'০০
গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক	বাজকুমার মুখোপাধ্যায়	৪'০০
জনসাধারণের গ্রন্থাগারে পুস্তকনির্বাচন	বাজকুমার মুখোপাধ্যায়	১'৭৫
ছোটদের কবিতাশেখা	হুনির্মল বসু	২'০০
ছন্দের গোপন কথা	হুনির্মল বসু	১'০০
বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	১০'০০









